সদানন্দ সাধুর আশ্রমের তিনদিকটা তপোবনের মত। বাকী দিকটাতে একটা নদী আছে। আশ্রম ঘিরিয়া অবশ্য তপোবনটি গড়িয়া ওঠে নাই, স্থানটি তপোবনের মত নির্জন আর শান্তিপূর্ণ দেখিয়াই আশ্রম গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আশ্রমের বয়স আর কত হইবে, বছর পাঁচেকের বেশী নয়। তপোবনের বড় বড় গাছগুলির কোন কোনটা হয়ত শতাব্দীরও বেশী সময় ধরিয়া নিবিড় ছায়া বিলাইয়া আসিতেছে।

তপোবনের সমস্তটা আশ্রমের সম্পত্তি নয়। দলিলপত্রের হিসাবে দেখা যায়, আশ্রমের ভূমির পরিমাণ শ'খানেক বিঘার কাছাকাছি। তপোবন আরও বিস্তীর্ণ—উত্তরে বাস্তুপুরের গাঁ-ঘেঁষা প্রকাণ্ড কলা-বাগান এবং দক্ষিণে সাতুনার বাগ্দী পাড়া পর্যন্ত এলোমেলোভাবে ছড়ানো আরও বড় আমবাগানটা ধরিলে আশ্রমের ভূমির দশ-বার গুণ। তবে দলিলপত্রে ছাড়া আশ্রমের সীমানা ভাল করিয়া কোথাও দেখানো নাই কিনা, তাই বন, উপবন, আমবাগান, কলাবাগান সমস্তই আশ্রমের তপোবন বলিয়া মনে হয়।

নদী পূবদিকে।

একটি শাখানদীর এই উপশাখাটিকে স্থানীয় লোক আদর করিয়া ডাকিত 'রাধা' বলিয়া, বোধ হয় আদরের আতিশয্যেই একটা ই'কার জুটিয়া এখন হইয়াছে 'রাধাই'।

বড় আশ্চর্য নদী। প্রতি বছর বাঁচে আর মরে। আকাশে যেই কালো কালো মেঘ জমিয়া থম থম করে, লোকে জল আটকানোর জন্য চালের ফুটা আর ছাতির ফুটা মেরামত না করিয়া আর উপায় খুঁজিয়া পায় না, রাধাই নদীতে অমনি দেখা দেয় ঘোলা জলের স্রোত। ক'মাস ধরিয়া রোদে যে বালি তাতিয়াছে সে বালি যায় ঢাকিয়া, স্থানে স্থানে যে আবদ্ধ জল পচিয়া উঠিতেছিল সে জল যায়

ভাসিয়া। সকলে অবাক হইয়া একবার তাকায় আকাশের দিকে, একবার তাকায় রাধাই নদীর দ্রুতবর্ধনশীল জীবনসঞ্চারের দিকে। বড় রহস্যময় মনে হয় ব্যাপারটা সকলের কাছে। বৃষ্টি আর হইয়াছে কতটুকু, কদিনের ছাড়া ছাড়া বর্ষণে পথঘাট ভাল করিয়া ভেজে নাই পর্যন্ত। কোন পুকুরে জল বাড়ে নাই, কোন ডোবায় জল জমে নাই! রাধাই এত জল পাইল কোথায়?

দূরদেশে কোথায় ইতিমধ্যে প্রবল বর্ষা নামিয়াছে, কোন্ বড় নদী সেই জল বহিয়া আনিয়া কোন্ শাখানদীকে দিয়াছে, আর কোন্ শাখানদীর দানে তাদের এই নদীতে দেখা দিয়াছে নবযৌবনের আবির্ভাব, এত সব রহস্যের সন্ধান কজনে আর রাখে। চোখের সামনে মরা নদীকে বাঁচিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হয়।

নদীর একেবারে ধারে প্রকাণ্ড চালাটায় বিকালের দিকে সাধুজীর দর্শনকামীদের সমাগম হয়। আশ্রমের সকলে তো উপস্থিত থাকেই, কাছাকাছি গ্রাম হইতে অনেকে আসে, দূরের গ্রাম ও সহর হইতেও আসে। সদানন্দ সকলকে দর্শনও দেয়, দর্শনের মনোমত ব্যাখ্যাও শোনায়।

এবার যেদিন প্রথম রাধাই নদীর বুকে স্রোত দেখা দিল, সেদিন অহিংসা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সদানন্দ হঠাৎ আনমনে চুপ করিয়া গেল। নদীর স্রোতের দিকে পলকহীন চোখে এমনভাবে চাহিয়া রহিল যে, কারও বুঝিবার উপায় রহিল না, অন্যমনস্ক সে ইচ্ছা করিয়া হইয়াছে। আজ কথা জমিতেছিল না। যার কথা মনের মধ্যে কাঁটার মত বেঁধে, মধুর মত মাখা হইয়া যায়, মধুপের মত গুঞ্জন করে, শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া হয় রোমাঞ্চ, আজ যেন তার কথায় জোর নাই, সুর নাই—নিছক কতকগুলি নীরস ভোঁতা শব্দমাত্র পরিবেশন করিতেছে। অস্বস্তি বোধ করিতে করিতে এতক্ষণে কারণটা টের পাইয়া সকলে স্বস্তি লাভ করে। তাই বটে, সাধুজী আজ অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। কথায় সাধুজীর মন নাই।

পুরুষেরা চুপ করিয়া রহিল, মেয়েদের মধ্যে শোনা গেল ফিস ফিস

কথায় গুঞ্জন। এখানে মেয়ে পুরুষের বসিবার পৃথক ব্যবস্থা নাই, সদানন্দ পুরুষ ও নারীর পার্থক্য স্বীকার করে, পৃথক রাখিবার প্রয়োজন স্বীকার করে না। এই সভায় যারা বসে তাদের মধ্যে যেমন ছোট-বড় নাই, জানা-অজানা নাই, আপন-পর নাই, তেমনি মেয়ে-পুরুষও নাই। অন্ততঃ সাধুজীর তাই নির্দেশ। তবু মেয়েরা দল বাঁধিয়া একপাশে তফাতে সরিয়া বসে, ব্যবধানটা ঘুচাইবার চেষ্টাও পুরুষদের মধ্যেও কখনও দেখা যায় না। চালার নিচে স্থানাভাব ঘটিলেও নয়।

চালার কাছে খানিকটা যায়গা গাছপালা কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখানে গাছের ছায়া নাই। তপোবনের মাথা ডিঙ্গাইয়া বাঁকাভাবে রোদ আসিয়া মেয়েদের বসিবার যায়গায় পড়িয়াছে, বড় তেজ এখানকার রোদের। ঘামে সকলে ভিজিয়া গিয়াছে, তবু সরিয়া ছায়ায় গিয়া বসিবার সাহস কারও নাই। একটি কমবয়সী বিধবা, গায়ের রঙটা যার আশ্চর্য রকমের ফর্সা, মুখখানা সিঁদূরের মত রাঙা করিয়া চোখ বুজিয়া পাশের ঘোমটা-টানা বৌটির গায়ে নির্লজ্জ ভঙ্গিতে হেলান দিয়া আছে। হয় মূর্চ্ছা গিয়াছে, নয় যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে।

আনমনে নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই সদানন্দ বলিল, মেয়েদের গায়ে রোদ লাগছে বিপিন।

বিপিন সদানন্দের বন্ধু, শিষ্য এবং আশ্রমের জেনারেল ম্যানেজার। একদিন সে সদানন্দের নাম ধরিয়াও ডাকিত, হাসিতা-মাসাও করিত। আজও অন্তরালে করিলে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু দশজনের সামনে আনমনে হঠাৎ ভুল করিয়া বসিবার ভয়ে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সব সময়েই সে শিষ্যত্বের খোলসটা বজায় রাখিয়া চলে।

বিপিন হাত জোড় করিয়া বলিল—কি করিব প্রভু?

—ছায়ার ব্যবস্থা করে দাও।

—দিই প্রভু।

হোগলার বেড়া আনিয়া চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া

বিপিন অল্পক্ষণের মধ্যেই ছায়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। আগেও ক'দিন মেয়েরা রোদে কষ্ট পাইয়াছে, রৌদ্র নিবারণের এমন সহজ উপায় থাকিতে আগে কেন এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, কে তা অনুমান করিবে! হয়ত কারও খেয়াল হয় নাই—সদানন্দেরও নয়। হয়ত তফাতে জমাট বাঁধিয়া বসিবার জন্য মেয়েদের উপর সদানন্দের রাগ হইয়াছিল, তাই ক'দিন তাদের রোদে-ভাজা করিয়া শাস্তি দিয়াছে। আজ বিধবা মেয়েটির রাঙা মুখখানা দেখিয়া মায়া হইয়াছে। কিন্তু রাগ কি সদানন্দের আছে? শাস্তি কি কারোকে সে দেয়? মায়া কি তার হয়? শুধু তাকে দর্শন করিয়া আর তার দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া কে তা অনুমান করিতে পারিবে!

মেয়েরা ছায়া পাওয়া মাত্র সদানন্দ মুখ ফিরাইল। মেয়েদের মৃদু গুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। প্রেম ও অহিংসা সম্বন্ধে না জানি সাধুজী এবার কি বলিবে?

—নদীতে এবার অনেক আগে জল এল, না বলাই?

কোথায় প্রেম ও অহিংসা, কোথায় রাধাই নদীতে জল আসা। কোথায় সতরঞ্চি জোড়া ভদ্রলোকের ভিড়, কোথায় এককোণে মাটির আসনে সাতুনার মূর্খ দোকানদার বলাই। বলাই নামে একজন যে আসিয়া আসরের একপাশে বসিয়াছে, তাই বা এতক্ষণ ক'জনে খেয়াল করিয়াছিল? বলাই কৃতার্থ ও নির্বাক হইয়া রহিল।

তার হইয়া জবাব দিল শ্রীধর। অনেক বয়স হইয়াছে শ্রীধরের, ষাটের কাছাকাছি। সাতুনার সে সম্পন্ন গৃহস্থ, তিন তিনটা রোজগেরে ছেলে লইয়া মস্ত সংসার পাতিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিতে সে অদ্বিতীয়। সূতাবাঁধা চশমা আঁটিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীতে সে রামায়ণ-মহাভারতের বাছাবাছা অংশ পাঠ করে, মাঝে মাঝে থামিয়া অতি সরল ও সহজবোধ্য কাহিনীর রসালো ব্যাখ্যা করিয়া শোনায়। তার বাড়ীতে প্রায়ই এরকম সভা বসে—তবে এত বড় নয়। আর সে-সভায় ভদ্রলোক আসে না, সে শুধু চাষী-মজুর তেলি-তাঁতি কামার-কুমোরের সভা।

বিপিনের অনুকরণে হাত জোড় করিয়া শ্রীধর বলিল—চারবাদ্‌লা নেমে গেছে, আজ্ঞা।

চারবাদ্‌লা নামার সঙ্গে রাধাই নদীতে জল আসার সম্পর্ক কি? চারবার বৃষ্টি হইয়া গেলেই রাধাই নদীতে জল আসে। চিরদিনের নিয়ম। টিপ্ টিপ্ করিয়া দু-চার ফোঁটা জলই পড়ুক আর ঝম্ ঝম্ করিয়া সৃষ্টি-ভাসানো বাদলাই নামুক, চারবার বর্ষণ হইয়া গেলে নদীতে জল আসিবেই আসিবে। সদানন্দ মৃদু হাসে। জবাব দিয়াছে শ্রীধর, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে তিরস্কার করিয়া বলে, এসব ধারণা পোষণ করা কেন, এ ধরণের সব কুসংস্কার?

সাধুজীর স্নেহ-মধুর আবেগভরা ধমক শুনিয়া মনে হয়, আর যে সব কুসংস্কার তাদের আছে সে সব যেন কিছু নয়, এটাই তাদের কুসংস্কারের চরম। মনে মনে এই কুসংস্কার পুষিয়া রাখিয়া ইহকাল পরকাল সব তারা নষ্ট করিয়াছে। তারপর শুষ্ক নদীতে হঠাৎ স্রোত দেখা দিবার কারণ সে ব্যাখ্যা করে। ব্যাখ্যা করিতে করিতে আসে রহস্যময়ী প্রকৃতির কথা। প্রকৃতির আসল রহস্য কোথায় মানুষ যে তার সন্ধান জানে না, একি সহজ আপসোসের কথা! অজানার মধ্যে মানুষ প্রকৃতির রহস্যকে খুঁজিয়া মরে—রাধাই নদীতে জল সঞ্চারের কারণ না জানায় ভাবে, এই বুঝি তবে প্রকৃতিদেবীর দুর্বোধ্য লীলার অভিব্যক্তি। জানামাত্র যখন অজানার সমস্ত রহস্যের আবরণ খসিয়া যায়, অজানার জন্য মাথা ঘামান কেন? জানার মধ্যে, যে যতটুকু জানে তারই মধ্যে প্রকৃতির সবটুকু রহস্যের খনি নিহিত থাকে। রাধাই নদীতে জলস্রোত আসিবার কারণ নাই বা জানিলে, জলস্রোত যে আসিয়াছে এটুকু তো জান? এই জানাটুকুর মধ্যে সন্ধান কর, রহস্যানুভূতির অজ্ঞাত জগতের দিগন্তে আত্মজ্ঞানের ছায়া নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের সঙ্কেতে তোমায় সাড়া দিতেছে দেখিতে পাইবে।

সকলে মসগুল হইয়া শোনে। এতক্ষণে আসর জমিয়াছে। শুধু সদানন্দের বলিবার কৌশলে প্রত্যেকের মনে হয় দুর্বোধ্য কথাগুলি

যেন জলের মত বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কি বুঝিয়াছে একথা কেউ ভাবে না, বুঝিতে পারিয়াছে এই ধারণার উন্মাদনায় বিভোর হইয়া থাকে। বিপিনের শীর্ণ ম্লান মুখে আনন্দের ছাপ পড়ে। আজ প্রণামী জুটিবে ভাল।

মাঝে মাঝে দু-একজন নতুন শ্রোতা আসিয়া চুপি চুপি আসরের একপাশে বসিয়া পড়িতেছিল। দেরী হওয়ায় তারা গ্রাম হইতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তপোবনে ঢুকিবার পর আর তাদের ব্যস্ততা নাই। সমস্ত তপোবন পার হইয়া চালায় পৌছিতে হয়, সেই অবসরে তপোবন তাদের শান্ত করিয়া দিয়াছে। না, তাড়া-হুড়া করিবার কিছু নাই। সাধুজীর কথা যদি শেষ হইয়া যায়, তাতেই বা কি? আরেকদিন সময় মত আসিলেই হইবে। সদানন্দের কথা শুনিবার আগ্রহে যারা ছুটিয়া আসে তাদের সকলের মনেই তপোবন কম-বেশী প্রায় এই রকম প্রভাব বিস্তার করে, সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত অধীরতা যেন জুড়াইয়া যায়, আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকে না। পতঙ্গ যেমন মধুতে ডুবিয়া চাপল্য হারায়, তপোবনের উদ্ভিদগুলির রক্ষণাবেক্ষণে যে নিবিড় শান্তি আছে তার অদৃশ্য ঘনত্বের কবলে আসিয়া পড়ামাত্র মানুষের মনের বিভিন্ন গতিগুলি তেমনি সংযত হইয়া যায়।

তবে সকলের নাগাল তপোবন পায় না। কত অনন্যমনস্ক জীব আছে জগতে, কত মন ইন্দ্রিয়ের মৃদুতর উপচারগুলি নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করে, কত মানুষ নিজের চারিদিকে লইয়া বেড়ায় দুর্ভেদ্য আবরণ।

আট-বেয়ারার হুম্ হুম্ শব্দে তপোবনকে কিছুক্ষণের জন্য নিছক জঙ্গলে পরিণত করিয়া একটি পাল্কী একেবারে আশ্রমের ভিতরে আসিয়া থামিল, সদানন্দের তিনমহাল কুটীরের সামনে। আসর বসিবার চালা হইতে সদানন্দের কুটীর বেশী তফাতে নয়, একটা বাঁশ ঝাড় এবং কয়েকটা আম ও বকুল গাছের জন্য চোখে পড়ে না।

না দেখিয়াও অনুমান করা গেল কে আসিয়াছে। মহীগড়ের রাজা।

ছাড়া আট-বেয়ারার পাল্কীতে আর যারাই চাপুক, আশ্রমে তারা আসে না। সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিপিন ব্যস্ত হইয়া নিবেদন করিল—রাজাসাহেব দর্শনলাভ করতে এসেছেন প্রভু।

—এখানে আসতে বল।

—এখানে প্রভু?

সদানন্দের আকস্মিক বিদ্রোহ বিপিন প্রত্যাশা করে নাই, মুখে অনেকগুলি রেখা সৃষ্টি করিয়া সে চাহিয়া রহিল। হোক গুরুদক্ষিণা, আশ্রমের ভূমি তো রাজাসাহেবের দান, নিজে সে আশ্রমে পায়ের ধুলা দিয়াছে তাই কি যথেষ্ট নয়? তার প্রজাদের এই আসরে তাকে ডাকিয়া আনার তো কোন মানে হয় না! যার কলমের এক খোঁচায় আশ্রম উঠিয়া যাইতে পারে, সে শিষ্য হইলেও তাকে একটু, খুব সামান্য একটু, খাতির করিলে দোষ কি?

রাধাই নদীর ঘোলাটে জলস্রোতই যেন আজ সদানন্দকে আনমনা করিয়া দিতেছে। বিপিনের প্রশ্নের মানে বুঝিতে দুবার শুনিতে হয় না, মুখের রেখা, চোখের দৃষ্টির মানে বুঝিতে দুবার চাহিতে হয় না। আনমনা হইয়া না-বুঝার ভান করাই সব চেয়ে সহজ।

—হ্যাঁ, বল গে আমি এখানে আছি।

বহুকাল শিষ্যত্বের অভিনয় করিতে করিতে কিভাবে যেন বিপিনের সংযম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া মানুষটা সে বড় চালাক, ভাবিয়া চিন্তিয়া ফন্দি না আঁটিয়া কখনও সে কিছু করে না, যদি বা করে অন্তরালে করে। জীবনের সমস্ত অসংযম তার গোপনীয়। সদানন্দের বোকামিতে রাগে গা জ্বলিয়া গেলেও তাই সে শুধু বলিল—প্রভু?

সদানন্দ চুপ। আনমনে কথা বলার চেয়ে নীরবে আনমনা হওয়া ঢের সহজ। একটু অপেক্ষা করিয়া বিপিন কুটীরের দিকে চলিয়া গেল। আর ফিরিয়া আসিল না। সূর্য নামিয়া গেল তপোবনের গাছের আড়ালে, মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সকলকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিবার ও প্রণামী দিবার অনুমতি দিয়া সদানন্দ ঠায় বসিয়া রহিল রক্তমাংসের দেবতার মত। দেবতার মতই তার মূর্তি, বটতলার ছবির

মহাদেবের ছাঁচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে। আসন করিয়া বসায় ভুঁড়ি গিয়া প্রায় ঠেকিয়াছে পায়ে এবং তাতেই যেন মানাইয়াছে ভাল। নয় তো এই বৃষস্কন্ধ বিশালদেহ পুরুষের চওড়া বুক আর পেশীবহুল সুডৌল বাহু দেখিয়া মনে হইত, দেহের শক্তি ভিন্ন আর বুঝি তার কিছু নাই। কথায় তাহা হইলে মানুষ মুগ্ধ হইত, কারও ভক্তি জাগিত কিনা সন্দেহ। মাথায় জটা নাই বলিয়াই ভক্তেরা অনেকে মনে মনে আপসোস করে। যার সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি স্থৈর্য্যের নিখুঁত প্রতীক, জটা ছাড়া কি তাকে মানায়?

সদানন্দের কুটীরের সদর আর কিছুই নয়, বড় একখানা ঘর। মেঝে লাল সিমেন্ট করা, দেয়াল গেরুয়া রঙের—বাদামী ভাবটা একটু প্রকট। আশ্রমের ছোট বড় সমস্ত ঘরই এই ধরণের, উপরের ছাউনি ছাড়া বাকী সব চুণ-সুরকি ইট-কাঠের ব্যাপার। কিন্তু বিপিনের ভাষায় এগুলি সব কুটীর।

সদরের ঘরখানায় কতকটা বৈঠকখানার কাজ চলে, মাঝে মাঝে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ছোটখাট সভাও বসে। তবে সে সভা হয় অনেকটা ঘরোয়া মজলিসের মত, সকলে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা পায়। সদানন্দকে যেমন ব্যক্তিগত সুখদুঃখ দ্বিধাসন্দেহ নিবেদন করা চলে, তেমনি চলে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা, এমন কি উঁচু গলায় তফাতের মানুষকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করা চলে, 'কেমন আছ ভায়া'। শিষ্য ও ভক্তের ব্যক্তিত্বকে এখানে সদানন্দ প্রশ্রয় দেয়, নদীর ধারে আটচালার নিচে এদের সঙ্গে তার যে ব্যবধানটা থাকে প্রায় দেবতা ও অধঃপতিতের, এখানে সেটা হয় অবতার ও মানুষের। কত তুচ্ছ বিষয়েই মাথা ঘামায় সদানন্দ, কত তুচ্ছ মানুষের কত তুচ্ছ পারিবারিক জীবনের কত তুচ্ছ খবরই যে জানিতে চায়। আগ্রহ দেখায় না বটে, দুঃসংবাদে বিচলিতও হয় না, সুসংবাদে খুসীও হয় না, তবু নির্বিকার সহিষ্ণুতার সঙ্গে কান পাতিয়া সব কথা তো শোনে, মুখ ফুটিয়া তো বলে 'তাই নাকি' অথবা 'বেশ বেশ'।

সদর পরে হইয়া আসিলে অন্দরের উঠান, ফুলের চারায় ও ফলের গাছে বাগানের মত। একপাশে প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো ইঁদারা, জল বড় মিষ্টি আর ঠাণ্ডা। গরমের দিনে সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে আর ইঁদারার নতুন সিমেন্ট-করা গোলাকার চওড়া বাঁধটা হইয়া থাকে আগুন, হামাগুড়ি দিয়া একটিবার শুধু ক্ষণেকের জন্য ভিতরে উঁকি দিলে মনে হয়, জলে ডুবিয়া মরাই ভাল। পূর্ণিমার চাঁদের আলোতেও অত নিচের জল তো দেখা যায় না. গরমের দিনে রাত্রে তাই যে ভাবেই হোক মরার সাধ জাগানোর জন্য খালি গায়ে ঠাণ্ডা সিমেন্টে গা এলাইয়া দিতে সাধ যায়। ফুরফুরে হাওয়া থাক, অথবা দারুণ গুমোট হোক, রাশি রাশি ফুলের ঘন মিশ্রিত গন্ধে প্রথমে মন কেমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে এইটুকু যা অসুবিধা। একদিনও কি সদানন্দ পুরা একটা ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে পারিয়াছে!

উঠানের একদিকে সদর, বাকী তিনদিকেই প্রায় ঘর—কোন ঘরের সামনে বারান্দা আছে, কোন ঘরের সামনে নাই। অন্দর পার হইয়া নদীর দিকে অন্তঃপুর। অন্তঃপুরেও উঠান আছে, তবে অন্দরের উঠানটির তুলনায় আকারে অনেক ছোট আর আগাগোড়া সিমেন্ট-করা। না আছে ফুলের চারা, না আছে ফলের গাছ, শুধু ঝকঝকে তকতকে মাজাঘষা পরিচ্ছন্নতা। এক কোণে কেবল একটা তালগাছ আকাশে মাথা তুলিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বুঝি জীবন্ত কিছু, চিরদিনের জন্য সদানন্দের অন্তঃপুরে বন্দী হওয়ায় ব্যাকুল আগ্রহে মাথা উঁচু করিয়া বাহিরের জগতে উঁকি দিতেছে: গাছটায় ফল ধরে না, কোনদিন নাকি ধরিবেও না।

অন্তঃপুরে ঢুকিবার একটি খিড়কি পথ আছে, নদীর দিকে প্রাচীরের গায়ে বসানো ছোট একটি দরজা। ঘরের জানালা দিয়ে সারাদিন সদানন্দ আজ রাধাই নদীতে জলের আবির্ভাব দেখিয়াছিল, তারপর খিড়কির দরজায় বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল আট-চালার সভায়। এখন মন্থরপদে ফিরিয়া আসিয়া শিকলতোলা দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, বাহিরের মায়া-

মদ্যপায়ী মাতালের মত ভুঁড়ির উপর দুটি হাত রাখিয়া সামনে পিছনে একটুখানি টলিতে টলিতে বিড় বিড় করিয়া কি যে বলিতে লাগিল নিজের কানেই তা গেল না। নিজের কথা শুনিবার স্পৃহাও আর নাই। মনে তার শান্তি নাই কেন, এত মানুষকে সে শান্তি বিলাইতেছে! এত ক্ষোভ কেন তার, এমন আকস্মিক ক্রোধের সঞ্চার? কারও সে ক্ষতি করে নাই, কারও উপরে তার হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই,—বিপিনের কাণ্ডে মাঝে মাঝে রাগও হয় ঘৃণাও জাগে বটে, কিন্তু বিপিনকে সে ভালই বাসে, এ জগতে বিপিন তার সবচেয়ে আপন, একমাত্র প্রাণের বন্ধু। এমন জ্বালাভরা অস্থিরতা তবে সে বোধ করে কেন? ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের মায়ার নেশা যেন গাঢ় হইয়া আসে, আশ্রমে ঢুকিতে অনিচ্ছা বাড়িয়া যায়। শিকল খুলিয়া সদানন্দ তাই গায়ের জোরেই অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়ে, সশব্দে ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দেয়।

উঠানের তালগাছে ঠেস দিয়া একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সদানন্দের বিরক্তির সীমা থাকে না। রাগ করিয়া বলে—কে গা তুমি? কি করছ এখানে?

—চুপ। আমি কেউ না।

কথাগুলি জড়ানো কিন্তু গলাটি মিষ্টি—অল্পবয়সী মেয়ে। দক্ষিণের বড় ঘরের বারান্দায় আর পশ্চিমের ছোট ঘরখানার রোয়াকে দুটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে, মেয়েটির গায়ে আলো পড়িয়াছিল যথেষ্ট। সদানন্দ চাহিয়া দেখে নাই, নতুবা বুঝিতে পারিত, মেয়েটি আশ্রমের কেউ নয়। এত কমবয়সী মেয়েও আশ্রমে কেউ থাকে না, আশ্রমের মেয়েদের বেশ-ভূষাও এরকম নয়।

কাণ্ডটা বিপিনের বুঝিতে পারিয়া সদানন্দের বিরক্তি আরও বাড়িয়া গেল। আগে হইতে কিছু না জানাইয়া বিপিনের যে কোথা হইতে এরকম এক একটি খাপছাড়া মেয়েকে আশ্রমে আনিয়া হাজির করে! গত বৈশাখের মাঝবয়সী স্ত্রীলোকটিকে ধরিলে এটি বিপিনের সাত নম্বরের ম্যাজিক। পাল্কীতে তবে মহীগড়ের রাজাসায়েব আসে

নাই, আসিয়াছেন ইনি। বৈশাখের ব্যাপারে সদানন্দ ভয়ানক রাগ করায় বিপিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর এসব ঘটিবে না, কোনদিন নয়। ক'মাসের মধ্যেই বিপিন প্রতিজ্ঞার কথাটা তাহা হইলে ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়া যাওয়ার আগে একটু আভাস দেওয়াও দরকার মনে করে নাই, তাকে যে কথা দিয়াছিল সেটা মানিয়া চলা সম্ভব হইবে না। দুঃখে অপমানে নিজেকে সদানন্দের একান্ত অসহায় বলিয়া মনে হয়। বিনা-মূল্যে কিনিয়া বিপিন যেন তাকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এবার সে ছাড়িবে না, এবার একটা চরম বোঝাপড়া করিতে হইবে বিপিনের সঙ্গে।

খুব বেশী বিব্রত বোধ না করিলে অন্তঃপুরে উঠানে খাপছাড়া নিঃসঙ্গ তালগাছটার গুঁড়িতে মেয়েটাকে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সদানন্দের হয়তো মনে হইত, মন্দ মানায় নাই। কবে কে দা কুড়াল কিছু একটা অস্ত্র দিয়া আঘাত করিয়াছিল গাছটার গুঁড়িতে, সেই ক্ষতের চিহ্ন, মাটি ঘেঁষিয়া কয়েকটা সরু সরু শিকড়ের ইঙ্গিত, সিমেন্টে বিপিন কবে আনমনে পানের পিক ফেলিয়াছিল তার প্রায় মুছিয়া যাওয়া দাগ, হাত দেড়েক তফাতে নর্দমার কাছে এক বালতি জল আর একটা ঘষামাজা ঘটি আর এই আবেষ্টনীর মধ্যে অতিরিক্ত একটি মেয়ে। কিন্তু রাগে সদানন্দ অন্ধকার দেখিতেছিল।

রাগ চাপিয়া কোনরকমে সে বলিল—এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাছা, ঘরে গিয়ে বোসো?

—আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার কি?

জড়ানো সুরে কথাগুলি বলিয়া গাছের আশ্রয় ছাড়িয়া সদানন্দের ঝকঝকে তকতকে সিমেন্ট-করা উঠানে হিলতোলা জুতা ঠুকিয়া মেয়েটি আগাইয়া আসিল কাছে, খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল সদানন্দের হাত। হয়তো টাল সামলানোর জন্য।

—তুমি সাধুজী, না?

মুখে তীব্র মদের গন্ধ। যে গন্ধে সদানন্দের চিরকাল বমি আসে। জবাব না পাইয়াও আহ্লাদে মেয়েটি যেন গলিয়া গেল, দু হাতে

সদানন্দের গলা জড়াইয়া গদগদ হইয়া বলিল—শোন, আমি কেউ নয় বললাম না এক্ষুণি তোমাকে, তা সত্যি নয়। আমি মাধবীলতা—লতাটা কেটে বাদ দিয়েছি একদম।

বলিয়া খিল খিল করিয়া মাধবীর কি হাসি! গলায় জড়ানো হাতের বাঁধন খুলিয়া সদানন্দ তাকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরে চলিয়া গেল। পড়িয়া গিয়া আঘাতের ব্যথায় মাধবীলতা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাধবীলতার কান্না শুনিয়া পূবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল বিপিন আর সাহেবী পোশাক-পরা একটি যুবক। দুজনে ধরাধরি করিয়া মাধবীকে তাকে লইয়া গেল ঘরে। মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলি নালিশ করিতে লাগিল, সাধুজী আমায় মেরেছে, ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আমি এখানে থাকব না, আমায় নিয়ে চল।

আট-বেয়ারার পাল্কী চাপিয়া মহীগড়ের রাজা আজ আসে নাই। আসিয়াছে রাজপুত্র। মাধবীলতাকেও সঙ্গে আনিয়াছে সে-ই। আনিয়াছে পাল্কীর মধ্যে এককোণে লুকাইয়া। একেবারে অন্দরে ঢুকিয়া পাল্কী থামিয়াছে, রাজাসায়েব স্বয়ং রাণীসায়েবাকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে আসিলে যেখানে থামে। রাজপুত্রের গায়ে ভর দিয়া মাধবী-লতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

অন্দর তখন একরকম ফাঁকাই ছিল, তবু মহীগড়ের রাজার বদলে রাজপুত্র আর রাণীর বদলে মাধবীলতার আগমন কারও নজরে পড়িয়াছে কিনা বলা শক্ত। এ রকম অবস্থায় তাকে আশ্রমে কয়েক দিনের জন্যও রাখা সঙ্গত হইবে কিনা, বিপিন ও রাজপুত্রের মধ্যে এতক্ষণ সেই পরামর্শ চলিতেছিল। বিপিন বার বার অনুযোগ দিয়া বলিতেছিল, এরকম প্রকাশ্যভাবে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনা সত্যই বড় অন্যায় হইয়াছে রাজপুত্রের। আগে একটা খবর যদি সে পাঠাইত বিপিনকে, বিপিন সব ব্যবস্থা করিয়া দিত, এতটুকু হাঙ্গামাও হইত না, রাজপুত্রের ভাবনারও কিছু থাকিত না।

রাজপুত্রের নাম নারায়ণ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুদর্শন চেহারা, মাঝে

মাঝে মুখে অনাচার-অত্যাচারের যে ছাপটুকু পড়ে সেটা স্থায়ী হয় না, দুদিন বিশ্রাম করিলেই মুছিয়া যায়, মুখে আবার স্বাস্থ্যের অমলিন জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে! এখন মুখখানা উত্তেজনা ও ভয়ে অস্বাভাবিক রকম পাণ্ডুর দেখাইতেছে, চাউনি দেখিলেই টের পাওয়া যায় মানুষটা এখন বিহ্বল।

বিপিনের অনুযোগের জবাবে সেও অনেকবার বলিয়াছে—কি করব বলুন, এমন একগুঁয়ে বলবার নয়। সব ব্যবস্থা আমিই ঠিক করে ফেলেছিলাম, ওর জন্যেই সব ভেস্তে গেল। শেষ মুহূর্তে কোথায় যাই, তাই এখানে ছুটে এলাম।

বিপিন তখন আশ্বাস দিয়া বলিয়াছে—যাক্ যাক্ কি আর হবে, ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাধবীলতাকে শান্ত করিতে বেশী সময় লাগিল না, ছোট ঘরখানায় চৌকীর উপর বিছান ময়ূর-আঁকা মাদুরে সে গুম্ খাইয়া বসিয়া রহিল। রাজপুত্র নারায়ণ তখন পূবের ঘরে আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিল। সদানন্দ কোনদিন কাহাকেও আশীর্বাদ করে না, বিড়বিড় করিয়া মুখে একটা আওয়াজ করে মাত্র। আজ তাও করিল না।

ঘরের আলোটা সদানন্দ কমাইয়া দিয়াছিল, বিপিন বাড়াইয়া দিল। দেখা গেল, নারায়ণের মুখের পাংশু বিবর্ণভাবটা বড় বেশীরকম স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সদানন্দকে সে কোনদিনই বিশেষ খাতির করে না, ভয় ভক্তি করার দরকারও কোনদিন বোধ করে নাই। আজ তার সবটুকু তেজ আর বেপরোয়াভাব উবিয়া গিয়াছে।

বিপিন নিবেদন করিল—রাজাসাহেব আসেন নি প্রভু। নারায়ণবাবু একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে আশ্রমে ভর্তি করে দিতে এনেছেন। মেয়েটির কেউ নেই প্রভু।

—থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। আর তোমরা যাও বিপিন।

—আসনে বসবেন প্রভু?

—যেতে বললাম যাও না বিপিন, আমায় একটু একা থাকতে দাও।

বিপিনের মুখ দেখিয়া রাগ বোঝা যায় না, কেবল তার কপালে

কয়েকটা রেখার সৃষ্টি হয় আর চোখের পলক-পড়া অনিয়মিত হইয়া যায়। নারায়ণকে সঙ্গে করিয়া বিপিন ঘর হইতে চলিয়া গেল। ঘণ্টা দুই পরে সে যখন আবার ঘরে আসিল, সদানন্দ ঘুমের ভান করিয়া খাটের উপর গদির বিছানায় পড়িয়া আছে। গায়ে ঠেলা দিয়াও তার ঘুম ভাঙ্গাইতে না পারিয়া চাপা গলায় তাকে একটা কুৎসিত গাল দিয়া বিপিন চলিয়া গেল। সদানন্দের বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, সেবার ব্যবস্থাটাও আজ একটু বিশেষ রকমের হইয়াছে, কাছাকাছি একটা গ্রাম হইতে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে কে যেন আজ নানারকম সুখাদ্য পাঠাইয়া দিয়াছে আশ্রমে। বিপিনের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভয়ে না খাইয়াই আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিল খুব ভোরে, ভাল করিয়া তখনও চারিদিক আলো হয় নাই। পাশ না ফিরিয়াই বোঝা গেল কে যেন পিঠের সঙ্গে মিশিয়া শুইয়া আছে। মশারি ফেলিতে সদানন্দের মনে ছিল না, কে যেন মশারি ফেলিয়া সযত্নে গুঁজিয়া দিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া সদানন্দ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মাধবীলতার শুইবার ভঙ্গিটি মনোরম নয়, তাছাড়া তার নিজের দেহের উপর মাঝ রাত্রি পর্যন্ত তার নিজেরই ছটফটানির ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এদিকে সদানন্দও প্রায় একযুগ হইল সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া পিঠের সঙ্গে মেশা কুণ্ডলীপাকানো পুঁটুলির মত নারীদেহ চাহিয়া দেখে নাই। হঠাৎ চোখ ফিরাইতে পারিল না.

তাছাড়া, বিপিন যে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনিয়াছে এ অপমানের জ্বালা আছে, প্রতিকার নাই, প্রতিকারহীন অপমানের আছে শুধু প্রতিশোধের কামনা। বিপিন যে কতদূর ছোটলোক-এই চিন্তার ছেদ দিয়া ছাড়া ছাড়া ভাবে সদানন্দ ভাবিতে থাকে, আহা, মেঘলা ভোরে মেয়েটি শীতে কেমন জড়সড় হইয়া গিয়াছে দেখো। গরমে নিজের দেহ যে ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এটা সদানন্দের খেয়ালও হয় না। শীতের জন্যই মাধবীলতার এমন অদ্ভুত শোয়ার

ভঙ্গি, এই অকাট্য যুক্তির কাছে গরমের অনুভূতি হার মানে। এইভাবে মাধবীলতাকে দেখিতে দেখিতে মনের আকাশ-পাতাল আলো-অন্ধকার কি ভাবে যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল, অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হওয়ার বদলে সময় বর্তমানকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে খাইতে আবর্ত রচনা করিতে লাগিল। মনটা বিদ্রোহ করিয়া বসিল সদানন্দের, একবার চাহিল রুদ্ধ দরজার দিকে, একবার চাহিল জানালা দিয়া খানিক তফাতে রাধাই নদীর দিকে, তারপরে দুহাত বাড়াইয়া পুতুলের মত মাধবীলতাকে তুলিয়া লইল বুকে।

তখন অবশ্য মাধবীলতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। পুতুলটি যেন অন্য কেউ এমনিভাবে কৌতূহলী চোখ মেলিয়া মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত প্রৌঢ়বয়সী দৈত্যটির পুতুল-খেলার মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

২

[লেখকের মন্তব্য: ভাবিয়া দেখিলাম, গল্পের মধ্যে ইঙ্গিত পরিস্ফুট করিয়া তোলার পরিবর্তে মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কার ও মনোভাব পরিবর্তনের কথাটা আমার বলিয়া দেওয়াই ভাল। সংক্ষেপে বলাও হইবে, নীরস অশ্লীলতার ঝাঁঝও এড়ানো চলিবে। সদানন্দের ধারণা হইয়াছিল, মেয়েটি ভাল নয়। মাধবীলতার প্রতিবাদহীন আত্মদান এই ধারণাকে সমর্থনও করিত। কিন্তু সদানন্দ জানিতে পারিল, মাধবীলতা কুমারী।

একটা কথা স্পষ্ট বলিয়া রাখি। মাধবীলতা ভাল কি মন্দ এটা তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা নয়, আমার মতামতের কথা বলিতেছি না। সদানন্দের ধারণার কথা হইতেছে। আমার মন্তব্য হইতে মাধবীলতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হিসাবে বড় জোর এইটুকু অনুমান করিয়া লইবার অনুমতি দিতে পারি যে, পুরুষ সম্বন্ধে মাধবীলতার অভিজ্ঞতা ছিল না। নয় তো অবসাদে যতই কাবু হইয়া পড়ুক, চাঁদ-হারানো মাঝরাত্রির অন্ধকারে অচেনা অজানা যায়গায় আনাচে কানাচে যত ভয়ই জমা থাক, বিপিন আর নারায়ণের চেয়ে বিখ্যাত সাধু সদানন্দকে যতই নিরাপদ মনে হোক, সদানন্দের শয্যায় গিয়া সদানন্দের পিঠ ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িবার মধ্যে কোন যুক্তি থাকে না। মশারি ফেলিয়া দিলে যে মশা কামড়াইবে না, এ জ্ঞানটা তো মাধবীলতার বেশ টনটনে ছিল।]

আশ্রমের খানিক তফাতে নদীর ধারে একটা মোটা কাঠের গুঁড়িতে সদানন্দ মাঝে মাঝে বসিয়া থাকে। সেইখানে বিপিন তাকে আবিষ্কার করিল। তখনও সূর্য আকাশে বেশী উঁচুতে ওঠে নাই। নদীর জল রাতারাতি আরও বাড়িয়াছে, ঘোলাটে জলের স্রোতে এখনও অনেক জঞ্জাল ভাসিয়া যাইতেছে, শুকনো নদীতে অনেকগুলি

মাস ধরিয়া যে সব আবর্জনা জমা হইয়াছিল। কাছাকাছি ছোট একটি আবর্তে কয়েকবার পাক খাইয়া একটা মরা কুকুর ভাসিয়া গেল। বড় আপসোস হইতেছিল সদানন্দের, অনুতাপমিশ্রিত গ্লানিবোধ। তবু শরীর মন যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। করুণা ও মমতার ব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত, তবু আনন্দের একটা অক্ষয় প্রলেপ পড়িয়াছে, মৃদু ও মধুর। ব্যাপারটা সদানন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অন্যায়ের শাস্তি ও পুরস্কার কি এমনিভাবে একসঙ্গে আসে?

বিপিন পাশে বসিতে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিপিন বোঝা-পড়া করিতে আসে নাই, ভাব করিতে আসিয়াছে। এ কাজটা বিপিন ভাল পারে না, বন্ধুত্বের ফাটল ঝালাই করার কৌশল তার জানা নাই। রাজপুত্রের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সদানন্দের ঘরে মাধবীলতার রাত কাটানো লইয়া একটু পরিহাস করিতে যায়, তারপর সদানন্দের মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলে—বড় ছেলেমানুষ তুই, রাগিস কেন? তুই ছাড়া আর কারও ঘরে ওকে থাকতে দিতাম? তোর কাছে ছিল বলেই নারায়ণবাবুরও ভাবনা হয় নি, আমারও ভাবনা হয় নি।

এতবড় তোষামোদেও সদানন্দ খুসী হইল না দেখিয়া বিপিন মনে মনে রাগিয়া গেল। বিপিন রাগিলেই সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে সেটা টের পায়, দুজনের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা আছে তাদের, একটা অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ আছে, বোধ হয় ইন্দ্রিয়ের যখন বিকাশ হইতে থাকে সেই শৈশব হইতে পরস্পরকে তারা ভালবাসিয়া আর ঘৃণা করিয়া আসিতেছে। এজন্য কতবার ছাড়াছাড়ি হইয়াছে জীবনে কিন্তু এ জগতে নূতন আর একটি বন্ধুও তারা খুঁজিয়া পায় নাই। ছাড়াছাড়ি যখন হইয়াছে, অপর জন মরিয়া আছে না বাঁচিয়া আছে, এ খবরও যখন তারা দীর্ঘকাল পায় নাই, কারও মন এতটুকু খারাপ হয় নাই, আবার যখন দেখা হইয়াছে তখনও হয় নাই আনন্দ। কয়েকটা দিনরাত্রি কেবল তখন একসঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে—পরস্পরের

মধ্যে মসগুল হইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলিয়া আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া থাকিয়া।

সদানন্দ ঘাড়ে হাত রাখিবামাত্র বিপিন ঘাড় ফিরাইয়া অন্যদিকে তাকায়, একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় বিপিনের এই ভাবপ্রবণতা, তার ক্রোধে অভিমানের এতখানি ভেজাল।

—তুই যা ভাবছিলি তা ঠিক নয় সদা, মেয়েটি সত্যি ভাল। ওকে না জানিয়ে নারাণবাবু চলে গেছে বলে সেই থেকে খালি কাঁদছে।

—নারাণ আর আসবে না?

—আসবে, ওবেলা নয় তো কাল সকালে। চার-পাঁচদিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে মাধবীকে নিয়ে চলে যাবে, এ কটা দিন একটু রয়ে সয়ে কাটিয়ে দে সদা, দোহাই তোর। আর কেউ হলে কি আশ্রমে উঠতে দিতাম? রাজা সায়েবের ছেলে, দুদিন পরে নিজে সব কিছুর মালিক হবে, ওকে তো চটানো যায় না, তুই বল, যায়?

সদানন্দ গম্ভীরমুখে বলিল—বড়লোকের পা চাটা আর টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটবার জন্য কি আশ্রম করেছিলি বিপিন? তা হলে ব্যবসা করলেই হত?

বিপিন তর্ক করিল না, হাত জোড় করিয়া হাসিয়া বলিল—এ ব্যবসা মন্দ কি প্রভু?

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল—তামাসা রাখ, ভাল লাগে না। দিন দিন তুই যে কি ব্যাপার করে তুলছিস বুঝতে পারি না বিপিন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রম করা হয়েছিল সব চুলোয় গেছে, তোর খালি টাকা টাকা টাকা। টাকা ছাড়া কিছু হয় না বলেছিলি, টাকা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন? এবার আসল কাজে মন দে না ভাই—এসব ছেড়ে দে। আর টাকাই যদি তোর বড় হয়, তুই থাক তোর আশ্রম নিয়ে, আমি চলে যাই। দিন দিন আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার আর সয় না।

নালিশটা নতুন নয়, সদানন্দের বলিবার সকরুণ ভঙ্গিতে বিপিন আশ্চর্য হইয়া গেল। একটু ভাবিয়া সে একটা নিঃশ্বাস [illegible]

জোরে, যতদূর সম্ভব মর্মাহত হওয়ার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল—টাকা ! টাকা দিয়ে আমি করব কি ? তুই কি ভাবিস টাকার লোভে আমি টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটি ? কতবার তোকে বলেছি সদা, তুই বুঝবি না কিছুতে, টাকা ছাড়া কিছু হয় না। কত লোক আশ্রমে এসে থাকতে চায়, থাকবার ঘর নেই, ঘর তোলবার টাকা নেই। দক্ষিণের আম বাগানটা কিনে ফেলা দরকার, টাকা আছে কেনবার ? এবার যদি নারাণবাবু কিনে দেন। তুই আদর্শ জানিস সদা, কিসে কি হয় জানিস না। বড় কাজ করতে চাইলেই কি করা যায় ? করতে জানা চাই। ভেবে ছাখ, এই যে আশ্রমটা হয়েছে, এতগুলি লোক আশ্রমে বাস করছে, দলে দলে লোক এসে তোর উপদেশ শুনে যাচ্ছে, আমি ফন্দি না আঁটলে এইটুকুও কি হত ? রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ তোর কথা শুনতো না। ভাল উদ্দেশ্যে ছুটো মিথ্যে কথা, একটু ভড়ং এসবে দোষ হয় না। নারাণবাবু একটা মেয়েকে বার করে এনেছে তো আমাদের কি ? আমরা আশ্রমে উঠতে দিলেও বার করে আনত মেয়েটাকে, না দিলেও বার করে আনত। আমরা শুধু এই সুযোগে আশ্রমের একটু উন্নতি করে নিচ্ছি। এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাস না, তোর কাজ তুই করে যা, আমার কাজ আমি করে যাই, একদিন দেখবি আমাদের এই আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে।

বিপিনের এত বড় বক্তৃতার জবাবে সদানন্দ শুধু বলিল—আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবার জন্য আমার তো ঘুম আসছে না।

—ঘুম তোর খুব আসে, মোষের মত ঘুমোস সারারাত। তোর মত শুয়ে আরামে বসে দিন কাটাতে পারলে আমারও ঘুম আসত। —বলিয়া বিপিন রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে সদানন্দ ভিতরে গেল। ছোট ঘরের চৌকীতে সেই ময়ূর-আঁকা মাছুরে মাধবীলতা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বিপিন বোধ হয় তাকে চা আর খাবার আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে খায় নাই। কথা

গলিয়া গিয়া মাধবীলতার জীবন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেই ছিল একমাত্র আশ্রয়, আর কারও কথা মাধবীলতা জানে না। প্রেমিক? এতটুকু মেয়ে, কুমারী মেয়ে, সে প্রেমের কি জানে, প্রেমিকের দাম তার কাছে কতটুকু? খেলার সাথী হিসাবে শুধু তার প্রয়োজন হয় একটু, না হইলেও চলে, একটু মন-কেমন-করার মধ্যেই সে অভাবের পূরণ হয়।

—মুখ তোলো মাধবী, উঠে বোসো। ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে দেব।

মাধবী উঠিয়া বসিল। আঁচলে ভাল করিয়া চোখ মুছিবার পর তার মুখ দেখিয়া কে বলিবে এইমাত্র সে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল!

—আশ্রমে অনেক মেয়ে থাকে, চল তোমাকে তাদের কাছে দিয়ে আসি।

মাধবীলতা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—চলুন।

সদানন্দ একটু হাসিয়া বলিল—আগে মুখ ধুয়ে কাপড়টা বদলে এসো, গালে তোমার সন্দেশ লেগে আছে, কাপড়ে চা ভর্তি।

মুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া মাধবী প্রস্তুত হইলে সদানন্দ তাকে সঙ্গে করিয়া খিড়কি পথেই বাহির হইল। বিপিন বোধ হয় সদরের দিকে কোথাও আছে, তার সামনে পড়িবার ইচ্ছা ছিল না। গোলমাল বিপিন করিবেই, তবে সেটা এখন মাধবীলতার সামনে না ঘটাই ভাল। আশ্রমের দুটি অংশের মধ্যে পায়ে পায়ে দু-তিনটি আঁকা বাঁকা সরু পথ আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। আর কোন পথ নাই। মাধবীলতা যেন বেশ উৎসাহের সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে, তপোবনের শোভা দেখিয়া সে যেন খুসী হইয়াছে, ভিজা মাটিতে পা ফেলিয়া হাঁটিতে যেন আরাম পাইতেছে। বলা মাত্র সে যে তার সঙ্গে নূতন একটা আশ্রয়ে যাইতে রাজী হইয়া যাইবে, এটা সদানন্দের কাছে আশ্চর্য ঠেকে নাই। এখন তার ভাবনা, ঝোঁকের মাথায় রাজী হইয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত আশ্রমে সে থাকিতে চাহিবে কি না। হয়তো নারায়ণ আসিয়া ডাকিলে তার মনে হইবে,

আশ্রমে থাকিয়া জীবনটা নষ্ট করার বদলে তার সঙ্গে চলিয়া যাওয়াই ভাল।

তখনও আশ্রমের সকলের ধ্যানধারণা সাধনভজন শেষ হয় নাই। গুরুদেবের পদার্পণে অনেকেরই কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া গেল বটে, কয়েকজন আরও বেশী আসন কামড়াইয়া চোখ বুজিয়া রহিল। গুরুদেব খোঁজ করিয়া জানিবেন, সকলে ইতিমধ্যেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে কিন্তু তারা ধ্যানধারণায় এখনও মশগুল, গুরুদেবের আবির্ভাব পর্যন্ত টের পায় না এমন আত্মহারা। জানিয়া গুরুদেব নিশ্চয় খুসী হইবেন, এরাই তাঁর খাঁটি শিষ্য। আশ্রমে এরকম অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ জন সাতেক অন্ধ ভক্ত বাস করে, অন্য সকলের তুলনায় এদের ভক্তির বাড়াবাড়িতে সদানন্দকে মাঝে মাঝে রীতিমত বিব্রত হইতে হয়। দুজন বিধবা মহিলা আছে এই রকম, কি যেন একটা সম্পর্কও আছে দুজনের মধ্যে, পিসী ভাইঝির সম্পর্কের মত। একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, শুষ্ক শীর্ণ চেহারা, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ। বৌয়েরা সকলে ধীরে ধীরে খোলস ছাড়িয়া একে একে অবাধ্য হইতে আরম্ভ করায় এবং ছেলেরা সকলে একজোট হইয়া বৌদের পক্ষ নেওয়ায়, ছেলে-বৌ-নাতি-নাতনীতে ভরা প্রকাণ্ড সংসার ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়া ডেরা বাঁধিয়াছে।

অপরজনের বয়স কম, বছর ত্রিশেক হইবে। গোলগাল ফর্সা রসালো চেহারা, হঠাৎ অপদস্থ হইলে মানুষের মুখের ভাব যেমন হয়, সব সময় মুখে সেই রকম একটা সকাতর লজ্জার ভাব ফুটিয়া থাকে। সংসারত্যাগী বয়স্কা মহিলাটির সঙ্গে সে থাকে এবং সকল বিষয়ে তাকে অনুকরণ করিয়া চলে। ঘুম হইতে ওঠে একই সময়ে, স্নান ও জপতপ সারে একই সময় ধরিয়া, আহার করে একই খাদ্য—পরিমাণটা পর্যন্ত সমান রাখিতে চেষ্টা করে।

বয়স্কা মহিলাটি অন্য সব অনুকরণে সায় দেয়, গোলমাল করে কেবল খাদ্যের পরিমাণটা লইয়া। বলে—মরণ তোমার! আমি অম্বুলে রুগী, যা দাঁতে কাটি তাতেই বুক জ্বলে, আমার সাথে পাল্লা দিয়ে

খেলে তুই বাঁচবি কেন শুনি? নে, দুধটুকু গিলে ফ্যাল্ দিকি ঢক করে।

অপরঞ্জন মিনতি করিয়া বলে, বমি হয়ে যাবে পিসীমা—অত দুধ খেলে নিশ্চয় বমি করে ফেলব।

দুধ তাকে খাইতে হয় সমস্তটাই, খানিক পরে একটা খোঁচাও খাইতে হয়—কৈ লো রত্নী, বমি হয়ে যাবে? বাঁচতে সাধ না থাকে বিষ খেয়ে মরগে যা, নয় তো গলায় দড়ি দে—না খেয়ে শুকিয়ে মরা চলবে না বাপু আমার কাছে!

এর নাম রত্নাবলী। পিসীমা কখনও ডাকে রত্নী, কখনও বলে রতন। পিসীমার নাম উমা। সদানন্দ ছাড়া এজগতে তার নাম ধরিয়া ডাকিবার আর কেউ নাই—একজন ছিল, মাঝে মাঝে নাম ধরিয়া ডাকিত, মস্ত সংসারটা গড়িয়া দিয়া অনেকদিন আগে বিদায় লইয়াছে, যে সংসার ছাড়িয়া উমা এখানে আসিয়াছে, ছেলে-বৌ-নাতি-নাতনীতে ভরা বিরাট সংসার।

মাধবীলতাকে সদানন্দ এদের কাছে জমা করিয়া দিল। বলিল —মেয়েটি আজ আশ্রমে ভর্তি হল, মেয়েটির কেউ নেই উমা।

রত্নাবলী খুসী হইয়া উঠিল, উমা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মাধবীলতার দিকে চাহিতে লাগিল। বোঝা গেল, আশ্রমে হঠাৎ এই বয়সী একটি মেয়ের আবির্ভাবে তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইতেছে, সদানন্দের কাছে যেগুলি মুখে উচ্চারণ করিবার সাহস তার নাই।

ঘরের সম্মুখে কার্পেটের আসন পাতিয়া সদানন্দকে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। কোলের উপর ডান হাতের তালুতে বাঁ হাতের তালু রাখিয়া মেরুদণ্ড সিধা করিয়া দেবতার মত সদানন্দ বসিয়াছে, আনন্দ বেদনার অতীত ধীর স্থির বিকারহীন একস্তূপ মূর্তিমান শক্তির মত—সংহত ও সচেতন। সোজা উমার মুখের দিকে চাহিয়া বজ্র-গম্ভীর ধমকের আওয়াজে সদানন্দ বলিল—তুমি কি ভাবছ উমা?

আর কি ভাবছ উমা, ধূলায় গড়া ভঙ্গুর পুতুলের মত উমা চুরমার হইয়া গিয়াছে। পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া উমা অসম্বদ্ধ প্রলাপ

বকিতে থাকে, মুমূর্ষু জন্তুর মত জীর্ণশীর্ণ দেহটা থরথর করিয়া কাঁপে। গুরুদেবের সম্বন্ধে অন্যায় কথা মনে আসিয়াছে, গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, একি আকস্মিক সর্বনাশের সূচনা!

রত্নাবলীর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে, আশ্রমবাসী আরও যে কয়জন নরনারী ইতিমধ্যে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল, তাদের মুখও বিবর্ণ। মাধবীলতা সভয় বিস্ময়ে একবার ভূলুণ্ঠিতা উমার দিকে, একবার সদানন্দের মুখের দিকে চাহিতে থাকে। মানুষের উপর যে মানুষের এতখানি প্রভাব থাকে, একটিমাত্র ধমকে যে কেহ উমার বয়সী নারীকে পায়ের নিচে লুটাইয়া দিতে পারে, মাধবীলতার তা জানা ছিল না। তার নিজের বুকের মধ্যেও টিপ্ টিপ্ করিতেছে দেখিয়া সে আরও অবাক হইয়া গেল।

সদানন্দ মৃদুস্বরে বলিল—উঠে বোসো উমা।

উমা উঠিয়া বসিলে তেমনি মৃদু ও শান্ত কণ্ঠে বলিল—মনকে সংযত রেখো। মন হলো ঘরের মত, ধুলো-বালি এসে জমা হয়, ঝাঁট দিয়ে সে-সব সর্বদা সাফ করে নিতে হয়, নইলে ঘর যেমন আবর্জনায় ভরে ওঠে, মনও তেমনি কুচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

উমা মাথা নিচু করিয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দের সাংঘাতিক নির্মমতার এই প্রকাশ্য অভিব্যক্তি মাধবীলতাকে ভীত ও সকাতর করিয়া তোলে। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া সদানন্দের কথা শুনিতেছিল, দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া মাধবীলতা মেঝেতেই বসিয়া পড়িল।

তখন সদানন্দ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিল—মেয়েটি তোমাদের কাছে থাকবে উমা, তোমরা ওকে দেখাশোনা কোরো। বোসো তোমরা—আর সকলে কোথায়?

একজন শিষ্য তাড়াতাড়ি আশ্রমের সকলকে ডাকিয়া আনিতে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রমের সকলে উমা ও রত্নাবলীর কুটিরের সম্মুখে আসিয়া জমা হইল, আসনে বসিয়া যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল সেও। ঈশ্বরকে ডাকার চেয়ে গুরুদেবের ডাক বড়।

মাধবীলতাকে নিয়া বাহিরে কিছু হৈ চৈ হইল না। রাজপুত্র নারায়ণের আশঙ্কাটা দেখা গেল নিছক তার নিজেরই কল্পনা—অন্যায়ে অনভিজ্ঞ মনের স্বাভাবিক ভীরুতার ফল। যাদের কাছ হইতে চুরি করিয়া আনা হইয়াছে মাধবীলতাকে, চোর বা বমাল সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথার লক্ষণ টের পাওয়া গেল না। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, জীবনের আকস্মিক গতিপরিবর্তনের ধাক্কায় আহত ও বিব্রত মাধবীলতার রক্তমাংসের ক্ষয় বন্ধ হইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ফিরিয়া আসিতে লাগিল স্বাভাবিক ইক্ষুদণ্ডের রঙ—তাদের কোন সাড়া শব্দই পাওয়া গেল না যাদের কথা ভাবিয়া মাধবীলতাকে প্রকাশ্যে আশ্রমে আনার জন্য বিপিন নারায়ণকে অনুযোগ জানাইয়াছিল, অত পরামর্শ দরকার হইয়াছিল দুজনের।

নারায়ণ গোলমাল করিল না। হয়ত সাহস পাইল না, হয়ত ভাবিয়া দেখিল গোলমাল করা মিছে, অথবা হয়ত ঘাড়ের বোঝা নামিয়া যাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলিল স্বস্তির। আশ্রমে ভর্তি করার জন্যই মেয়েটিকে সে আনিয়াছে, প্রথমে এই কথা বলা হইয়াছিল সদানন্দকে, তার কাছে এই ঠাটই বজায় রাখিয়া চলিতে হইল আগাগোড়া। দেখা গেল, ঠাট বজায় রাখিতে সদানন্দও কম ওস্তাদ নয়। 'এসো বাবা, বোসো' বলিয়া রাজপুত্রকে সে বসাইল কাছে। রাজপুত্রের বেলা নির্বিকার ভাবটা কমাইয়া একটু স্নেহ জানাইবার জন্য বিপিনের যে অনুরোধ ও উপদেশ এতকাল কিছুতেই স্মরণ রাখিতে পারিত না, আজ যেন সেই অনুরোধ ও উপদেশের মর্যাদা সুদে আসলে দিবার জন্যই নির্বিকার ভাবটা বিসর্জন দিয়া জানাইল গভীর স্নেহ। বলিল—হাঁ, যাও, বেড়িয়ে এসো গে একটু নদীর ধার থেকে দুজনে। কবে আবার দেখা হয় তোমাদের ঠিক তো নেই। কেন যাবে না বাধু, যাও। শীগ্‌গির ফিরো—সন্ধ্যার আগে।

মাধবীলতাকে চোখের দেখা দেখিতে না দিয়াই সদানন্দ রাজপুত্র নারায়ণকে ফিরাইয়া দিতে পারিত, কারও ক্ষমতা ছিল না বাধা দেয়। বিপিন তো রাগ করিয়াছেই, না হয় আরও খানিকটা বেশী রাগ করিত। কিন্তু দুজনকে নির্জনে একটু আলাপ করিতে দেওয়াই সদানন্দ ভাল মনে করিল। দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার বলিয়া নয়—বোঝাপড়া হইবে না, এরকম অবস্থায় বোঝাপড়া হয় না, বোঝাপড়ার কিছু নাই। একটু আবোল তাবোল বকিবার সুযোগ পাক দুজনে। সদানন্দের জোর-জবরদস্তির অভিযোগ যেন ঘুণাক্ষরেও মনে না জাগে কারও: মাধবীলতা আশ্রমে থাকিতেছে স্বেচ্ছায়, নারায়ণ তাকে আশ্রমে রাখিয়া যাইতেছে স্বেচ্ছায়; এর মধ্যে আর কারও কর্তৃত্ব নাই। বিপিনও হয়ত একটু ঠাণ্ডা হইবে ব্যাপার বুঝিয়া, জোর দিয়া বলা চলিবে বিপিনকে যে, মাধবী থাকতে চাইলে আমি কি করব বিপিন?

এত সব ভাবিয়া সদানন্দ দুজনকে নদীর ধারে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিল। তবু একান্ত যুক্তিহীনভাবেই মনটা একটু উতলা হইয়া রহিল বৈকি! বর্ষার গোড়ায় একি অপরাহ্ণ আসিয়াছে আজ। দীপ্তি সম্বরণ করিয়া বর্ণচ্ছটা বিতরণের আর কি দিন জুটিত না অকালে ক্লান্ত সূর্যের। মন্থরগতিতে নদীতীরের কোনখানে ওরা দুজনে পৌঁছিয়াছে, কি বলাবলি করিতেছে নিজেদের মধ্যে। কত অভিমান আর অনুনয় না জানি রাজপুত্র প্রকাশ করিতেছে কথায়, সুরে, মুখের ভাবে, চোখের বিষাদে। অনুযোগ হইয়া উঠিতেছে মিনতি। মন যদি না মানে মাধবীর? মোড় যদি ঘুরিয়া যায় তার মনের? যদি সে তুলনা করে এই বিরাট-দেহ শ্রীহীন দরিদ্র প্রৌঢ়ের সঙ্গে রূপবান ধনবান সঙ্গী যুবকটির, আর তুলনা করিয়া যদি তার মনে খটকা বাধে যে কি হইবে ধার্মিকের মুখোস-পরা নরপিশাচটার আশ্রমে বাস করিয়া, তার চেয়ে রাজপুত্রের হাত ধরিয়া উধাও হইয়া যাওয়া ঢের ভাল, যাহোক তাহোক ফলাফল! সকাতর ক্লিষ্ট ঔৎসুক্যের সঙ্গে সদানন্দ দুজনের ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করে, নিজেকে নিজেই মনে

মনে বলে, আমি কি, অ্যাঁ?—অভ্যস্ত আত্মাদর যেন হীনভাবের আধিক্যে কোথায় তলাইয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য এবং এতক্ষণে প্রকৃত পুণ্যবানের মত অস্থায়ীভাবে বিনা প্রতিবাদে মাধবীলতা সম্পর্কে নিজেকে বিশ্বাস করিয়া ফেলে—পাপী। তেজস্বী কম নয় সদানন্দ। গোঁয়ার নয় বলিয়া বিপিন জানে মানুষটা সে নরম—খুঁটিনাটিতে যে সর্বদা হার মানে মোটামুটিতে কবে তার প্রচণ্ড তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছিল সে কথা মনে করিয়া রাখে কে? তেজস্বীর কাছে দুঃখ বেদনা সহজে আমল পায় না। কিন্তু অন্যায়ের ক্ষণিক উৎসমুখে নিবিড় মমতার এক অপরূপ মাধুর্য উৎসারিত হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, তার আপসোস বড় দুরন্ত। আহা কি মিষ্টিই ছিল মাধবীলতাকে উমার জিম্মা করিয়া দিয়া আসিবার পর হইতে, প্রায় সমস্ত রাত্রির অযাচিত জাগরণের ছটফটানি রীতিমত আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত, সেই বীভৎস করুণ পাশবিক মায়ার স্বাদ! অনাস্বাদিতপূর্ব সেই মাধুর্যের লোভেই হাল ছাড়িয়া দিয়া ধৈর্যহীন ক্লেদাক্ত দুঃখে কী কাবুই হইয়া পড়ে মহাতেজস্বী সদানন্দ।

সন্ধ্যা পার হইয়া যায়, দুজনের ফিরিবার নাম নাই। নিজের সঙ্গে নিজের বিষাক্ত আত্মীয়তা স্থাপনের মজাটা সদানন্দ পরিষ্কার টের পাইতে থাকে। তারপর যখন খবর আসে নারায়ণ চলিয়া গিয়াছে, মাধবীলতা উমা ও রত্নাবলীর কুটীরে ফিরিয়া গিয়াছে, তখন খুসী হইবার ক্ষমতাও থাকে না, এমনি নিস্তেজ আর ভোঁতা হইয়া পড়ে।

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা বিপিনও গোলমাল করিল না। অন্ততঃ সদানন্দ যেরকম ভাবিয়াছিল, সেরকমভাবে করিল না। পরের উত্তেজনা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া উত্তেজিত হওয়ার মত প্রথমটা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ফাটো ফাটো বোমার মত অবস্থায় সদানন্দের কাছে আসিয়া দাবী করিল—এর মানে?—সদানন্দ জবাব দেওয়া মাত্র বোমার মত ফাটিয়া গেল। ব্যাস্। আর কিছুই নয়। নিজের বিস্ফোরণে নিজেই যেন সে দারুণ আহত হইয়াছে, রাগ করিবারও আর ক্ষমতা নাই।

তারপর আশ্রমের কারও কাছে কিছু না বলিয়া সে যে কোথায় গিয়া গেল সে-ই জানে। মাধবীলতার সঙ্গে নদীর ধারে একটু পায়চারি করিয়া নারায়ণ যেদিন ফিরিয়া গেল, বিপিন সেদিন আশ্রমে অনুপস্থিত। আরও দুদিন পরে সে ফিরিয়া আসিল। গম্ভীর চিন্তিতমুখে সদানন্দকেই জিজ্ঞাসা করিল—মাধবী নারাণবাবুকে কি বলেছে ?

—আমি তো জানি না বিপিন। মাধবী যেতে চায় না, আমিই বলে কয়ে দুজনকে নদীর ধারে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছে আমি কি করে বলব ?

বিপিন হঠাৎ হাসিয়া বলিল - তোর পাতানো মেয়ে, তুই ছাড়া কে বলবে ? বাবা বলে ডাকে না তোকে ?

বিপিন কিছু সন্দেহ করিয়াছে নিশ্চয় এবং এটা তার নিছক সন্দেহমূলক কদর্য পরিহাস নয়। কিন্তু সদানন্দ ধরা দিল না। উদাসভাবে হাই তুলিয়া বলিল—পাতানো মেয়ে আবার কিসে !

ভিতরটা রি রি করিতে লাগিল। একটা যেন খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল বিপিনের সঙ্গে, যাতে জয় পরাজয়ের পার্থক্য নাই, তবু জয়ী হইলেই বেশী ক্ষতি। বিপিন হাত কচলায় আর ঠিক যেন মুখের হাসিটাকেই চিবাইতে চিবাইতে অশ্রুনিরোধের অভিনয় করিতে থাকে। কিছু ভাবিতেছে এমন কথা মনেও করা যায় না, জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে চুপ চাপ থাকিবার ভঙ্গিটা এমন খারাপ। হঠাৎ 'হুঁ' বলিয়া যেন ভাবিতে লাগিল তামাসা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবে কি না।

সদানন্দ ধৈর্য হারাইয়া বলিল - কি ভাবছিস শুনি ?

—কিছুই ভাবছি না।

কথাটা কিন্তু সত্য নয়। বিপিন যা ভাবিতেছিল, বলিবে কি না ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সঙ্কোচটা কিসের তাও সে নিজেই ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিসে যেন বাধিতেছে—একটা অর্থহীন অকারণ বাধা। খানিক পরে হঠাৎ মরিয়া হইয়া বলিয়া বসিল—মাধবীকে ফিরিয়ে রেখে আসি তবে কাল পরশু ?

—কোথায় ?

—যেখান থেকে এসেছে, ওর মামার বাড়ী।

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া জোরের সঙ্গে বলিল—না, এইখানে থাকবে মাধবী, কোথাও যাবে না।

ছোট একটি নুড়ি পাথর বিপিন হাতে নাড়াচাড়া করিতেছিল, উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার সেটিকে লুফিয়া লইয়া সে হঠাৎ মুচকি হাসিয়া বলিল—কেন মিছে বালির ঘর বাঁধছ বাবা! রাজপুত্তুরকে ছেড়ে তোমার দিকে ঝুঁকবে তেমন মেয়েই ও নয়। গুরু সেজে বড় জোর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে গালটা টিপে দিতে পার, তার বেশী কিছু—

—তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিপিন ?

বিপিন ধৈর্যহারা হইয়া বলিল—মাথা আমার খারাপ হয় নি, হয়েছে তোর। কচি একটা মুখ দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেছিস্। ঢং করে রত্নীর ওখানে রাখা হল কেন, নিজের কাছে রাখলেই হত বুকে করে ?

সদানন্দকে কথাটি বলিবার সুযোগ না দিয়ে বিপিন গটগট ক... চলিয়া গেল। সেদিন আর কাছেই ঘেঁষিল না সদানন্দের। খবর আসিল মাধবীলতাকে সে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে জেরা করিয়াছে। চালচলনে যেন কেমন একটু রহস্যের আমদানী হইয়াছে বিপিনের। কাজ ও কথা হইতেছে খাপছাড়া, প্রতিক্রিয়া হইতেছে অপ্রত্যাশিত।

পরদিন দেখা হইলে সদানন্দ তাকে একটু বুঝাইয়া বলিতে গেল যে, দোষটা যখন সদানন্দের, আশ্রমে থাকিবার জন্য মাধবীলতাকে পীড়ন করাটা কি সঙ্গত হইবে ? এথায় বিপিন রাগ করিবে সদানন্দ তা জানিত, কিন্তু রাগটা যে তার এমন অদ্ভুত রকমের হইবে সে তা কল্পনাও করে নাই।

—শেষ পর্যন্ত মাধবীকে পীড়ন করব তাও ভাবতে পেরেছিস সদা ? ভয় নেই, তোর প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে থাকব না, আমি বিদায় হচ্ছি।

মুখচোখের কি ভঙ্গি বিপিনের, সর্বাঙ্গে কি থর থর কম্পন। দেখিলে মনে হয় ভিতর হইতে কি যেন তাকে ঝাঁকানি দিতেছে, ধরিয়া নাড়াও দিতেছে। সদানন্দ তার বাহুমূল চাপিয়া ধরিল। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—তোর অসুখ করেছে নাকি বিপিন ?

বিপিন বলিল—হাত ছাড়। আমার হাতটা লোহা দিয়ে তৈরী নয়।

তারপর আর কিছুই বিপিন বলিল না, কোথায় যেন চলিয়া গেল। চলিয়া গেল ? কোথায় চলিয়া গেল বিপিন তার এই আশ্রম ছাড়িয়া, তার প্রাণের বন্ধু সদানন্দকে ছাড়িয়া ? কারোকে প্রশ্ন করিবার উপায় নাই, সদানন্দকে চুপ করিয়া থাকিতে হয় ! বিপিন কোথায় গিয়াছে সদানন্দই যদি না জানে, সে তবে কেমন কথা হয়। গুরুদেবকে না জানাইয়া গিয়াছে নাকি বিপিন !. সদানন্দের মনের মধ্যে নানা চিন্তা পাক খায়, নানা দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, বাহিরে গম্ভীর হইয়া থাকে, যথারীতি নিজের কাজ করিয়া যায়। নিয়ম-কানুন বাঁধাই আছে আশ্রমে, কোন ব্যবস্থারও অভাব নাই, তবু বিপিন না থাকিলে যেন চলে না, আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অবাধ গতি ঠেকিয়া ঠেকিয়া থামিয়া থামিয়া চলিতে থাকে—অসুবিধা সৃষ্টি হয়, গোলমাল বাধিয়া যায়, অনুষ্ঠান নিখুঁত হয় না, ঠিক যেন গৃহিণীবিহীন বৃহৎ সংসার। বিশেষভাবে সব ঠিকঠাক করিয়া দিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোথাও গেলেও বিপিনের অনুপস্থিতি সব সময়েই অনুভব না করিলে চলে না, এবার তো সে কিছু না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ সদানন্দকে বিপিনের খবর জিজ্ঞাসা করে।

সদানন্দ সংক্ষেপে ভাসা ভাসা জবাব দেয়—আসবে, দু-চারদিনের মধ্যেই আসবে।

দু-তিনটা দিন কাটিয়া যাওয়ার পর বিপিনের জন্য সদানন্দের মন কেমন করিতে থাকে। অনেক রকম মনোভাবের মিশ্রণে প্রথমে মনের মধ্যে যে খিচুড়িটা তৈরী হইয়াছিল সেটা হজম হইয়া যাওয়ায়

পর ক্ষুধার মতই অভাববোধটা ক্রমেই যেন হইয়া উঠিতে থাকে জোরালো। এটা একটু আশ্চর্য। কতবার তো ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, বিপিনের সঙ্গে মাস কাটিয়াছে, বছর কাটিয়াছে, বিপিনের জন্য এরকম মন খারাপ হইয়াছে কবে? তবে এভাবে ছাড়াছাড়ি হয় নাই কোন বার। একসঙ্গে চলিতে চলিতে দুজনের পথ চলিয়া গিয়াছে দুদিকে, দুজনে তাই চলিয়াও গিয়াছে দূরে। এবার বিপিন রাগ করিয়াছে, মনে আঘাত পাইয়াছে, ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাকে। কে ভাবিতে পারিয়াছিল এমন হইবে? রাগিয়া কলহ করিবে না, বোঝাপড়ার চেষ্টা করিবে না, নূতন নূতন মতলব আঁটিয়া প্রকারান্তরে নিজের জিদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে না, কেবল বলিবে 'চললাম' আর বলিয়া গট্ গট্ করিয়া চলিয়া যাইবে! এমন কি ঘটিয়াছে যার জন্য এমন ভয়ানক আঘাত পাইল বিপিন, এমন কাণ্ড করিয়া বসিল?

সদানন্দের সবচেয়ে দুর্বোধ্য মনে হয়, সমস্ত ফেলিয়া গেল বিপিন, কিন্তু এই চরম চালটা কোন দিক দিয়া কাজে লাগানোর চেষ্টা করিল না। চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়া কাবু করিয়া চলিয়া যাওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাধবীলতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে রাজী হওয়ার সুযোগ দিয়া সদানন্দকে বশ করিবার চেষ্টা করিলে এবং চলিয়া যাওয়ার পরেও সদানন্দকে মত পরিবর্তন করিয়া তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনিবার উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গেলে, তবেই যেন কাজটা বিপিনের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইত। এভাবে চলিয়া যাওয়া তো সম্ভব বলিয়াই মনে-হয় না বিপিনের পক্ষে।

বিপিনের কি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল? ভাল লাগিতে-ছিল না আশ্রমের শিষ্য, ম্যানেজার, মন্ত্রী, সংগঠক ও বন্ধুর জীবন? এ ধরণের সন্দেহ মনে আসিলে সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়িয়া ফেলে। আশ্রম সম্বন্ধে বিপিনের মমতার কথা তার চেয়ে কে ভাল করিয়া জানে। যেখানেই গিয়া থাক বিপিন, আশ্রমের জন্য মন যে তার ছটফট করিতেছে তাতে সন্দেহ নাই।

বিপিন ফিরিয়া আসিবে। রাগের মাথায় দুদিনের জন্য কোথাও

গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে। একদিকে মন কেমন করা যেমন চাপা যায় না, অন্যদিকে বিপিনের ফিরিয়া আসিবার আশাটাও অসংখ্য যুক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়। সমগ্রভাবে বিচার করিয়া নিজের অবস্থাটা সদানন্দ মোটামুটি বুঝিতে পারে। বিপিন যেমন হোক, বিপিনকে ছাড়া তার চলিবে না।

বুঝিতে পারিয়া রাগ হয়। এই আশ্রমের এতগুলি মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা একটি মুখের কথায় সে মাটিতে লুটাইয়া দিতে পারে, শতাধিক মানুষ বাহির হইতে সপ্তাহে তিন দিন তার উপদেশ হাঁ করিয়া শুনিয়া যায়, দেশের চারিদিকে নিকটে ও দূরে জানা অজানা কত ভক্ত তার ছড়াইয়া রহিয়াছে, বিপিনকে ছাড়া তার চলিবে না? এ তো ভাল কথা নয়!

আশ্রম পরিদর্শন ও পরিচালনার ভারটা সদানন্দ নিজের হাতে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। বিপিন গিয়াছে যাক। সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিপিন আশ্রমে নাই ভাবিয়াই বুকটা ছ্যাৎ করিয়া ওঠে—করুক। আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীদের উপদেশ ও নির্দেশ দিতে, দর্শনার্থীকে দর্শন দিতে আশ্রমের কাজ ও জিনিষপত্রের হিসাব রাখিতে, নদীর ধারে কাঠের গুঁড়িটাতে বসিয়া আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিতে, এমন কি রাত্রে বিশ্রামের জন্য শয়ন করিতে পর্যন্ত বিপিনকে মনে পড়িয়া মন খারাপ হইয়া যায়—যাক্। বিপিন যেমন চলিয়া গিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে তাকে ছাড়া তার চলিবে না, সেও তেমনি আশ্রমকে নিখুঁতভাবে চালাইয়া, আশ্রমের উন্নতি করিয়া দেখাইয়া দিবে বিপিনকে ছাড়াও তার চলে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে টের পাইল, উন্নতি দূরে থাক, বিপিন এতকাল যেভাবে চালাইয়া আসিয়াছে ঠিক সেইভাবে আশ্রম চালানোর কাজটাও যেমন কঠিন, তেমনি জটিল। বিপিন যে বলিয়াছিল, সে কিছু বোঝে না, কেবল তার আদর্শ নিয়া থাকে, মনের মধ্যে আদর্শ পোষণ করা এক কথা আর সেটা কার্যে পরিণত করা আলাদা কথা—এবার বিপিনের সে কথার আসল মানেটা হাড়ে হাড়ে টের পাইতে

লাগিল। কিন্তু সদানন্দ ক্ষুব্ধও হইল না, নিরুৎসাহও হইল না। এমন তো হইবেই। কাজ করার অভ্যাস চাই, জানা চাই কি হইলে কি হয়, কি করিতে কি করা দরকার। এক হিসাবে ভালই হইয়াছে বিপিনের চলিয়া যাওয়াতে। বিপিনের উপর বড় বেশী নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল, বড় বেশী দূরে সরিয়া যাইতেছিল আশ্রমের পরিচালনা ও সংগঠনের খুঁটিনাটি হইতে। এবার সব বুঝিয়া মনের মত করিয়া আশ্রম চালাইতে পারিবে, আশ্রমকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

বিপিনের অনুপস্থিতির জন্য যতটা না হোক, সদানন্দের অপটু ম্যানেজারীর ফলে আশ্রমে আরও বেশী বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগিল। বিপিন ফিরিয়া আসিল দশ-বার দিন পরে, এই সময়ের মধ্যেই কত নিয়ম যে ভাঙ্গিয়া পড়িল, কত ব্যবস্থা যে উল্টাইয়া গেল, সৃষ্টি হইল নূতন নিয়ম। ফলটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াইত বলা যায় না। পরিবর্তনের সময় বিশৃঙ্খলা আসিবেই। আশ্রমে সে একটা গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছে, আশ্রমবাসী-নবনারী একটু ভ্যাবাচেকা খাইয়া গিয়াছে, টের পাইয়াও সদানন্দ বিশেষ ব্যস্ত হয় নাই। সাজিয়া চালিতে গেলে এসব যে অবশ্যম্ভাবী সে তা জানে। সদানন্দের ব্যবস্থায় আশ্রমের জীবন হয়ত এতদিনকার কতগুলি কৃত্রিমতার খোলস ছাড়িয়া আরও উঁচু স্তরেই উঠিয়া যাইত শেষ পর্যন্ত, কে বলিতে পারে! অন্তত কড়া বিধিনিষেধগুলি যে শিথিল হইয়া আসিত, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাল করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে সদানন্দের ভাঙ্গন ভালরকম আরম্ভ হইবার আগেই বিপিন ফিরিয়া আসিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আশ্রমও যেমন ছিল হইয়া গেল তেমনি।

সদানন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল--বাঁচলাম, ভাই। বলা নেই কওয়া নেই কোথা গিয়েছিলি তুই? আশ্রম চালান কি আমার কাজ!

—বাহাদুরী করতে তোকে কে বলেছিল? যা আরম্ভ করেছিলি, তুই, চমৎকার!

কথাটায় খোঁচা লাগিল সদানন্দের। একবার ইচ্ছা হইল সত্য-সত্যই বাহাদুরী করিয়া বলে, কয়েকটা মাস পরে ফিরিয়া আসিলে আশ্রমের উন্নতি দেখিয়া বিপিনের তাক লাগিয়া যাইত। বিপিন রাগিয়া যাইবে ভাবিয়া ইচ্ছাটা দমনও করিল, নিরীহভাবে একটু শান্ত হাসিও হাসিল।

কোথায় গিয়াছিল বিপিন? আমবাগানটা বাগাইতে—একেবারে দানপত্র পাকা করিয়া আসিয়াছে। একটা খবর দেয় নাই কেন বিপিন? কেন দিবে, সদানন্দ যখন চায় যে বিপিন আর তার এত সাধের আশ্রম সমস্ত চুলোয় যাক! কি গরজ বিপিনের খবর দিবার! না না, ঠিক তা নয়, খুব ব্যস্তও ছিল বটে বিপিন, একটু মজাও দেখিতেছিল বটে। হঠাৎ সে জন্মের মত বিদায় হইয়া গেলে সদানন্দ কি করে দেখিবার সাধটা বিপিনের অনেক দিনের।

বর্ষাকালে সদানন্দ অবসর পায় বেশী। বড় চালাটার নিচে [illegible] সাধারণের জন্য সভা বসে মাঝে মধ্যে, লোকজন আসেও খুব কম। সামান্য জলকাদা ভক্তদের উৎসাহ কমাইয়া দেয় দেখিয়া সদানন্দ [illegible] হয়। নানারকম খটকা জাগে মনে। লোকে কি তার কথা শুনিতে আসে হুজুগে পড়িয়া, সময় কাটানোর জন্য? একটু কষ্ট স্বীকার করিবার দরকার হইলেই অনায়াসে আসাটা বাতিল করিয়া দেয়! কিন্তু আশ্রমের ভাণ্ডারে দান হিসাবে প্রণামী তো তাকে প্রায় সকলেই দেয়—কেউ দেয় যতবার আসে ততবারই, কেউ দেয় মাঝে মাঝে। ঘরের কড়ি পরকে দেওয়া ত্যাগ বৈকি। বিনিময়ে পুণ্য অবশ্য তারা পায়। কিন্তু বর্ষাকালে পুণ্যের দরকারটা এত কমিয়া যায় কেন ওদের? পুণ্যও কি বাজারের ভাল মাছ-তরকারীর সামিল ওদের কাছে, জলকাদা ভাঙ্গিয়া যোগাড় করার চেয়ে ঘরে যা আছে তাই দিয়া কাজ চালাইয়া দেয়? সবচেয়ে বেশী ক্ষোভ হয় সদানন্দের, বর্ষার জল ভক্তদের কাছে তার আকর্ষণকে জলো করিয়া দিতে পারে বলিয়া। অহংকার বড় আহত হয়। এদিকে আশ্রমের কাজেও বর্ষাকালে শৈথিল্য আসে। নিজের নিজের কুটীরে বসিয়া উপাসনা জপ-তপ পূজার্চনা যার যত খুসী করে, যার যত খুসী করে না, সকলকে একত্র করিয়া সদানন্দ উপদেশ বিতরণ করিতে আসে কম। কোনদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, কোনদিন থাকে মুষলধারে বর্ষণ। সদানন্দ হয়ত মেঘে ঢাকা আকাশকে উপেক্ষা করিয়া নদীর ধারে খানিকটা ঘুরিয়া আসে, হয়ত বাহির হইয়া যায় কেবল বৃষ্টিতে ভিজিতে। অথবা হয়ত নিজের ঘরে শুইয়া-বসিয়া বই পড়ে। আশ্রমের নরনারীদের উপদেশ দিতে যায় খুব কম।

মাধবীলতা মাঝে মাঝে আসে। উপদেশ শুনিয়া যায়।

হিল-তোলা জুতা খট্ খট্ করিয়া হাজির হয় সে একেবারে

সদানন্দের অন্তঃপুরে। এটা আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু সদানন্দ নিজেই যখন অনুমতি দিয়াছে, নিয়ম অনিয়মের প্রশ্ন কে তুলিবে। বিপিন তুলিতে পারে, সদানন্দকে পাগল করিয়া দিতে পারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া, কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকে। একদিন দুপুরবেলা মাধবীলতা আসিবার পর সদানন্দকে জানাইয়া হঠাৎ সে চলিয়া গিয়াছিল বাহিরে, বলিয়া গিয়াছিল ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে। আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়াছিল হঠাৎ।

না, বুকে সদানন্দ মাধবীলতাকে টানিয়া নেয় নাই। খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলাইয়া মাধবীলতা যে ভাবে বসিয়াছিল, এখনও বসিয়া আছে তেমনি ভাবেই, তেমনি মনোযোগের সঙ্গে শুনিতেছে সদানন্দের কথা। কেবল সদানন্দের দৃষ্টি বড় কোমল, বাস্তব মমতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি যেন কোন কিছুর রূপ ধরিয়া দুচোখে ফোয়ারার মত উৎসারিত হইয়া উঠিবে, মুখের কথা শেষ হওয়ার শুধু অপেক্ষা।

মাধবীলতার মুখখানা টস্ টস্ করিতেছে জীবনীশক্তির রসে। আর হ্যাঁ, চোখ দিয়াও টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে বটে মেয়েটার।

—মাধবী বলছিল এখানে থাকতে ওর ভাল লাগছে না বিপিন। কদিন থেকে ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে—রাত্রে ঘুমোতে পারে না।

—তাই নাকি!' বলিয়া বিপিন এমন একটা আপসোসের শব্দ করিল যে ঘরের করুণ আবহাওয়াটা বীভৎস প্রতিবাদে ওই সামান্য শব্দটুকুর মধ্যে বজ্রের মত গর্জিয়া উঠিল। 'কি বললি?' বলিয়া সদানন্দ যে গর্জন করিয়া উঠিল সে শব্দটা তুলনায় শোনাইল যেন ক্ষীণকণ্ঠের ফিসফিসানি কথা।

তারপর কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ। একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, ঘর হইতে চলিয়া গিয়া আরেকটা ভুল বিপিন করিল না। ঠিক সময় মতই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—অন্য কথা ভাবছিলাম।

সদানন্দ বলিল—ও!

—এখানে থাকতে তোমার ভাল লাগছে না মাধবী?

—লাগছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

কেন? মাঝে মাঝে মন খারাপ হইয়া যায় কেন মাধবীর? বাড়ীর জন্য? না, বাড়ীতে এমন কে আছে মাধবীর যার জন্য মন কাঁদিবে! তবে? মাধবী শুধু মাথা নাড়ে, মুখ ফুটিয়া শুধু বলে 'জানি না।' বাহিরে আকাশ ছাইয়া মেঘ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটাও যেন ঐরকম ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। চুরি করিয়া আনা একটি যুবতী মেয়ের মন খারাপ হয় কেন, প্রশ্ন করিয়া আবিষ্কার করা কি সহজ ব্যাপার! অন্য কোথাও যাইতে চায় মাধবী? না, এইখানেই মাধবী থাকিবে, চিরকাল থাকিবে, যতদিন তার দেহে প্রাণ থাকে ততদিন।

সদানন্দ ও বিপিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। গুমোটে সদানন্দ ঘামিয়া গিয়াছে, এবার বিপিন ঘামিতে আরম্ভ করে ভিতরের উত্তেজনায়। ভুল বিপিন সহজে করে না, মাধবীলতার সম্বন্ধে কেবলি ভুল হইয়া যাইতেছে। ছোট একটা টুলে বসিয়াছিল বিপিন, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সে মৃদুস্বরে বলে—আশ্রমে আটকা পড়ে গেছ কিনা, সেইজন্য খারাপ লাগছে। কদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে বোধ হয় ভাল লাগত। নারাণবাবু আমায় নেমন্তন্ন করেছেন পরশু, যাবে আমার সঙ্গে মহীগড়ে? বেশ জায়গাটা।

মাধবীলতা মাথাও নাড়ে, মুখেও বলে—না!

বিপিনকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে শুনিয়া সদানন্দ একটু অবাক হইয়া যায়, রাজপুত্র নারায়ণের জন্য মাধবীলতার মন কেমন করিতেছে না, এজন্য বিপিনের খুসী হওয়ার কারণটা তার বোধগম্য হয় না।

—চল একটু বেড়িয়ে আসি আমরা নদীর ধার থেকে – বলিয়া বিপিন উঠিয়া দাঁড়ায়, সদানন্দের দিকে চাহিয়া বলে, আমরা যাই প্রভু?

সদানন্দ গম্ভীর ভাবে বলে—যাও।

সেইদিন হইতে বিপিনের সঙ্গে কি ভাব মাধবীলতার! সদানন্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারে, দুজনের মধ্যে কি যেন একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে কেমন এক নতুন ধরণের আত্মীয়তা।

বিপিন শীত মানে না, গ্রীষ্ম মানে না, বর্ষা মানে না, বছরের সকল ঋতুতেই সে সমান ব্যস্ত, কাজে তার কখনও ঢিল পড়ে না। আমবাগানে গাছ কাটিয়া কুটীর তুলিবার স্থানগুলি বর্ষা শেষ হইবার আগেই সাফ করিয়া ফেলিবে ঠিক করায় তার কাজ বাড়িয়াছে। পূজার মধ্যে সমস্তগুলি কুটীর তুলিয়া আশ্রমের নূতন অংশটিকে সে সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও বিপিন মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিবার সময় পায়, তাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইবার সময় পায়, সে যাতে আশ্রমের ছোটখাট কাজ করিয়া সময় কাটাইতে পারে তার ব্যবস্থা করিয়া দিবার সুযোগও পায়।

সদানন্দের কাছে আসে মাধবীলতা। মাঝে মাঝে আসে। শান্ত শিশুর মত চুপ করিয়া বসিয়া তার কথা শোনে, একটা অভিনব নম্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার সঙ্গে আলাপ করে। আর সমস্তক্ষণ মুখখানা তার টস্ টস্ করিতে থাকে জীবনীশক্তির রসে। তবে চোখ দিয়া অন্য কিছু আজকাল আর টস্ টস্ করিয়া গড়াইয়া পড়ে না।

সন্তর্পণে একদিন সদানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করে—বিপিনের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ হয়েছে, না ?

—বেশ লোক উনি। আমায় খুব স্নেহ করেন।

—আশ্রমে থাকতে তোমার এখন ভাল লাগছে ?

—তা লাগছে। ভাল সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

—কি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ?

—এই—যাতে সময় কাটে, আশ্রমের কাজ কর্ম করতে পাই, ঘুরে বেড়াতে পাই—

মাঝে মাঝে দুটি একটি প্রশ্ন করিয়া জবাবগুলি সদানন্দ গম্ভীর মুখে শুনিয়া যায়। একটা দিক ধীরে ধীরে তার কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। তার কাছ হইতে মাধবীলতাকে দেখাশোনা করার হুকুম পাইয়া এতদিন দেখাশোনার একেবারে চরম করিয়া ছাড়িয়াছিল উমা ও রত্নাবলী। সর্বদা চোখে রাখিয়া কি ভয়ানক আদর যত্নটাই দুজনে যে করিয়াছিল তাকে! সে যেন শিশু, সে যেন ভঙ্গুর, সে যেন দুষ্প্রাপ্য

কিছু, সেবার স্নেহে খাতিরে শাসনে মাথায় করিয়া তাকে না রাখিলে চলিবে না। বিপিন তাকে মুক্তি দিয়াছে। এক রকম কিছুই করে নাই বিপিন, উমা আর রত্নাবলীকে বলিয়া দিয়াছে মাধবীলতা যা করিতে চায় তাই যেন করিতে পায় আর মাধবীলতাকে দিয়াছে কয়েকটা দায়িত্ব। আশ্রমের এক প্রান্তে আছে গোয়ালঘর, সকালে বিকালে দুধ দোয়ার সময় সে হাজির থাকিবে, যে কুটীরে যতটা দুধ যাওয়ার কথা, বাঁটিয়া দিবে। আশ্রমের মেয়েরা দুজন দুজন করিয়া রান্না করে, মাধবী তাদের তরকারী কুটিয়া দিয়া সাহায্য করিবে, আর যদি কেউ অসুস্থ থাকে আশ্রমে তার জন্য প্রস্তুত করিবে দরকারী পথ্য। এমনি সব ছোট ছোট কয়েকটা কাজ।

—আপনি আমায় বলছিলেন না আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা, ভাল বুঝতে পারি নি। বিপিনবাবু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

—কি বলেছেন বিপিনবাবু ?

কথা আর কথার ভঙ্গি মাধবীলতাকে একটু দমাইয়া দিল। সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল--কিভাবে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকা যায়, মানুষকে তাই বুঝিয়ে দেওয়া ধর্মের মধ্যে যে বিকার এসেছে সংশোধন করা, সমাজ-গঠনে—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। জীবন, ধর্ম, সমাজ, দেশ এই সবের জন্য বড় বড় কাজ করা আশ্রমের উদ্দেশ্য।

—এভাবে বলছেন যে ? তাই উদ্দেশ্য নয় আশ্রমের ?

আহা, চোখ-দুটি ছল ছল করে মাধবীলতার। আঘাত পাইবে জানিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরানোর জন্য চোখ দুটিকে যেন প্রস্তুত করিয়া নিতেছে। হঠাৎ একটা তীব্র সন্দেহের স্পর্শে সদানন্দের মন হাত দিয়া আগুন ছোঁয়ার মত ছ্যাং ছ্যাং করিয়া ওঠে। মনে হয়, মাধবীলতা যেন ভান করিতেছে। বোকামির ভান, সরল বিশ্বাসের ভান, শব্দ-সংজ্ঞাগুলির অর্থ না বুঝিয়াও তৎসংক্রান্ত চিরন্তন আদর্শ-বাদের যে অসংখ্য পূজারিণী আছে, সেও তাদেরই একজন—

অথবা তার নিজেরই ভুল ? যেটা মাধবীর ভান মনে হইতেছে

মাধবী আসলে তাই, সে নিজেই মাধবীলতা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে ? মাধবী প্রশ্নভরা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে বলিল—'মোটামুটি তাই। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আশ্রমের, এখানে কিছুদিন থাকলেই আস্তে আস্তে সেটা বুঝতে পারবে। আরেকদিন তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেব।

মাধবীর স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। নিজের অস্বস্তি ও দুর্বোধ্য জ্বালাবোধ সদানন্দকে পীড়া দিতে থাকে। সে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে। মাধবীলতা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল সে, সে-ই করিয়া দিয়াছিল তার আশ্রম-বাসের ব্যবস্থা। মাধবী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল মাধবীর, রাত্রে ঘুম হইতেছিল না। চোখের পলকে বিপিন তার জীবনকে সহজ ও সানন্দ করিয়া দিয়াছে। আশ্রমের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা কতবার সদানন্দ বলিয়াছে মাধবীকে, বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে কাতর হইয়া পড়িয়াছে মাধবী। বিপিন দু কথায় সব তাকে বুঝাইয়া দিয়াছে, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে মাধবী।

—পা টিপে দেব ?

সদানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে মাধবীর ঔৎসুক্য মুছিয়া যায়, চোখ নামাইয়া জড়সড় হইয়া সে বসে। প্রথমে এখানে আসিয়া শেষরাত্রে সদানন্দের পিঠের সঙ্গে মিলিয়া যেভাবে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল, লজ্জায় সঙ্কোচে যেন তেমনি কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইবে। কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত ভয়ে নিজে হইতে সে বলে—বিপিনবাবু বলছিলেন, আপনার একটু সেবা করতে। আপনি নাকি কারও সেবা-যত্ন নেন না, বড় কষ্ট হয় আপনার।

—না, পা টিপতে হবে না। বৃষ্টি আসছে, তুমি এবার যাও মাধবী।

আহত হইয়া মাধবী চলিয়া যায়। রাগে সদানন্দের গা জ্বালা করিতে থাকে। মাধবীকে এ কি করিয়া দিয়াছে বিপিন : নিজে আড়ালে থাকিয়া এ কি সম্পর্ক সে গড়িয়া তুলিতেছে তার আর মাধবীর মধ্যে ? বিপিনের সঙ্গে কথা বলিবার সময় কত হাসে মাধবী,

আশ্রমের জীবন নাকি তার হাল্কা হাসিখুসীতে ভরিয়া উঠিয়াছে, অজস্র কথা বলে, মনের আনন্দে চঞ্চলপদে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুণগুণ করিয়া গানও নাকি শোনা যায় তার সময় সময়। প্রথম প্রথম সদানন্দের কাছেও তো প্রায় এই রকমই ছিল মাধবী, আকস্মিক অবস্থা পরিবর্তনের ধাক্কায় একটু যা কেবল হইয়া পড়িয়াছিল কাবু। এখন সামনে পড়িলে মনোভাবের সবগুলি উৎসমুখে সে যেন তাড়াতাড়ি ছিপি আঁটিয়া দেয়, খোলা রাখে কেবল সভয় শ্রদ্ধাভক্তির উৎসটা, আর —

এইখানে একটু খটকা লাগে সদানন্দের। আর কি? আর কি উথলাইয়া পড়ে তার সান্নিধ্যগত মাধবীর সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্ব হইতে? পরিণত নারীর সেবা ও স্নেহের সাধ? কিন্তু সেটা কেমন হয়! সেই সহজ ও সাধারণ সাধটা তাকে কেন্দ্র করিয়া মাধবীর মধ্যে যদি অস্বাভাবিক রকম জোরালো হইয়া উঠিয়াও থাকে, এইভাবে কি তা আত্মপ্রকাশ করে—এমন দুর্বোধ্য ও রহস্যময় প্রণালীতে? সর্বদা যেন আত্মসচেতন মাধবী, সর্বদা সংযত—গভীর দীনভাবে সর্বাঙ্গে তার একটানা ছেদহীন রোমাঞ্চ।

বৃষ্টি নামি নামি করিয়া বহুক্ষণ আকাশে আটকাইয়া ছিল। হয়ত শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি আজ নামিবেই না। একবার ডাকিয়া পাঠাইলে কেমন হয় মাধবীকে, একটু সেবা করিবার অনুমতি দিলে? কোমরে আঁচল জড়াইয়া হয়তো মাধবী কুটীরের মেঝে ঝাঁট দিতেছে—শাড়ী সেমিজ এলোমেলো, চুল এলোমেলো, কথা এলোমেলো, হাসি এলোমেলো। ডাক পৌঁছিলে হাত ধুইয়া কোমরে বাঁধা আঁচল খুলিবে, চুলটা তাড়াতাড়ি ঠিক করিয়া লইবে, কথা ও হাসি দিবে বন্ধ করিয়া। তার সেই হিলতোলা জুতাটি পায়ে দিয়া এই উঠান পর্যন্ত আসিবে তাড়াতাড়ি—ঠক্ ঠক্ শব্দ স্পষ্ট কানে আসিবে সদানন্দের। তারপর জুতা শাড়ীটা এখানে ওখানে একটু টানিয়া, দুহাতে কপাল হইতে আলগা চুল কয়েকটি শেষ বারের মত উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া বলিবে, ডাকছিলেন?

সদানন্দ উঠিয়া অন্দরে গেল। অন্দরে কেউ নাই। সদরে গিয়া দাঁড়াইতে চোখে পড়িল, কিছুদূরে ছোট ফুলের বাগানটিতে আশ্রমের কয়েকটি মেয়ে ফুল তুলিতেছে। তাদের একজন মাধবী। তাইতো বটে, বিশ-বাইশ বছর আগে একজনকে কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘর ঝাঁট দিতে দেখিয়াছিল বলিয়া মাধবীকেও যে ঘরই ঝাঁট দিতে হইবে তার কি মানে আছে!

সদানন্দকে চুপ চাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মেয়েরা কাছে আসিল। অঞ্জলি ভরিয়া পায়ে ফুল ঢালিয়া প্রণাম করিল। নীরবে নির্বিকারভাবে প্রণাম গ্রহণ করিয়া সদানন্দ ভিতরে চলিয়া গেল। পায়ে ঢালিয়া দেওয়া ফুলগুলি কুড়াইয়া মেয়েরা আবার ফিরিয়া গেল ফুল তুলিতে।

পরদিন দুপুরবেলা সদানন্দ নিজেই ডাকিয়া পাঠাইল মাধবীলতাকে। মাধবী ঘরে ঢুকিবামাত্র তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল বুকে। মাধবী বিবর্ণমুখে কাঠ হইয়া রহিল। এটা বাধাও নয়, প্রতিবাদও নয়, সদানন্দ তা জানে। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য। হাতের বাঁধন আপনা হইতেই ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া গেল।

—আমাকে তুমি ভয় করো মাধবী?

মাধবী অস্ফুটস্বরে বলিল—না।

মাথায় হাত বুলাইয়া সদানন্দ তাকে একটু আদর করিল, এ ছাড়া স্নেহ মমতা জানানোর শারীরিক প্রক্রিয়া আর কি আছে! একটু আদর করিয়াই বুক হইতে নামাইয়া দিল—মেয়েটার দম প্রায় আটকাইয়া আসিয়াছে।

—কাল তোমায় বকেছিলাম বুঝি?

মাধবী পুনর্জীবিতার মত অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ। কাল যে হঠাৎ কেন রেগে গেলেন—

—রাগি নি—আমি কখনও রাগি না। তুমি আমার সেবা করতে চাও—কি সেবা করবে বল তো?

—আপনি যা বলবেন।

—পাকা চুল তুলে দেবে?

মাধবী হাসিল।

পাকা চুল বাছিয়া দিবার সময় তার কোলে মাথা রাখিয়া সদানন্দ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল সমস্তক্ষণ। মাধবী চলিয়া যাওয়ার পর মনে হইল, অসময়ে আজ যেন ঘুম আসিয়াছে। উঠিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। রাধাই নদীর বুক আরও ভরিয়া উঠিয়াছে। কালকের মত আজও নামি নামি করিয়া আকাশে আটকাইয়া রহিয়াছে বৃষ্টি। স্তিমিত দৃষ্টিতে বিকলের মত সদানন্দ চাহিয়া থাকে। এত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সদানন্দের, এত তেজ ও সংযম, জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে কি তীক্ষ্ণই হইয়াছে তার বিচারবুদ্ধি, এখন যেন জানিবার বুঝিবার ক্ষমতাটুকুও আর নাই। অন্ধ আবেগের মত, অমর সংস্কারের মত, কেবল একটা কথা মনে জাগিতেছে, তবে কি সত্যই দেবতা কেউ আছেন অন্তরালে, মানুষ যাকে সৃষ্টি করে নাই, পাপ-পুণ্য যাচাইয়ের একটি করিয়া কষ্টিপাথর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিয়া মানুষকে যিনি স্বাধীনতা দিয়াছেন কিন্তু বিচারের ক্ষমতাটা রাখিয়াছেন নিজের হাতে, অহরহ পাপ-পুণ্যের ওজন করিয়া মানুষকে যিনি শাস্তি আর পুরস্কার দিতেছেন ? নয়তো মাধবীকে বাহু বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া তার কেন মনে হইতেছে নিজে সে মুক্তি পাইয়াছে— একটা অদৃশ্য দানবের নিবিড় আলিঙ্গনের অকথ্য যন্ত্রণা হইতে ?

সন্ধ্যার সময় আশ্রমের সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক লইয়া উপদেশ দিবার কথা ছিল। সদানন্দ গেল না। পরদিন আশ্রমের সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল, সাতদিন গুরুদেব বিশেষ সাধনায় ব্যাপৃত থাকিবেন, কেহ দর্শন পাইবে না।

বিপিন বলিল—মাঝে মাঝে তোর পাগলামী দেখে—

—তুই আমার সর্বনাশ করবি বিপিন।

—মাঝে মাঝে তোর পাগলামী দেখে—

বাগবাদা গাঁয়ের সেই যে মহেশ চৌধুরী, যার ছেলে বিভূতি গিয়াছে আসল সরকারী জেলে, যার দুটি মেয়ে গিয়াছে শ্বশুরবাড়ী নামক নকল সামাজিক জেলে, যার উপর রাজা সায়েবের ভয়ানক রাগ, আশ্রমে যে একেবারেই আমল পায় না, সুযোগ পাইলেই সকলের সামনে যাকে অপদস্থ করিবার জন্য সদানন্দকে বিপিন বিশেষভাবে বলিয়া রাখিয়াছে, মানুষটা সে একটু খাপছাড়া কিন্তু তুচ্ছ নয়। তুচ্ছ নয় বলিয়াই অবশ্য তার উপর রাজা সায়েবের এত রাগ, আশ্রমে তাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার জন্য বিপিনের এত চেষ্টা। চারিদিকের অনেকগুলি গ্রামে মহেশ চৌধুরীর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, যেটা গড়িয়া তুলিবার জন্য কারও চেষ্টা করিতে হয় নাই, মহেশ চৌধুরীর জীবনযাপনের একনিষ্ঠ প্রক্রিয়া বহু কাল ধরিয়া তিলে তিলে যার জন্ম দিয়াছে। লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, ভালবাসে। কি ভাবে জানিয়াছে, কেন জানিয়াছে, জেরা করিলে কেহ বলিতে পারিবে না, কিন্তু সকলেই জানে, মনে মনে মহেশ চৌধুরী সকলের মঙ্গল কামনা করে, লোকটার ভক্তি ও নিষ্ঠা আন্তরিক, সকল সময় সকল বিষয়ে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। লোকটা বুদ্ধিমান, কিন্তু চালাক নয়; ভিতরে বাহিরে মিল আছে লোকটার--দৈনন্দিন জীবনের কারবারে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে অসংখ্য দেওয়া-নেওয়া চলে তার মধ্যে মহেশ চৌধুরীর কাছে পাওনা গ্রহণ করিতে আশাভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

[ লেখকের মন্তব্য: কোন মানুষ সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা অসংখ্য ব্যক্তিগত ধারণার সমষ্টি কিন্তু ধারণাগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ভুক্ত, সীমাবদ্ধ, বৈচিত্র্যহীন। যার ব্যক্তিত্বের দুটি একটি বিশিষ্ট দিক মাত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্থূলভাবে মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করে, যার সম্বন্ধে

মানুষ নিজের ধারণা কটির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়, নিজের মনে যতগুলি বিভিন্ন 'টাইপ' সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা মানুষের থাকে তার মধ্যে কোন একটি টাইপের সঙ্গে মানুষ যাকে মোটামুটি মিলাইয়া লইতে পারে, কেবল তারই ব্যক্তিত্বকে মানুষ স্বীকার করে। ব্যক্তিত্ব আসলে পরাশ্রয়ী, ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরধর্মানুশীলনের প্রয়োজন, এই জন্য জোরালো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এটা ভয়াবহও বটে। যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যত বেশী, তাকে তত বেশী পরের ইচ্ছায় চলিতে হয়, নেতার চেয়েও সে পরাধীন। ব্যক্তিত্বকে প্রভাবশালী করিবার মূলমন্ত্র পরের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া সে ছোট, আমি বড়, তার যা কিছু আছে কম আমার সে সব আছে অনেক বেশী। সুতরাং পরের ছোট-বড় কম-বেশীর সংস্কার ও ধারণা অনুসারে আমার ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত না হইলে সেটা নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পরিণত হয় মাত্র। এ পর্যন্ত মোট কথা, কোন জটিলতা নাই। গোলমাল আরম্ভ হয় বিশ্লেষণ যখন সেই স্তরে পৌঁছায়, যেখানে ব্যক্তিত্বের সংগঠনে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন মালমশলাগুলি পৃথক করিতে হয়, সমগ্র প্রক্রিয়াটার পিছনে কতখানি ক্রিয়াশক্তি অচেতন ও কতখানি সচেতন তাও পৃথক করিতে হয়।

আমার এসব কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই: সদানন্দ ও মহেশ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের একটি মৌলিক সামঞ্জস্যের কথা আমি সোজাসুজি আপনাদের বলিয়া দিতে চাই। সদানন্দ, বিপিন, মাধবীলতা এদের ব্যক্তিত্বের যেসব দিক আমি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছি এবং চাই— গল্পের মধ্যেই তা আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। কিন্তু মহেশ চৌধুরী ও সদানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্যটা আমি দেখাইতে চাই, গল্পের মধ্যে আপনা হইতে সেটা পরিস্ফুট করিয়া তোলা আমার সাধ্যাতীত। কারণ, দুজন মানুষকে কাছাকাছি টানিয়া আনিয়া অথবা দুজনের মধ্যে একটি মধ্যস্থ খাড়া করিয়া একজনের ব্যক্তিত্বরূপী সচেতন মননশক্তির সঙ্গে অপরজনের ব্যক্তিত্বরূপী অচেতন মননশক্তির পার্থক্য সহজেই স্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, কিন্তু সামঞ্জস্য কোন রকমেই

দেখান যায় না। যাই হোক, বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। কেবল বলিয়া দিই। মহেশ চৌধুরীর মধ্যে যে অচেতন মননশক্তি সকলের প্রীতি অর্জন করিয়াছে এবং সদানন্দের মধ্যে যে সচেতন মননশক্তি সকলের মধ্যে জাগাইয়াছে সভয় শ্রদ্ধা, মূলতঃ তার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ]

মহেশ চৌধুরী প্রত্যেক দিন আশ্রমে যাতায়াত করে, সাধারণতঃ বিকালের দিকে। সকালেও মাঝে মাঝে আশ্রমে তার আবির্ভাব ঘটে, খুব ভোরে। রাত্রে সে ঘুমায় কিনা অনেকের সন্দেহ আছে, প্রাতঃভ্রমণে বাহির হয় একরকম শেষ রাত্রে। লাঠি হাতে চার মাইল পথ হাঁটিয়া হাজির হয় আশ্রমে, আবছা আলো অন্ধকারে এদিকে খোঁজে ওদিকে খোঁজে, রাত্রি শেষে কার সঙ্গে যেন খেলিতেছে লুকোচুরি খেলা, খেলার সাথীটি তার কুটীরের পিছনে, গাছের আড়ালে, ঝোপের মধ্যে কোথাও গা ঢাকা দিয়াছে। খুঁজিতে খুঁজিতে যায় নদীর ধারে। কোন দিন হয়তো সদানন্দের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিয়া মহেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সদানন্দ যদি প্রথমে কথা বলে তো বলে, নতুবা মহেশ চৌধুরী মুখ খোলে না।

—কে, মহেশ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। বড় জ্বালা প্রভু মনে, বড় কষ্ট পেয়েছি সমস্ত রাত। তাই ভাবলাম, ভোরবেলা প্রভুর চরণ দর্শন করে—

সদানন্দের ধারণা জ্বালা তারও আছে। সে বলে—তোমায় না আশ্রমে আসতে বারণ করে দিয়েছি ?

—না এসে পারি না প্রভু।

—বটে ? বেশ, বেশ। তোমার মত আর দু-একটি ভক্ত জুটলেই আশ্রম ছেড়ে আমায় বনে জঙ্গলে পালাতে হবে। তা তোমার আসল মতলবটা কি বল তো শুনি ?

—চরণে ঠাঁই চাই প্রভু—মনে শান্তি চাই।

পাগল ? মাথা খারাপ মহেশ চৌধুরীর ? এরকম অন্ধ ভক্ত

সদানন্দের আরও আছে, কিন্তু এমন নাছোড়বান্দা কেউ নাই। বাড়াবাড়ির জন্য ধমক দিলে ভাবপ্রবণ ভক্ত দমিয়া যায়, মুখ হইয়া আসে কালো, ভক্তিও যেন উবিয়া যায় খানিকটা। কিন্তু মহেশ চৌধুরী কিছুতেই দমে না, কিছুতেই হাল ছাড়ে না। সদানন্দের অবজ্ঞা, অবহেলা, কড়া কথা এসবও যেন তার কাছে পরম উপভোগ্য। বড় রাগ হয় সদানন্দের—বড় আনন্দ হয়। মনে হয়, আসলে মহাপুরুষ সে কেবল এই একজন মানুষের কাছে, প্রায় দেবতার সমান। আর সকলে তাকে ঠকায়, শুধু দাম দেয়, শুধু তার দাবি মেটায়। তারই বলিয়া দেওয়া মন্ত্রে পূজা করে তার। কিন্তু মহেশ চৌধুরী কিছু জানে না, কিছু মানে না, নিজের রচিত একটি মাত্র মন্ত্র বলিয়া সে পূজা করে—তুমি আমায় চাও বা না-চাও দেবতা, আমি তোমায় চাই।

একটু ভয়ও করে সদানন্দের মহেশ চৌধুরীর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে, তার সঙ্গে কথা বলিতে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মালমশলায় জীবনের যে আদর্শ সে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে নিজের জন্য, সে আদর্শ অবাস্তব কল্পনা কিনা, অর্থহীন স্বপ্ন কিনা, আজও এবিষয়ে সদানন্দের সন্দেহ মেটে নাই। যে আত্মপ্রত্যয়ের নিচে এ সন্দেহ চাপা থাকে, মহেশ চৌধুরীর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, চোখের দৃষ্টিতে, মুখের কথায় তা যেন উবিয়া যাইতে থাকে—দেবতার সামনে পূজারীর মত মহেশ চৌধুরী দাঁড়াইয়া থাকে, পোষা কুকুরের মত তাকায়, স্তব করার মত কথা বলে। তবু—মনে হয়, আর যত ভক্ত তার আছে, যাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে তার সমালোচনাও করে কম-বেশী, তাদের ভুলাইতে কোনদিন তার কষ্ট হইবে না, ভুলিবার জন্য শিশুর মত তারা উদগ্রীব হইয়া আছে, কিন্তু এই অন্ধ ভক্তটিকে ভুলানোর ক্ষমতা তার নাই। মহেশ চৌধুরীর পূজা গ্রহণ করিলে বর দিবার সময় ফাঁকি চলিবে না, ভেজাল চলিবে না। অবাস্তব পাগলামীর পুরস্কারকে করিয়া তুলিতে হইবে বাস্তব। কাব্যের জন্য কবিকে যেমন নারীকে দিতে খাঁটি রক্তমাংসের দেহটি।

—তোমার ছেলে ছাড়া পেয়েছে মহেশ ?

—আজ্ঞে না। ও কি আর ছাড়া পাবে !

—এ্যাঁ ? সে কি কথা—ছাড়া পাবে বৈকি, দুদিন পরেই ছাড়া পাবে। ভেবো না।

এই কি বাস্তব পুরস্কারের নমুনা ? ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুটি মিষ্টি কথা বলা, একটু অনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া, হিসাব করিলে যার দাম কাণা কড়িও হয় না কিন্তু মহেশ চৌধুরীর কাছে যা অমূল্য ?

কোনদিন সদানন্দ কথা না বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, মহেশ চৌধুরী-ঠায় দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায় তাকে দেখে তারপর আবার আপন মনে তপোবনে ঘুরিয়া বেড়ায় আর সদানন্দের সম্মুখে পড়ে না। এখানে সে অনাহূত অবাঞ্ছিত আগন্তুক, বিপিনের শাসনে আশ্রমের কেউ তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না, মাঝে মাঝে রীতিমত অপমানও জোটে, তবু মোহাচ্ছন্নের মত সে আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ধীরে ধীরে আশ্রমের জাগরণ লক্ষ্য করে।

সদানন্দের অজ্ঞাতবাসের খবরটা মহেশ চৌধুরী পাইল সাতুনার শ্রীধরের বাড়ীতে। বাগবাদায় নিজের বাড়ী হইতে আশ্রমে যাওয়ার পথে শ্রীধরের বাড়ী পড়ে, মহেশ চৌধুরী এখানে কিছুক্ষণ বসিয়া যায়। বিশ্রামও হয়, জানাশোনা অনেকের সঙ্গে কথা বলাও হয়, অনেকের খবরও পাওয়া যায়। আজ শ্রীধরের সদরের বড় ঘরটার দাওয়ায় লোক জুটিয়াছে অনেক। যারা অপরাহ্নে যাইবে ভাবিয়াছিল, সদানন্দ সাতদিন দর্শন দিবে না শুনিয়া তাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীধরের এখানে আসিয়া জুটিয়াছে। শ্রীধর একটি নূতন বই সংগ্রহ করিয়াছে কোথা হইতে, কামরূপের এক রোমাঞ্চকর প্রামাণ্য উপন্যাস। কাল চারটি পরিচ্ছেদ পাঠ করা হইয়াছিল, আজ সকলে আসিয়া জুটিলেই বাকী অংশটুকু পড়া আরম্ভ হইতে পারিবে।

মহেশ চৌধুরী বলিল—কেউ দর্শন পাবে না ?

শ্রীধর বলিল—বিপিনবাবু তাই বললেন চৌধুরী মশাই। প্রকৃত

ভক্ত ছাড়া কেউ দর্শন পাবে না—প্রভুর জন্য যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, জীবন বিসর্জন দিতে পারে, কেবল সেই দর্শন পাবে।

—প্রভুর জন্য তোমরা সর্বস্ব ত্যাগ করতে পার না, জীবন বিসর্জন দিতে পার না শ্রীধর ?

উৎসুক দৃষ্টিতে মহেশ চৌধুরী সকলের মুখের দিকে চাহিতে থাকে, সকলে অস্বস্তি বোধ করে, চোখ নামাইয়া নেয়। বৃদ্ধ শ্রীধরের স্তিমিত চোখ দুটি বোধ হয় তামাকের ধোঁয়াতেই বুজিয়া যায়।

—আমি প্রভুর চরণ দর্শন করতে যাব, শ্রীধর।

সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। অহংকারের কথা নয়, মহেশ চৌধুরীর অহংকার আছে কিনা সন্দেহ। সকলে তা জানে। কিন্তু একটা কথা প্রায় সকলের মনেই খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে থাকে, কঠিন একটা সমস্যা। সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, জীবন বিসর্জন দিতে পারে, এত বড় ভক্তই যদি মহেশ চৌধুরী হয়, সদানন্দ তাকে আমল দেয় না কেন, কেন তাকে শিষ্য করে না ? এই সমস্যা আজ বহুদিন সকলকে পীড়া দিতেছে, এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তারা অনেক আলোচনা করিয়াছে, মনে মনে অনেক মাথা ঘামাইয়াছে। কারও কারও মনে এ সন্দেহও জাগিয়াছে যে, মানুষটা মহেশ চৌধুরী কি আসলে তবে ভাল নয়, তার নীতি ধর্ম ভক্তি নিষ্ঠা সব লোক দেখানো ভালমানুষী ?

মহেশ চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে—যাই, একবার ঘুরে আসি আশ্রম থেকে।

কয়েকজন কৌতূহলভরে তার সঙ্গ নিলে সে তাদের ফিরাইয়া দেয়, বলে—না, আজ আর তোমাদের গিয়ে কাজ নেই ভাই। প্রভু যখন বারণ করে দিয়েছেন, মিছিমিছি গোলমাল না করাই ভাল।

আশ্রমে গিয়া মহেশ চৌধুরী যাকে সামনে পাইল তাকেই প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে আবেদন জানাইতে লাগিল। কেউ জবাব দিল, কেউ দিল না। তখন মহেশ চৌধুরী গিয়া ধরিল বিপিনকে।

বিপিন বলিল—সাতদিন পরে আসবেন।

মহেশ চৌধুরী মিনতি করিয়া বলিল—আপনি একবার প্রভুকে গিয়ে বলুন, প্রভুর জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করব, জীবন বিসর্জন দেব। আপনি বললেই প্রভু আমায় ডেকে পাঠাবেন।

বিপিন রাগিয়া বলিল—কে আপনাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে, জীবন বিসর্জন দিতে সেধেছে মশায়? কেন আসেন আপনি আশ্রমে? যান যান, বেরিয়ে যান আমার আশ্রম থেকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া গেল। ফিরিয়া আসিল শেষ রাত্রে।

সদানন্দের সদরের কুটীরের সামনে কদম গাছটার তলায় বসিয়া পড়িল। কুটীরের আড়াল হইতে সূর্য উঠিলেন মাথার উপরে, তারপর আকাশ ঢাকিয়া মেঘ করিয়া আসিয়া ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি হইয়া গেল, তারপর আবার কড়া রোদ ঢালিতে ঢালিতে সূর্য আড়াল হইলেন অন্য একটি কুটীরের আড়ালে, গাছতলা হইতে মহেশ নড়িল না। রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া খাওয়া ছাড়িয়া কি তপস্যা করিতে বসিয়াছে গাছতলায়? এত যায়গা থাকিতে এখানে তপস্যা করিতে বসা কেন? আশ্রমের সকলে সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় বিস্ময় ও কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে তাকে দেখিতে থাকে—তাকে দেখিবার জন্য কেউ আসে না বটে কিন্তু এদিক দিয়া যাতায়াত করার প্রয়োজন আজ যেন সকলের বাড়িয়া যায়।

বেলা বাড়িলে তিন-চারবার মহেশ চৌধুরীর বাড়ী হইতে লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। বর্ষণের আগে আসিয়াছিল কেবল চাকর গোমস্তা, বর্ষণের পর আসিল মহেশের ভাগ্নে শশধর। গাছতলায় মাটিতে উপবিষ্ট মামার জলে ভেজা মূর্তি দেখিয়া বেচারা কাঁদিয়া ফেলে আর কি! কিন্তু সেও মহেশের তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিল না। তবে দেখা গেল ছেলেটার বুদ্ধি আছে। নিজে হার মানিয়া সে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু বিকালবেলা হাজির হইল একেবারে মামীকে সঙ্গে করিয়া।

ভাগ্নে কেবল কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়াছিল, স্বামীর অবস্থা

দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিয়াই আকুল। কেন তার মরণ হয় না? যার স্বামী পাগল, ছেলে পাগল, সে কেন সংসারে বাঁচিয়া থাকে নিত্য নতুন যন্ত্রণা সহ্য করিতে! কাঁদিতে কাঁদিতে হাতের বালা দিয়া বিভূতির মা কপালে আঘাত করিল। রক্ত বাহির হইল একটু—ডান চোখের জলের ধারাটা লাল হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরী কাতরভাবে বলিল—শোন শোন, আহা এমন করছ কেন? বাড়ী ফিরে যাও, আমি ঠিক সময়ে যাব।

খোলা জায়গায় ফাঁকা গাছতলায় এমন নাটকের অভিনয় চলিতে থাকিলে দর্শকের সমাগম হইতে দেরী হয় না। একে একে আশ্রমের প্রায় সকলেই আসিয়া হাজির হয়, এলোমেলো ভাবে চারিদিকে দাঁড়াইয়া দুজনকে দেখিতে থাকে। পুরুষেরা ব্যাপারটা অনেকটা হাল্কাভাবেই গ্রহণ করে, মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় চাপা উত্তেজনার চাঞ্চল্য, অনেকে ছোট্ট হাঁ করিয়া চোখ বড় করিয়া চাহিয়া থাকে, শেষ বেলার আলোয় দাঁত করে ঝক ঝক, চোখ করে চক চক। আশ্রমে দাঁত মাজার নিয়ম বড় কড়া, দাঁতে ময়লা থাকিলে সদানন্দ রাগ করে, মেয়েদের দাঁত তাই সত্যই ঝক ঝক করে—কারও কম, কারও বেশী। রত্নাবলীর দাঁতগুলি বোধহয় সকলের চেয়ে বেশী সুন্দর আর বেশী ঝকঝকে, চোখও তার বড় আর টানা। তবু গাছতলার ব্যাপার দেখিতে দেখিতে গায়ের আঁচল টানিয়া টানিয়া সে দুহাতে পুঁটলী করিতে থাকে, তারপর রক্তপাত ঘটা মাত্র আঁচল সমেত হাত দিয়া চাপা দেয় নিজের মুখ। কাঁদে কিনা বলা যায় না, কিন্তু সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপে। কী কুৎসিত যে দেখায় তার পরিপুষ্ট অঙ্গের অনাবৃত অংশের ঢেউ তোলা কাঁপুনি! শশধর অভিভূত হইয়া চাহিয়া থাকে। মাধবীলতা তাড়াতাড়ি মহেশ চৌধুরীর স্ত্রীর কাছে গিয়া আঁচল দিয়া তার কপালের রক্ত মুছিয়া দেয়।

তারপর আবির্ভাব ঘটে বিপিনের। রাগ করিয়া লাভ নাই, সে তাই রাগ করে না, আশ্চর্য হইবার ভান করিয়া বলে—আপনি যান নি এখনো?

মহেশ চৌধুরী বলে—আজ্ঞে না। আপনাকে তো বলেছি, একবার প্রভুর চরণ দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না।

—তা হলে সাতদিন আপনাকে এখানে থাকতে হবে।

—তাই থাকব।

বিপিন একটু হাসিল—আপনার ভক্তিটা কিন্তু বড় খাপছাড়া চৌধুরী মশায়। প্রভুর আদেশ অমান্য করতে আপনার বাধে না, প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য আপনি ব্যাকুল।

মহেশ চৌধুরী নিশ্চিন্তভাবে বলল—ও আদেশ আমার জন্য নয়।

মাধবীলতা বলিল—না সত্যি, উনি জানিয়েছেন, সাতদিন কেউ দর্শন পাবে না। সাতদিন উনি এক মনে সাধনা করবেন কিনা।

—আমি আড়াল থেকে একবার দর্শন করেই চলে আসব।

—তা কি হয়?

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, মহেশ চৌধুরী গাছতলায় মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল। নিরীহ, শান্ত, ভীরু মানুষটা যে আসলে এমন একগুঁয়ে সদানন্দ ছাড়া এতকাল আর কে তা জানিত! তাকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল। মাধবীলতা আর রত্নাবলী কোন রকমে তার স্ত্রীকে একটু দুধ খাওয়াইয়া শশধরকে ডাকিয়া নিয়া গেল আশ্রমের রাত্রির আহার্যের ব্যবস্থায় ভাগ বসাইতে। রাত্রে আশ্রমে রান্না হয় না, কিন্তু পেট ভরাইতে শশধরের অসুবিধা হইল না—দুধ, ছানা, মিষ্টি, ফল-মূল এ সবের অভাব নাই। খাওয়ার পর সে আসিয়া আবার মামা-মামীর কাছে বসিয়া রহিল গাছতলায়। রাত্রি দশটা পর্যন্ত আশ্রমের দু-একজনকে সেখানে দেখা গেল, তারপর একজনও রহিল না। রাত্রি দশটার পর কারও কুটীরের বাহিরে থাকা বারণ—বিপিন ও সদানন্দ ছাড়া।

রাত প্রায় এগারটার কাছাকাছি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও নামিল, ছাতি মাথায় বিপিনও হাজির হইল গাছতলায়। দাঁতে ব্যথা হওয়ায় বিপিন গলা, মুখ, চোয়াল, কান সমস্ত ঢাকিয়া সযত্নে কম্ফর্টার জড়াইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিলে তার দাঁতের ব্যথা বাড়ে। মুখের ঢাকা

একটু সরাইয়া সে বলিল—আপনারা দাওয়ায় উঠে বসবেন যান। মাদুর আর বালিশ দিচ্ছি।

মহেশ চৌধুরী স্ত্রীকে বলিল—যাও না দাওয়ায়, যাও না তোমরা! বিষ্টিতে ভিজে যে মারা পড়বে তুমি! যাও, দাওয়ায় যাও।

বিভূতির মা বলিল—আর তুমি?

এক কথা একশবার কেন বলছ? বললাম না প্রভুকে দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না এখান থেকে। তুমি এখানে বসে থেকে কি করবে, তাতে লাভটা কি হবে শুনি?

—তুমি এখান থেকে না উঠলে আমিও উঠব না।

সন্ধ্যা হইতে এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে অনেক তর্ক, অনেক রাগারাগি হইয়া গিয়াছে, মহেশ চৌধুরী আর কিছু বলিল না, কেবল শশধরকে হুকুম দিল দাওয়ায় গিয়া বসিতে। শশধর দাওয়াতে গেল, বিপিন মাদুর আর বালিশ আনিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মাদুর বিছাইয়া শুইয়াও পড়িল। আপসোস করিয়া বলিল—বর্ষাকালে একি ঠাণ্ডা মশায়, এঁ্যা? একি শালার শীতকাল নাকি?

বিপিনের সহানুভূতি জাগিবার লক্ষণ নাই দেখিয়া গলা নামাইয়া আবার বলিল—বৌটা এসেছে কাল—দুমাস বাপের বাড়ী ছিল। গরমটা গেছে কাল রাতে, তা বৌ বলে কি, না বাবু, বাদলার দিন ঠাণ্ডা লাগবে। বলে—

—আপনি বাড়ী ফিরে যান না?

শশধর উঠিয়া বসিল।—আমি? মামী কাল বাড়ী ফিরেই কি কি করবে জানেন? কানটি ধরে বলবে, বেরো বাড়ী থেকে। কেবল আমাকে নয় মশায়, নিজের জন্য কি আমি ভাবি—বৌটাকে সুদ্ধু। গায়ে দেবার দিতে পারেন কিছু—কাপড় চোপড় যাহোক?

বিপিন একটা চাদর আনিয়া দিল। কিন্তু বাদল রাতে সদানন্দের সদর দাওয়ায় চাদর মুড়ি দিয়া আরাম করিবার অদৃষ্ট বেচারীর ছিল না। বিভূতির মা ডাকিয়া বলিল—ও শশী, ও

ভদ্রলোকের কাছ থেকে ছাতিটা চেয়ে রাখ, আর জিজ্ঞেস কর আরো যদি ছাতি থাকে একটা—

একটা কেন, আরও তিনটা ছাতি ছিল, সবগুলি আনিয়া দাওয়ায় শশধরের কাছে ফেলিয়া বিপিন ভিতরে চলিয়া গেল। দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণায় তার মাথার মধ্যে তখন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল মাটিতে শুইয়া হাত পা ছুঁড়িতে থাকে আর চীৎকার করিয়া কাঁদে।

ছাতি নিয়া শশধর গাছতলায় গেল। একটি ছাতি খুলিয়া দিল মামীর হাতে, আরেকটি ছাতি খুলিয়া মহেশ চৌধুরীকে দিতে গেলে সে বলিল—না, আমার ছাতি চাই না।

স্ত্রী বলিল—কেন? এখেনে ধন্না দিয়েছো, না খেয়ে বসে থাকবে, তা না হয় বুঝলাম—বিষ্টি যখন পড়ছে ছাতিটা মাথায় দিতে দোষ কি?

মহেশ চৌধুরী বলিল—নিজে থেকে আমি করব না।

তখন মহেশ চৌধুরীর স্ত্রী আবার এমনভাবে নিজের মরণের জন্ম আপসোস আরম্ভ করিল যে মনে হইল আবার বুঝি আজ অপরাহ্ণের মত বালার আঘাতে নিজের কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু খানিক আপসোস করিয়া নিজের ছাতিটা বন্ধ করিয়া শশধরকে ফেরত দিল, বলিল—যা তুই, দাওয়ায় শো গে যা শশী।

শশধর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—থাক, আমিও বসে বসে ভিজি এখানে, আমিই বা বাদ যাব কেন।

তারপর মিনিট দুই সব চুপচাপ। এ অবস্থায় গাছের পাতায় বাতাসের মৃদু শোঁ শোঁ শব্দ আর গাছের পাতা হইতে জল ঝরিবার ক্ষীণ জলো জলো আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ কানে শোনাও পাপ। মনে অবশ্য অনেক কথা টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে এবং সেগুলি স্মৃতিও নয়:

সারাটা জীবন আমায় তুমি জ্বালিয়ে খেলে, আমার শনিগ্রহ তুমি। আমার সব ব্যাপারে তোমার বাহাদুরী করা চাই, হাজার

বাঁধানো চাই। যদি শান্তি পাবার জন্যে গাছতলায় ধন্না দিয়ে পড়ে থাকি, তোমার কি তাতে, কেন তুমি এসে আমার মন বিগড়ে দেবে, কে ডেকেছিল তোমায়? স্বামীভক্তি দেখানো হচ্ছে—স্বামীর একটা কথা শুনবে না, স্বামীভক্তি দেখাতে গাছতলায় এসে ভেজা চাই। কি অদ্ভুত সতীরে আমার! স্বামীর শান্তি নষ্ট করে সতীত্ব ফলানো!

বৃষ্টি আর বাতাস দুয়েরই বেগ বাড়িতে থাকে। মহেশ চৌধুরীর রাগ আর জ্বালাবোধ কিন্তু না বাড়িয়া এই সামান্য ভর্ৎসনার মধ্যেই একেবারে ক্ষয় হইয়া যায়। আরও অনেকক্ষণ জের টানিতে পারিত, বলিতে পারিত আরও অনেক কথা, কিন্তু কিছু না বলিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেল। অন্ধকারে এত কাছাকাছি বসিয়াও কেহ কারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না। গাঢ় অন্ধকারে শুধু একটি আলোর বিন্দু চোখে পড়ে। কিছুদূরের একটি কুটীরে কে যেন একটি আলো জ্বালিয়া জানালা খুলিয়া রাখিয়াছে। জাগিয়া আছে না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মানুষটা কে জানে! এত রাত্রে চোখে ঘুম নাই এমন শান্তিহীন অভাগা কে আছে সাধু সদানন্দের আশ্রমে? সদানন্দের আশ্রমের কুটীরে যে বাস করিবার অধিকার পায়, জীবনের সব জ্বালা পোড়ার ছোঁয়াচ তো সঙ্গে সঙ্গে তার মন হইতে মুছিয়া যাইবে, সন্ধ্যার সঙ্গে শিশুর মত দু চোখ ভারি হইয়া আসিবে শিশুর চোখের ঘুমে! আলোর বিন্দুটি নিবিয়া গেলে মহেশ চৌধুরী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তাই বটে। কোন দরকারে কেউ আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছিল—ঘুম আসিতেছিল না বলিয়া নয়, মনের আগুন রাত্রি জাগরণের অবসাদে চাপা দিবার দরকার হইয়াছিল বলিয়া নয়। দুই হাত জড়ো করিয়া মহেশ চৌধুরী মনে মনে সদানন্দের চরণে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করে। হে মহেশ চৌধুরীর জীবন্ত দেবতা, মহেশ চৌধুরীর কল্যাণের জন্যই তুমি তাকে অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখ, দুঃখের আগুনে পুড়িয়া মহেশ চৌধুরীর মন যেদিন নির্মল হইবে সেই দিন পায়ে ঠাঁই দিয়া মহেশ চৌধুরীর সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া তাকে তুমি শান্তি দিবে, একথা জানিতে কি বাকী আছে মহেশ

চৌধুরীর। এই ধৈর্যের পরীক্ষায় শিস্ত না করিয়াও নিয়ের মতই তাকে যে প্রকারান্তরে আত্মশুদ্ধির কঠোর সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছ, সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য মহেশ চৌধুরী জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু আজ এই বিপদে তুমি তাকে রক্ষা কর। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না প্রভু, মহেশ চৌধুরীকে বাড়ীতে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য, মহেশ চৌধুরীর সাধনা ব্যর্থ করার জন্য একজন কি অন্যায় আবদার আরম্ভ করিয়াছে। রাতদুপুরে গাছতলায় সম্মুখে বসিয়া নীরবে বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে। স্ত্রী বলিয়া নয়, ছেলের মা বলিয়া নয়, একজন স্ত্রীলোকের এত কষ্ট চোখে দেখিয়া স্থির থাকার মত মনের জোর যে মহেশ চৌধুরীর নাই প্রভু!

সদানন্দ অবশ্য তখন ঘুমাইতেছিল। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। কিন্তু জানা থাকিলেও মহেশ চৌধুরীর কিছু আসিয়া যাইত না। পাথরের দেবতার কাছেও মানুষ প্রার্থনা জানায়—ঘুমন্ত মানুষ তো জীবন্ত। নয় কি?

পরদিন চারিদিকে খবর ছড়াইয়া গেল, মহেশ চৌধুরী সস্ত্রীক সাধু বাবার আশ্রমে ধন্না দিয়াছে। চারিদিক হইতে নরনারী দেখিবার জন্য আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল—সদানন্দের আশ্রমে আসিয়া তারা আজ মহেশ চৌধুরীর দর্শনপ্রার্থী!

শেষ রাত্রে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সকালবেলা ভিজা পৃথিবীতে সোনালী রোদ উঠিয়াছে। মহেশ চৌধুরী ও তার স্ত্রী দুজনের গায়ে রোদ পড়িয়া দেখাইতেছে যেন মূর্তি-ধরা বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা কিন্তু অপার্থিব জ্যোতি দিয়া আবৃত! দুজনের গায়ে আবরণের মত পড়িবে বলিয়া রোদের রঙটা আজ বেশী গাঢ় হইয়াছে নাকি?

রত্নাবলী ও উমা আসিয়াছিল সকলের আগে, রোদ উঠিবারও আগে। রত্নাবলী চোখ বড় করিয়া বলিয়াছিল, সমস্ত রাত এখানে ছিলেন?

মহেশ চৌধুরী বলিয়াছিল—থাকবার জন্যেই তো এসেছি মা!

মহেশ চৌধুরীর কথা বলিবার ধরন পর্যন্ত যেন এক রাত্রে বদলাইয়া গিয়াছে।

—মারা পড়বেন যে আপনারা ?

মহেশ চৌধুরী করুণ চোখে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। দেবতা কি প্রার্থনা শুনিবেন না, এই বিপদে তাকে পথ দেখাইয়া দিবেন না ?

কাল শেষ রাত্রির দিকে কতবার যে তার মনে হইয়াছে সব শেষ করিয়া দিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া কোন একটি আশ্রয়ে চলিয়া যায়। মনে হইয়াছে, এমনভাবে একজনকে কষ্ট দিবার কোন অধিকার তার নাই, সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেই বা এ জগতে কার কি আসিয়া যাইবে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেই বা কার কি আসিয়া যাইবে, সব কি তার নিজেরই বিকৃত অহংকারের কথা নয় ? সাধুজীর চরণ দর্শন না করিয়া উঠিবে না বলিয়া গাছতলায় ধন্না দিয়াছে, চরণ দর্শন হইবার আগে উঠিয়া গেলে লোকের কাছে একটু নিন্দা হইবে, লোকে বলিবে মহেশ চৌধুরীর মনের জোর নাই। নিজের কাছে নিজের দামটাও একটু কমিয়া যাইবে বটে, মনে হইবে বটে যে, আমি কি অপদার্থ, ছিঃ! কিন্তু নিজের কথা ভাবিয়া আরেকজনকে যন্ত্রণা দিলে, মারিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা ঘটাইলে, তাতে কি নিজের অপদার্থতা আরও বেশী প্রমাণ হইয়া যাইবে না, নিজের মধ্যে অশান্তি বাড়িয়া যাইবে না!

রোদ উঠিবার পর আসিল মাধবীলতা। কে জানে কেন এ আশ্রমে কোন ব্যাপারে সকলের চেয়ে মাধবীলতার সাহসটাই সবচেয়ে বেশী হইতে দেখা যায়। বোধ হয় কোন কোন ব্যাপারে সে সকলের চেয়ে ভীরু বলিয়া।

আসিয়াই মহেশকে সে দিতে আরম্ভ করিল বকুনি। বলিল— মাথা খারাপ হয়ে থাকে অন্য কোথাও গিয়ে পাগলামি করুন না ? আমরা আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি ?

—অপরাধ ? অপরাধের কথা কি হল মা ?

মহেশ চৌধুরী হাত জোড় করিল।

তফাতে শতাধিক নরনারী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মাধবী-লতার মুখের রঙ যেন রোদের সঙ্গে মিশ খাইয়া যাইবে।

—তবে আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এটা তো হাট নয়, আশ্রম তো এটা? দেখুন তো চেয়ে কি রকম লোক জমতে সুরু করেছে? এর মধ্যে আশ্রমের কাজ চলে কি করে, আমরাই বা থাকি কি করে? একটু শান্তি পাবে বলে যারা আশ্রমে আসে—সাহস মাধবীলতার একটুও কমে নাই, তবে আবেগটা বাড়িতে বাড়িতে একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়ায় গলাটা রুদ্ধ হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরী বলিল—তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে মা? আচ্ছা আমি ওদের যেতে বলছি।

—যেতে গরজ পড়েছে ওদের!

কিন্তু তারা গেল। মহেশ চৌধুরী ঘুরিয়া বসিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইল, বলিল যে এই গাছতলায় তার মরণ হইবে এটা যদি তারা না চায় তবে যে যার বাড়ী ফিরিয়া যাক। ভঙ্গি দেখিয়া প্রথমে মাধবীলতার মনে হইয়াছিল মহেশ চৌধুরী বুঝি লম্বা বক্তৃতা দিবে, কিন্তু একটু অনুযোগ দিয়া ও নিজের মরণের ভয় দেখাইয়া কয়েকটি কথায় সে বক্তব্য শেষ করিয়া দিল এবং এমনভাবে কথাগুলি বলিল যেন শ্রোতারা সকলেই তার শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে আশ্রমের সীমানা পার হইয়া চলিয়া গেল। বাড়ী সকলে গেল না, আশ্রমের কাছেই খবরের লোভে ঘুরাফিরা করিতে লাগিল, কিন্তু গাছের জন্য আশ্রমের ভিতর হইতে তাদের আর দেখা গেল না। মাঝে মাঝে দু-একজন করিয়া আশ্রমের ভিতরে ঢুকিয়া মহেশকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, আশ্রমের মধ্যে আর ভিড় হইল না।

বিপিন ভিতর হইতে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিল। দাঁতের ব্যথা এখনো তার সম্পূর্ণ কমে নাই, কিন্তু হয় রোদ উঠিয়াছে বলিয়া অথবা ব্যাপারটা দেখিয়া উত্তেজনা হইয়াছে বলিয়া, মাথায় জড়ানো সমস্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া সে চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া রহিল।

মাধবীলতা একটা পাক দিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা আপনি কি চান ?

—প্রভুর চরণ দর্শন করতে চাই।

শুনিয়া মাধবীলতা আবার পাক দিয়া আসিতে গেল।

বেলা বাড়িতে থাকে, ভিজা জামা ও কাদা মাখা পরনের কাপড় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়, গুমোট হয় দারুন। মহেশ একসময় স্ত্রীকে বলে—আচ্ছা, এবার তো তুমি ফিরে যেতে পার ?

বিভূতির মার চোখ জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, চোখের পাতা বুজিয়া বুজিয়া আসিতেছে। শুধু মাথা নাড়িল।

মহেশ চৌধুরী খানিকক্ষণ গুম্ খাইয়া থাকিয়া বলিল—চল, আমিও যাচ্ছি।

শুনিয়া বিভূতির মার লাল চোখে পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল—সাধুজীর চরণ দর্শন না করেই যাবে ?

—কি করব ? নারীহত্যার পাতক তো করতে পারি না। জ্বর এসেছে না তোমার ?

হয়ত আসিয়াছে জ্বর, হয়ত আসে নাই, সেটা আর এখন ব[illegible] কথা নয়, বিভূতির মা এখন আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চায় [illegible]। এখানে বসিবার সময় বলিয়াছিল বটে যে স্বামী লইয়া ফিরিয়া যাইবে কিন্তু এখন আর সদানন্দের চরণ দর্শনের আগে সেটা করিতে চায় না। স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভয়ে ? ভয় সেটাই বটে, কিন্তু মহেশ যা ভাবিতেছে তা নয়, স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভাবনায় তো বিভূতির মার ঘুম আসিতেছে না। এখন বড় ভয় এই যে, এত কাণ্ডের পর তার পাগল স্বামী সদানন্দের দর্শনলাভ না করিয়াই বাড়ী ফিরিয়া গেলে তার সঙ্গে সে ঘর করিবে কি করিয়া ? সেই তিলে তিলে দিনের পর দিন দগ্ধানোর চেয়ে এইখানেই একটা হেস্ত-নেস্ত হইয়া যাক্।

যুক্তিটা যে খুবই জোরালো, তাদের সম্পর্কের হিসাব ধরিলে প্রায় অকাট্য, মনে মনে মহেশ তা অস্বীকার করিতে পারিল না, কিন্তু

অনাহারে অনিদ্রায় রোদে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া গাছতলায় বসিয়া বসিয়া দিবারাত্রি কাটানোর পর যুক্তিতে বেশী কিছু আসিয়া যায় না, পরের কাছে বিনয়ে কাদা হইয়া হাতজোড় করা যায় কিন্তু নিজের লোকের অবাধ্যতায় গা জ্বলিয়া যায়। মহেশ চৌধুরীর দাঁতে দাঁত ঘষিবার প্রক্রিয়াটা কাছে দাঁড়াইয়া কেউ লক্ষ্য করিলে চমকাইয়া যাইত।

—তুমি থাক তবে, আমি ফিরে চললাম।

—যাও।

—আমি চলে গেলেও তুমি একা বসে থাকবে?

—কি করব না বসে থেকে? এখন গেলেই চিরকাল তুমি আমায় দুষবে, বলবে আমার জন্য তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলে।

—তোমায় দুষব?

—দুষবে না?

খানিকক্ষণ হতভম্বের মত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল—আমি নিজেই যখন চলে যাচ্ছি, তোমায় দুষব কেন?

এবার বিভূতির মা যেন একটু রাগ করিয়াই বলিল—গ্যাখো তোমার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নয়, ওসব মারপ্যাঁচ আমাদের মধ্যে চলবে না,—রাস্তার লোককে ওসব বলে বুঝিও। নিজেই চলে যে যাচ্ছ তুমি, কার জন্য যাচ্ছ শুনি? বাড়ী গিয়ে যে ছটফট করবে সেটা তলে তলে দস্থাবে কাকে শুনি? তোমায় চিনতে তো আমার বাকী নেই। তুমি হলে—তুমি হলে—মাথা নত করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

—কেঁদো না—বলিয়া মহেশ চৌধুরী বিহ্বলের মত বসিয়া রহিল। এ জগতে কোন প্রশ্নেরই কি শেষ নাই। মানুষ বিচার করিবে কি দিয়া? খুঁজিলেই সত্যের খুঁত বাহির হয়—নিজে খোঁজ বন্ধ করিয়া দিলেও রেহাই নাই, প্রতিনিধি যদি খোঁজে, নিজের জ্ঞান বুদ্ধির হিসাবে তাতেও খুঁত বাহির হওয়া আটকায় না। নিজে যা হোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে পারিলেই অন্যে তা মানিবে কেন, অন্যেও যা

হোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে গিয়া নূতন কিছু আবিষ্কার করিবেই। সুতরাং এখন কর্তব্য কি। যা ভাল মনে হয় তাই করা ?

কি করা ভাল ?

হে মহেশ চৌধুরীর জীবন্ত দেবতা—

না, দেবতার কাছে আবদার চলিবে না। দেবতার কি জানে মহেশ চৌধুরী ? দেবতা ও তার সম্পর্কের মধ্যে কোনটা মারপ্যাঁচ আর কোনটা মারপ্যাঁচ নয়, তা কি সে নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছে যেমন জানিতে পারিয়াছে স্বামী নামক দেবতা সম্বন্ধে তারই সম্মুখে উপবিষ্টা তারই এই স্ত্রীটি ? এরকম না জানিলেই বা কর্তব্য নির্ণয় চলিবে কেন ? মহেশ চৌধুরীর ক্লেশ বোধ হয়। দেবতাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে কিন্তু দেবতার সঙ্গে নিজের সংযোগটা কেমন সে সম্বন্ধে নিজের পরিষ্কার ধারণা নাই, এ কেমন আত্মসমর্পণ ? চোখ কান বুজিয়া বিচার-বিবেচনা না করিয়া নিজেকে দিলেই কি আত্ম-সমর্পণ হয় ? কোন প্রত্যাশা না থাকিলেই ? তবে সদানন্দের সম্বন্ধে কর্তব্যনির্ণয় করিতে তার এত কষ্ট হয় কেন, কর্তব্যনির্ণয় করিয়াও এক মুহূর্তের জন্যও কেন নিঃসন্দেহ হইতে পারে না যে যা ঠিক করিয়াছে তাই ঠিক ? তার সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণয় করিতে তার স্ত্রীর কেন একবারও দ্বিধা করিতে হয় না, ভুল করিবার ভয়ে ব্যাকুল হইতে হয় না ! মহেশ চৌধুরী কি তবে স্ত্রীলোকেরও অধম ? অথবা—

একটা প্রশ্ন যেন মনের তলায় কোনখানে উঁকি দিতে থাকে, মহেশ চৌধুরী ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেমন একটা রহস্যময় দুর্বোধ্য অনুভূতি হইতে থাকে। আসল কথা বিভূতির মার শেষ কথাগুলিতে সে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল, সকল বিষয়ের মূল্যনির্ণয়ের অভ্যস্ত মানসিক প্রক্রিয়াটা একেবারে গোড়া ধরিয়া নাড়া খাইয়াছিল। সমস্ত চিন্তার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল মনে হইতেছিল, একথাটা তো মিথ্যা নয়, ওর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক এ জগতে আর কারও সঙ্গে তো তা নেই, কোনরকম মারপ্যাঁচ ওর সঙ্গে আমার তো চলতেই পারে না ? কি আশ্চর্য !

তারপর মাধবীলতা এক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—চলুন আপনারা সাধুজীর চরণ দর্শন করবেন।

মহেশ যেন বিশেষ অবাকও হইল না, কৃতার্থও বোধ করিল না। সহজভাবে কেবল বলিল—অনুমতি দিয়েছেন ?

একথার জবাবে মাধবী বলিল—প্রণাম করেই চলে আসবেন কিন্তু, কথাবার্তা বলে জ্বালাতন করবেন না।

—আমরা দুজনেই যাব তো ?

—হ্যাঁ, আসুন।

কিন্তু বিভূতির মা স্বামীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে, সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে আসে নাই, সে উঠিল না। বলিল—আমি এখান থেকেই মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছি, তুমি যাও, প্রণাম করে এসো।

একা যাইতে মহেশের ভাল মন সরিতেছিল না, একসঙ্গে এত দুর্ভোগ সহ্য করিবার পর সাফল্যটা ভোগ করিবে একা ? একটু অনুরোধ করিল, বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিল যে এমন একটা অনুগ্রহ পাইয়া কি হেলায় হারাইতে আছে ? কিন্তু বিভূতির মা কিছুই বুঝিল না। তখন মাধবীলতার সঙ্গে মহেশকে একাই ভিতরে যাইতে হইল। কাপড়ে কাদা লাগিয়াছিল, এখন শুকাইয়া পাঁপড়ের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহেশ একবার ভাবিল কাপড়টা বদলাইয়া সদানন্দের সামনে যায়, তারপর আবার ভাবিল, থাক, হাঙ্গামায় কাজ নাই। সদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা বিপিনের বদলে মাধবী-লতার মধ্যস্থতায় হইতেছে কেন একথাও মহেশের মনে হইতেছিল। ভাবিল, তার কাছে নিজে নত হইতে বিপিনের হয়ত লজ্জা করিতেছিল, তাই, মেয়েটাকে দূতী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু সদানন্দের অভ্যর্থনা এ ধারণা তার মন হইতে বলপূর্বক দূর করিয়া দিল। রাগে আগুন হইয়া সদানন্দ বলিল—এর মানে ? আমি না বারণ করে দিয়েছি সাত দিন কেউ আমার দর্শন পাবে না ?

সদানন্দ নদীর দিকে জানালার কাছে পাতা চৌকীতে বসিয়া ছিল,

সেইখান হইতে ক্রুদ্ধ চোখে চাহিয়া রহিল। মহেশ তখন ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াছে, সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাধবীলতা তাড়াতাড়ি চৌকীর কাছে আগাইয়া গেল। নিচু গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—আপনার পায়ে ধরছি রাগ করবেন না। অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে, আমি সমস্ত বলছি আপনাকে। আপনি শুধু এই ভদ্রলোককে একবার প্রণাম করে চলে যেতে দিন ?—বলিয়া মুখ আরও তুলিয়া সদানন্দের চোখে চোখে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলিল—দেবেন না ?

সদানন্দ বলিল—আচ্ছা।

—আসুন, প্রণাম করে যান।

মহেশ নড়ে না দেখিয়া সদানন্দও ডাকিয়া বলিল—এসো মহেশ।

মহেশ অবাধ্য শিশুর মত মাথা নাড়িয়া বলিল—না প্রভু, আপনি আমায় ডাকেন নি, এই মেয়েটি আমায় ফাঁকি দিয়ে এনেছে। না জেনে আপনার কাছে আমি একি অপরাধ করলাম প্রভু! আপনি ডাকেন নি জানলে তো আমি আসতাম না।

সদানন্দ শান্তভাবে বলিল—তাই নাকি ? তা, এখন কি করবে ?

—আমি ফিরে যাচ্ছি প্রভু। আপনি নিজে ডাকলে এসে প্রণাম করে যাব।

মাধবীর মুখখানা পাংশু হইয়া গিয়াছিল, সে ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আবার গাছতলায় গিয়ে ধন্না দেবেন ? মরে যাবেন যে আপনারা দুজনেই ?

মুখের চেয়ে মাধবীর চোখের পরিবর্তন ঘটিতেছিল বিচিত্রতর, এবার চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়িল। কত ভাবিয়া কত হিসাব করিয়া নিজের দায়িত্বে এত বড় একটা কাজ করিতে গিয়া বুকটা ভয়ে ও উত্তেজনায় টিপ্ টিপ্ করিতেছিল, সদানন্দ দেবতা না দানব মাধবীর জানা নাই কিন্তু এমন ভয় সে করে সদানন্দকে যে কাছে আসিলেই তার দেহমন কেমন একসঙ্গে আড়ষ্ট হইয়া যায়, সদানন্দ তাকে বুকে তুলিয়া লইলেও যেজন্য সে নূতন কিছুই আর অনুভব

করিতে পারে না, অনায়াসে সদানন্দের মুখের দিকে প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সে তো গা এলাইয়া দেওয়ার কথা, কোন হাঙ্গামাই তাতে নাই। এতকাল নিজের ও সদানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যা কিছু ঘটিয়াছে তাতে তার নিজের কিছুই করিবার বা বলিবার থাকে নাই, সদানন্দই সমস্ত করিয়াছে ও বলিয়াছে। আজ প্রথম নিজেকে মানুষটার নিষেধ অমান্য করিতে সক্রিয় করিয়া তুলিয়া ভিতরটা তার আবেগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাই, তার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া মহেশ আবার গাছতলায় ধর্ণা দিতে যাইবে এই আশাভঙ্গের সুযোগ অবলম্বন করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার উদ্দেশ্যটা যথারীতি সফল হইলে, সদানন্দকে প্রণাম করিয়া মহেশ বাড়ী ফিরিয়া গেলে, অন্য কোন উপলক্ষ্যে সে অবশ্য কাঁদিত। উপলক্ষ্য না পাইলে বিনা উপলক্ষ্যেই কাঁদিত।

সদানন্দ অপলক চোখে মাধবীলতার চোখে জল ভরিয়া উপচিয়া পড়ার প্রক্রিয়াটা দেখিতেছিল। এ দৃশ্য সে আগেও দেখিয়াছে, মাধবীর চোখ তখন তার চোখের আরও কাছে ছিল। তবু এমন স্পষ্ট-ভাবে আর কোনদিন কি মাধবীর চোখের কান্না দেখিয়াছে ইতিপূর্বে?

একটু ভাবিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সদানন্দ বলিল—মহেশ, আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম।

—পরীক্ষা প্রভু?

—হ্যাঁ। পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি সব জানি মহেশ, তুমি আসবার একমুহূর্ত আগে আমি আসন ছেড়ে উঠেছি। দরজা বন্ধ ছিল, তুমি আসবে বলে দরজা খুলে রেখেছি। তোমায় দেখে রাগের ভান করছিলাম, আমায় না জানিয়ে কেউ কি আমার কাছে আসতে পারে মহেশ? এখন বাড়ী যাও, কদিন বিশ্রাম করে আমার সঙ্গে এসে দেখা করো। দেখি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারি কি না।

শুনিতে শুনিতে টলিতে টলিতে মহেশ চৌধুরী কোনরকমে খাড়া ছিল, সদানন্দের কথা শেষ হইলে প্রণাম করিবার জন্য আগাইতে গিয়া দড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেল।

সুতরাং বিভূতির মাকেও শেষ পর্যন্ত ভিতরে আসিয়া সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে হইল। শশধরও আসিল। বিপিন আসিয়া চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল, একবার শুধু সে চোখ তুলিয়া চাহিল সদানন্দের দিকে, তারপর আর মনে হইল না যে আশেপাশে কি ঘটিতেছে এ বিষয়ে তার চেতনা আছে।

আধঘণ্টা পরে মহেশ চৌধুরীকে একটু সুস্থ করিয়া এবং একটু গরম দুধ খাওয়াইয়া শশধর ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বাহিরে দেখা গেল বিরাট কাণ্ড হইয়া আছে—শ-দুই নরনারী সেই কদমগাছটার তলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া। শ্রীধরকেও তাহাদের মধ্যে দেখা গেল।

মহেশকে দেখিয়া জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—মহেশ চৌধুরীকি জয়!

জনতার মধ্যে একজনও অবাঙ্গালী আছে কিনা সন্দেহ, মহেশ চৌধুরীও যে খাঁটি বাঙ্গালী সন্তান তাও কারও অজানা নাই, তবু জয়-ধ্বনিতে মহেশ চৌধুরীর নামের সঙ্গে কোথা হইতে যে একটি 'কি' যুক্ত হইয়া গেল!

তারপর কয়েকজন যুবক মহেশ চৌধুরীকে কাঁধে চাপাইয়া গ্রামের দিকে রওনা হইয়া গেল। কাঁধে চাপাইল একরকম জোর করিয়াই, মহেশ চৌধুরীর বারণও শুনিল না, বিভূতির মার ব্যাকুল মিনতিও কানে তুলিল না।

যতক্ষণ দেখা গেল আশ্রমের সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তারপর ছোট ছোট দলে আরম্ভ হইল আলোচনা। বিপিনও সদানন্দের কুটীরের সামনে দাঁড়াইয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিল, শোভাযাত্রা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে কাহারও সঙ্গে একটি কথা না বলিয়া সে সটান গিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে যেন হার মানিয়াছে, হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, অথবা দাঁতের ব্যথায় আবার কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

মাধবীলতা সদানন্দের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার ব্যাখ্যাও কৈফিয়ৎ বাকী আছে।

সদানন্দ সাগ্রহ অভ্যর্থনা করিল—এসো মাধবী।

কোথায় আসিবে মাধবী? কাছে? পাঁচ-সাত হাত তফাৎ হইতে এমনভাবে ডাকিলে তাই অর্থ হয়। মহেশ চৌধুরী খানিক আগে টলিতে টলিতে সদানন্দের দিকে আগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, মাধবীলতা কাঁপিতে কাঁপিতে পায়ে পায়ে আগাইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরীর মত দড়াম করিয়া পড়িয়াও গেল না। কিন্তু কাছে যাওয়ারও তো একটা সীমা আছে? তাই হাতখানেক ব্যবধান থাকিতে মাধবী-লতা থামিয়া পড়িল।

সদানন্দ হাত ধরিয়া তাকে পাশে বসাইয়া দিল। চিবুক ধরিয়া মুখখানা উঁচু করিয়া বলিল—মাধবী, তুমি তো কম দুষ্টু মেয়ে নও!

—ওঁর স্ত্রী যে মরে যাচ্ছিলেন।

—তাহলে অবশ্য তুমি লক্ষ্মী মেয়ে।—সদানন্দ একমুখ হাসিল।

মাধবীলতা থামিয়া থামিয়া সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা সদানন্দকে জানাইয়া দিল, নিজের কাজের কৈফিয়তে বলিল যে সদানন্দ পাছে রাজী না হয় এই ভয়ে একেবারে মহেশ চৌধুরীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

বলিয়া মাধবী হঠাৎ দাবী করিয়া বসিল সদানন্দের কৈফিয়ৎ, কাঁদ কাঁদ হইয়া বিনা ভূমিকায় সে প্রশ্ন করিয়া বসিল—কিন্তু আপনি ও কথা বললেন কেন মহেশবাবুকে?

—আমি জানতাম না মাধবী এত কাণ্ড হয়ে গেছে। তুমি ডেকে এনেছ জানলে কি আর আমি রেগে উঠতাম?

—না, তা নয়। আপনি মিছে কথা বললেন কেন? কেন বললেন আপনি সব জানতেন, ওঁকে পরীক্ষা করছেন?

সদানন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন—ওটা কি জান মাধবী—

কিন্তু মাধবী কি ও-সব কথা কানে তোলে? আকুল হইয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল আর বলিতে লাগিল—কেন আপনি মিছে কথা বললেন! কেন বললেন!

আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়া রোদ উঠিল, বিপিনের দাঁতের ব্যথা কমিয়া গেল, কিন্তু তার মুখের ব্যথিত ভাবটা যেন ক্ষুব্ধ বিষাদের মেকী ইস্পাতে গড়া মুখোসের মত হইয়া রহিল কায়েমী। রাগ হইলে বীররসের মধ্যে সেটা প্রকাশ করা বিপিনের অভ্যাস নয়। সদানন্দের মত যারা তার খুব বেশী অন্তরঙ্গ তাদের কাছে কদাচিৎ তাকে রাগ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সেও যেন কেমন এক খাপছাড়া ধরনের রাগ। রাগ বলিয়াই মনে হয় না। মনে হয়, ঠোঁট বাঁকাইয়া, মুখের চামড়া এখানে ওখানে কুঞ্চিত করিয়া বাঁকা চোখে চাহিবার একটা আশ্চর্য কৌশল সে কোন এক সময় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, আয়ত্ত রাখার জন্য রাগ করার সুযোগে প্র্যাকটিস্ করিতেছে। এবার বিপিনের মুখ দেখিয়া সদানন্দও বুঝিতে পারিল সে রাগ করিয়াছে, কিন্তু আগেকার রাগ করার ভঙ্গির সঙ্গে একেবারে মিল না থাকায় ভাবনায় পড়িয়া গেল।

—তোর কি হয়েছে রে বিপিন?

—কিস্সু না। হবে আবার কি?

বিপিনের কি হইয়াছে বোঝা গেল না, কিন্তু জবাবটা বোঝা গেল। বিপিন নিজেই জানে না তার কি হইয়াছে। এরকম ব্যাপার সকলের জীবনে সর্বদাই ঘটিতেছে, নিজের কিছু একটা হয় কিন্তু নিজের কাছে সেটা দুর্বোধ্য থাকে, এমন কিছু গুরুতর ঘটনা এটা নয়, সদানন্দ তা জানে। তবে নিজের কি হইয়াছে বুঝিবার চেষ্টাটা প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে দাঁড়াইয়া গেলে তখন হয় বিপদ, অধ্যবসায়টাই সাংঘাতিক গুরুত্ব পাইয়া বসে। এবং মাঝে মাঝে কম বেশী সময়ের জন্য এ রকম অধ্যবসায় মানুষের আসে বৈকি! বিপিনের কি তাই হইয়াছে?

—কি ভাবছিস ভাই?

ভাই! সদানন্দের সম্বোধনে বিপিনের তো রীতিমত চমক লাগেই, মনেও হয় যে সে বুঝি তাকে হঠাৎ গাল দিয়া বসিয়াছে। এমন সম্পর্ক তো তাদের নয় যে এমন গভীর স্নেহার্ত সুরে ভাই বলিতে হইবে, এতখানি আবেগময় আন্তরিকতার সঙ্গে? পরস্পরকে জানিয়া বুঝিয়া তাদের বন্ধুত্ব, পরস্পরের কাছে উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতে যেমন তাদের লজ্জা করে না, মনের দুর্বলতা আর বিকৃতি মেলিয়া ধরিতেও তেমনি ভয় বা সঙ্কোচ হয় না, অন্ততঃ কিছুকাল আগে তাই ছিল। এভাবে দরদ দেখানো তাদের মধ্যে চলিবে কেন? কি হইয়াছে সদানন্দের আজ, সাতদিন ঘরের কোণে কাটাইবার পর? বিপিন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, সে দৃষ্টির বিশ্লেষণ-পটুতা অসাধারণ। বিপিন উসখুস করে, সেটা তার শারীরিক অস্বস্তিবোধের চরম প্রমাণ।

তখন দুপুর বেলা, ঘণ্টা দুই আগে দুজনেরই মধ্যাহ্ন-ভোজন হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া, অনেক দ্বিধা করিয়া, মনকে শান্ত করিবার জন্য সাতদিন ঘরের কোণে নিজেকে বন্দী করিয়া রাখিয়া মনকে আরও বেশী অশান্ত করিয়া, অতিরিক্ত জ্বালাবোধের জন্যই মাধবীলতা সম্পর্কে অত্যাশ্চর্য আত্মসংযমের মধ্যে নিজেকে সত্য সত্যই মহাপুরুষ করিয়া ফেলিবার চরম সিদ্ধান্ত সদানন্দ গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সকালে তাই হঠাৎ মাধবীলতাকে আজই রাত্রে ঘরে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছে। কে জানিত মাধবীলতাকে এমনভাবে সে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিবে? সকালে নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে চোখে পড়িল স্নানরতা রত্নাবলী আর উমাকে, তাই মাধবীলতাকে খুঁজিতে সে জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল আশ্রমের দিকে। মাধবীলতাকে দেখা গেল এক আমগাছের তলে। আশ্রমে যে গোয়ালা দুধ যোগায়, তার বৌয়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে। গোয়ালা-বৌয়ের কাঁখের শিশুটি প্রাণপণে স্তন চুষিতেছিল, দুধের কারবার করে বটে গোয়ালা-বৌ, নিজের বুকে যে তার সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ জন্মে না, দেখিলেই সেটা বোঝা যায়।

সদানন্দকে দেখিয়া গোয়ালা-বৌ সরিয়া গিয়াছিল।

—রাত্রে একবার আমার ঘরে আসবে, মাধু ?

আদেশ নয়, অনুরোধ। মাধবীলতা নয়, মাধবী নয়, মাধু। পরে দুপুর বেলা বিপিনকে ভাই বলার ভূমিকার মত।

—রাত্রে ? কখন ?

—যখন তোমার সুবিধা হয়।

—সন্দেবেলা ?

—না, একটু রাত করে এসো। এই এগারটা সাড়ে-এগারোটার সময়।

অনুরোধ নয়, আদেশ। এতক্ষণে মাধবীলতা বুঝিতে পারিয়াছিল, আহ্বানটা খাঁটি অভিসারের, ধর্ষণের ফলে প্রেমের জন্ম হওয়ায় এতদিন যে পূর্বরাগের পালা চলিতেছিল আজ তার সমাধি।

—আজ নয়, পরশু যাব।—একটা হাত বাড়াইয়া মাধবী আমগাছের গুঁড়িতে স্থাপন করিয়াছিল, যেখানে ছিল পিঁপড়াদের সারি বাঁধিয়া যাতায়াতের পথ।

—না, আজ।

আদেশ নয়, প্রায় ধমক।

—আজ নয়, পরশু।

মিনতি নয়, মৃদু কোমল নিরুপায় বিদ্রোহ।

সদানন্দ তখন অন্ধ আর বোকা হইয়া গিয়াছে কিনা, তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচ বছরের প্রিয়াকে লজেঞ্জেসের লোভ দেখানোর মত কোমল কণ্ঠে বলিয়াছিল—তুমি কিছু বোঝ না মাধু। আজ ত্রয়োদশী, মেঘ-টেঘ না করলে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠবে, জ্যোৎস্নায় বসে তোমার সঙ্গে গল্প করব। এসো কিন্তু।

পরশু কি জ্যোৎস্না উঠিবে না ? পরশু কি জ্যোৎস্নায় বসিয়া গল্প করা চলিবে না ? কিন্তু প্রতিবাদের যতটুকু শক্তি মাধবীর ছিল এতক্ষণে প্রায় সবটুকুই শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার যদি সদানন্দ রাগিয়া যায় ? দুঃশাসন জানিয়াও যা বোঝে নাই, সদানন্দ কি না জানিয়া তা বুঝিবে ? তবু মাধবী অন্যভাবে চেষ্টা করিয়াছিল।

—উমাশশী, কুন্দ ওরা টের পাবে যে? একটা কেলেঙ্কারি হবে।

—আমি সে ব্যবস্থা করব।

সদানন্দ নিজেই যখন ব্যবস্থা করিবে তখন আর কার কি বলিবার থাকিতে পারে? একটিবার পশ্চিমে উঠিবার সাধ যদি সূর্যের থাকে, একমাত্র সদানন্দের হুকুমের সুযোগেই সাধটা মিটাইবার সম্ভাবনা কি অর সব চেয়ে বেশী নয়?

এইজন্য সদানন্দ আজ পেট ভরিয়া খাইতে পারে নাই। আহারে রুচি ছিল না। এখন সদানন্দের তাই ক্ষুধা পাইয়াছে। এদিকে দাঁতের ব্যথা না থাকায় কদিন প্রায় উপবাস করিয়া থাকিবার শোধ তুলিবার জন্যই বোধহয় বিপিন এত বেশী খাইয়া ফেলিয়াছিল যে এখন অম্বলে বুক জ্বলিতেছে। নিজেকে বিপিনের বড়ই ভোঁতা মনে হইতেছিল। সদানন্দের আদরের জবাবে সে তাই বলিল—ভাবছি তোর মাথা।

তারপর ঘরে আসিল মাধবী। ঘরে ঢুকিয়াই বিপিনকে সদানন্দের সঙ্গে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সদানন্দ বলিল—কি মাধবা?

—কিছু না, এমনি এসেছিলাম।—বলিয়া বোকার মত একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মাধবী প্রায় চলিয়া যায়, সদানন্দ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তার কাছে গেল।—শোন মাধু, শোন।

কাছে গিয়া গলা নামাইয়া বলিল—কিছু বলবে? চল বাইরে যাই।

দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল, বিপিন ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকা চোখে চাহিয়া রহিল খোলা দরজার দিকে।

মাধবীলতা বাহিরে আসিয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কথা বলে না। সদানন্দ চিবুক ধরিয়া তার মুখখানা উঁচু করিয়া ধরে। এটা সদানন্দের যেন অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

—কি বলবে বল?

কি আর বলিবে মাধবী, সেই পুরাতন কথা। আবার খানিকটা

সাহস সঞ্চয় করিয়া আজ রাত্রির অভিসার পিছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছে।

সদানন্দ জোর করিয়া মাধবীর মুখ উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ হাত সরাইয়া নেওয়ায় মাধবীর চিবুক প্রায় কণ্ঠার সঙ্গে ঠুকিয়া গেল। কিন্তু সদানন্দের মন সত্যই একটা চিন্তার সঙ্গে ঠোক্কর খাইয়াছে। কেন যে হঠাৎ সদানন্দের মনে হইল বড় পাকা মেয়ে মাধবীলতা, বড় ঝানু, প্রায় বাজারের বেশ্যার মত! দেহটা যে বেশী-পাকা আমের মত কোমল আর রঙীন মাধবীর, আদর করিয়া তাহার দেহে হাত বুলানোর সময় আঙ্গুলগুলির যে পাখীর পালকের মত কোমল হইয়া যাওয়া খুবই উচিত, সদানন্দ তা জানে। কিন্তু মাধবীর ভিতরটা শুধু শক্ত নয়, পাথর। বোঁটা-ছেঁড়া ফলের মত বছরের পর বছর ধরিয়া শুকাইয়া কুঁকড়াইয়া যাইতে পারিলে যেমন হইতে পারে সেইরকম শক্ত, এই ধরনের একটা চিন্তা মনে আসায় সদানন্দের কাছে মাধবীর দেহটা পর্যন্ত রঙচটা কাঠের খেলনার মত কুৎসিৎ হইয়া গেল।

কিন্তু—

কথাটা মনে হইল-মাধবীকে বিদায় দিয়া ঘরের মধ্যে বিপিনের কাছে চৌকীতে গিয়া বসিবার পর—আশ্রমে যে আসিয়াছিল কুমারী মাধবী? তাই তো!

ঠিক এই সময় সদানন্দ আর বিপিনের মধ্যে একটু কলহ হইয়া গেল। কত কলহ-বিবাদই আজ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে হইয়াছে, কি তীব্র ঝাঁঝ সে সব ঝগড়ার, মনে হইয়াছে জীবনে বুঝি আর দুজনের মধ্যে মিল হইবে না, কেহ কাহারও মুখ পর্যন্ত দর্শন করিবে না। কিন্তু কখন আবার বিনা ভূমিকায় দুজনে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে নিজেদেরই তাদের খেয়াল থাকে নাই। আজিকার কলহটা একেবারেই সে রকম হইল না। দুজন পুরুষের মধ্যে, বিশেষতঃ বিপিন আর সদানন্দের মত দুজন পুরুষ বন্ধুর মধ্যে এত মৃদু, এতখানি ভদ্রতাসম্মত কলহ হইতে পারে, এতদিন কে তা ভাবিতে পারিত!

বিপিন বলিল—ওটাকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করছিস সদা।

সদানন্দ বলিল—তুই তো সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি দেখিস।

বিপিন বলিল—ওকে আশ্রমে এনেছি আমি।

সদানন্দ বলিল—তাই বলে ওর ওপরে তোর অধিকার জন্মেছে না কি?

বিপিন বলিল—অধিকারের কথা নয়। ওর ভালমন্দের একটা দায়িত্ব তো আমার আছে?

সদানন্দ বলিল—অ! ভালমন্দের দায়িত্ব!

তারপর বিপিন চলিয়া গেল নিজের ঘরে, সদানন্দ বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল নদী। এ কি কলহ? এ তো নিছক কথোপকথন, অলস মধ্যাহ্নের স্বাভাবিক আলাপ। কিন্তু নিজের নিজের ঘরে বসিয়া বিপিনের উপর সদানন্দের আর সদানন্দের উপর বিপিনের রাগে গা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। একজন আরেকজনের কত অন্যায়, কত অবিচার, কত স্বার্থপরতা আজ পর্যন্ত সহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর সত্যই সহ্য হয় না একেবারে যেন পাইয়া বসিয়াছে।

সেদিন রাত্রে সত্যই জ্যোৎস্না উঠিল। আকাশে একেবারে যে মেঘ রহিল না তা নয়, বর্ষাকালের আকাশ তো। কিন্তু ছাড়া ছাড়া মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়াইলেই তো জ্যোৎস্নার শোভা বাড়ে, অনেকদিনের বিশ্বাস এটা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিপিন বাহির হইয়া পড়িল, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল আশ্রমের এক কুটীর হইতে অন্য কুটীরে। যে কোন সময় আশ্রম পরিদর্শনের অধিকার বিপিনের আছে। রাত্রির অসংখ্য বিচিত্র শব্দ আছে, কত তুচ্ছ অদৃশ্য প্রাণী শুধু শব্দের মধ্যে প্রাণের পরিচয় ঘোষণা করিয়া চলে, তবু দিনের চেয়ে রাত্রিতে স্তব্ধতা গভীরতর। দিবারাত্রি আশ্রমকে ঘিরিয়া যে নিবিড় শান্তি বিরাজ করে, বাহিরের তপ্ত মানুষকে যা জুড়াইয়া দেয় চোখের নিমেষে, রাত্রে যেন সেই শান্তির ভাব আরও বেশী অপার্থিব হইয়া ওঠে। চোখ জুড়াইয়া যায় বিপিনের চারিদিকে চোখ বুলাইয়া, মন ভরিয়া যায় মন-জুড়ানো আনন্দে, কোন কোন রাত্রে নিজেকে

ভুলিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য স্বপ্ন পর্যন্ত যেন সে দেখিতে আরম্ভ করিয়া দেয়—অবাস্তব অর্থহীন, কোমল মধুর স্বপ্ন : আদর্শের যে অবাধ্য, অপরিত্যাজ্য লেজুড়কে বিপিন ঘৃণাই করে চিরদিন।

আজ স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, একটু গর্ব পর্যন্ত অনুভব করিল না। নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আশ্রমের ছড়ানো কুটীরগুলি রহস্যময় ছায়ালোকবাসী নির্বাক নিশ্চল দৈত্যের মত ছোট বড় গাছগুলি দেখিয়া গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তার শুধু মনে হইল, কি অকৃতজ্ঞ সদানন্দ, কি স্বার্থপর সদানন্দ, কি বিশ্বাসঘাতক সদানন্দ! নিজে রাজ্য সৃষ্টি করিয়া নিজেকে বিসর্জন দিয়া সদানন্দকে রাজা করিয়াছে যে, আজ সদানন্দ তাকেই হীন মতলববাদ মানুষ মনে করিয়া তুচ্ছ করে। অন্যমনে বিপিন এক কুটীরের অধিবাসীদের সঙ্গে দুটি একটি কথা বলিয়া অন্য কুটীরে চলিয়া যায়। কেহ শয়ন করিয়াছে, কেহ শয়নের আয়োজন করিতেছে, কেহ আসনে বসিয়া চিন্তাসাধনায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে, কেহ বারান্দায় বসিয়া করিতেছে মেঘের গতিতে চাঁদের গতি সৃষ্টির ভ্রান্তিকে উপভোগ।

উমা আর রত্নাবলীর কুটীরের সামনে আসিয়া বিপিনের অন্যমনস্কতা ঘুচিয়া গেল। বারান্দার নিচে দাঁড়াইয়া আছে শশধর, বারান্দার থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া তার সঙ্গে কথা বলিতেছে রত্নাবলী।

চিনিতে পারিয়াও বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কে?

শশধর উৎসাহের সঙ্গে বলিল—আমায় চিনলেন না? সেই যে সেদিন—

রত্নাবলী সোজাসুজি বলিল—উনি মহেশবাবুর ভাগ্নে।

বিপিন বলিল—এত রাত্রে আপনি এখানে কি করছেন?

বিপিনের গলার সুরে শশধরের উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছিল, সে আমতা আমতা করিয়া বলিল—মহেশবাবু বললেন কিনা—

তার হইয়া রত্নাবলী কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিল—মহেশবাবুর খুব অসুখ, একশ চারে জ্বর উঠেছে; মাধবীকে একবার

দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। শশধরবাবু তাই বলতে এসেছেন, মাধবী যদি একবার যায়—

—এত রাত্রে? দিনের বেলা বলতে এলেই হত?

বিপিনের আবির্ভাবেই রত্নাবলী যেন বিরক্ত হইয়াছিল, জেরা আরম্ভ করায় সে যেন রাগিয়া গেল।

—আপনি বুঝছেন না। দিনের বেলা অতটা ব্যাকুল হন নি। এখন এতবেশী ছটফট করছেন যে শশধরবাবু ভাবলেন, মাধবীকে যেতে বলে গেছেন এ খবরটা জানালে হয়ত একটু শান্ত হবেন। তাই এখন বলতে এসেছেন্। নইলে এতরাত্রে ওঁর আশ্রমে আসবার দরকার!

এত কথা এক সঙ্গে রত্নাবলী কোনদিন বলে না। চাঁদের আলোতেও বোঝা যায়, রত্নাবলীর দাঁতগুলি কি ধবধবে। ব্যাপারটা বিপিনের একটু জটিল মনে হইতে লাগিল। মহেশ চৌধুরীর খুব অসুখ হইয়াছে, মাধবীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, শুধু এই ব্যাপারটুকুই কম জটিল নয়। জগতে এত লোক থাকিতে মাধবী-লতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা কেন? কতটুকুই বা তার পরিচয় মাধবীর সঙ্গে! মাধবীলতাকে কথাটা জানাইতে এত রাত্রে আশ্রমে আসিয়া রত্নাবলীর সঙ্গে শশধরের গল্প জুড়িয়া দেওয়াটাও জটিল ব্যাপার বৈকি। উমা আর মাধবীলতার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা আরও বেশী জটিল।

জিজ্ঞাসা করায় রত্নাবলী বলিল—ওরা খাচ্ছে।

—এখনও খাওয়া হয় নি কেন?

রত্নাবলী মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া ঝাঁঝালো গলায় বলিল—কারণ আছে। ওসব মেয়েদের ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। পারি না বাপু আর আপনার কথার জবাব দিতে!

মনে মনেও কোন রকমেই বিপিন রাগ করিতে পারিতেছিল না, আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করা, তার উপর এখন কড়া কথা বলা কিছুই যেন তার কাছে গুরুতর মনে হইতেছিল না। আশ্রমের নিয়মেই যেন এসব ঘটিতেছে, আগাগোড়া যেন তার নিজেরও সমর্থন আছে।

একটু ভাবিল বিপিন, তারপর কোন রকমে গলা গম্ভীর করিয়া বলিল —আপনি ভেতরে যান, রাত্রে কেউ কোন দরকারে আশ্রমে এলে এবার থেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর আপনি বাড়ী ফিরে যান শশধরবাবু, মহেশবাবুকে বলুন গিয়ে মাধবীকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি যাচ্ছি।

—আজ রাত্রেই যাবেন?

—অসুখ বিসুখের সময় কি দিন-রাত্রির বিচার করলে চলে? সময় বুঝে মানুষের অসুখ হয় না। বুড়ো মানুষ, এমন অসুখে পড়েছেন, তাঁর সামান্য একটা ইচ্ছা যদি আমরা না পূর্ণ করতে পারি, আমাদের আশ্রমে থাকা কেন? নিজেরা সুখে থাকার জন্য আমরা আশ্রম-বাস করি না শশধরবাবু।

শশধর অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বিপিন তাগিদ দিয়া বলে—দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আপনি যান। বলুন গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা যাচ্ছি।

শশধর চলিয়া গেলে রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল—এত দূর রাস্তা যাবেন কি করে? হেঁটে?

—সে ভাবনা তো আপনাকে ভাবতে বলি নি? আপনাকে যা বললাম তাই করুন, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

রত্নাবলী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—আমি সঙ্গে যাব না?

বিপিন বলিল—না।

এতরাত্রে বিপিন একা মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া মহেশ চৌধুরীর বাড়ী যাইবে। মহেশ চৌধুরীর বাড়ী কাছে নয়, আশ্রম হইতে প্রায় চার মাইল পথ। বিপথে মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া গেলে পথ কিছু সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এখন বর্ষাকালে দিনের বেলাও সে পথে যাতায়াত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আশ্রম হইতে বাগবাদা যাইতে হইলে সাতুনার গা ঘেঁষিয়া যাইতে হইবে, সাতুনা বেশী দূরে নয়। সাতুনা পর্যন্ত যাওয়ার আগেই পথের ধারে ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকজন গৃহস্থের খানকয়েক বাড়ী আর ক্ষেতখামার পাওয়া যায়,

তাদের কারও গরুর গাড়ী আছে। বিপিন কি লোক পাঠাইয়া গরুর গাড়ী আনাইয়া লইবে ? অথবা মাধবীকে সঙ্গে করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিবে, পথে ওই ছোট পাড়াটিতে হোক, সাতুনায় হোক, কারও কাছে সংগ্রহ করিয়া লইবে গরুর গাড়ী ? গরুর গাড়ী না পাওয়া গেলে হাঁটিয়াই হাজির হইবে বাগবাদায় মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে ? এইসব ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয়,—আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী ক্ষান্তবর্ষার রাত্রি রত্নাবলীকে ঘিরিয়া আছে, নির্জন পথ বাহিয়া দুজন হাঁটিয়া চলিয়াছে ঘুমন্ত গ্রামের গা ঘেঁষিয়া, পথের খানিক খানিক ভিজা চাঁদের আলোয় ঢাকা আর খানিক বড় বড় গাছের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার, কোথাও ঝোপ-ঝাড় পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, কোথাও দুদিকেই জলভরা ক্ষেত : হাঁটিয়া চলিতে চলিতে দুজনে কখন উঠিয়া বসিয়াছে গরুর গাড়ী'ত ছাউনির মধ্যে, গাড়ীর দোলনে এদিক ওদিক টলিতে কখন তারা জড়াইয়া ধরিয়াছে পরস্পরকে, কখন শশধরের দুটি হাত অন্ধের দুটি হাতের মত রত্নাবলীর সর্বাঙ্গে ব্যাকুল আগ্রহে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গের পরিচয়—একা বিপিনের সঙ্গে একাকিনী মাধবীর এত রাত্রে মহেশ চৌধুরীর বাড়ী যাওয়ার নানারকম অসুবিধা ও অসঙ্গতির কথা ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর গায়ে সত্যই কাঁটা দিয়া ওঠে ! বিপিনের কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে ? কাল মাধবীকে নিয়া গেলে চলিবে না মহেশ চৌধুরীর বাড়ী ?

—কি ভাবছেন ? খাওয়া হয়ে থাকলে মাধবীকে পাঠিয়ে দিন বাইরে।

—আমিও যাই না আপনাদের সঙ্গে ?

বিপিন মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া বলিল—না না, আপনাকে যেতে হবে না।

—আমি সঙ্গে না গেলে মাধু আপনার সঙ্গে যাবে না।

—মাধু যাবে কি যাবে না সেটা আপনার কাছে না শুনে মাধুর কাছেই না হয় শুনতাম ?

রত্নাবলী অধীর হইয়া বলিল—বুঝেও কি বুঝতে পারেন না আপনি? এত রাত্রে আপনার সঙ্গে মাধুকে আমি যেতে দেব না। যদি চেষ্টা করেন নিয়ে যাবার, হৈ-চৈ গণ্ডগোল বাধিয়ে দেব।

বিপিনের যে প্রতিভা কদিন হইতে মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, রত্নাবলীর মুখে একথা শুনিবামাত্র সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙার মত চোখের পলকে জাগিয়া উঠিল। সত্যই চোখের পলকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পর্যন্ত পাওয়া গেল বিপিনের চোখেই। রত্নাবলী স্পষ্ট দেখিতে পাইল একবার কি দুবার পলক পড়ার মধ্যে বিপিনের চোখ যেন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল অন্ধকারে হিংস্র পশুর চোখের মত, তারপর হইয়া গেল জ্ঞানের ছানি পড়া বৃদ্ধের চোখের মত স্তিমিত।

—আপনাকে নিলে আর গোলমাল করবেন না?

—না। আমি সঙ্গে গেলে—

—ডাকব নাকি সবাইকে?

রত্নাবলী ভয় পাইয়া বলিল—সবাইকে ডাকবেন? সবাইকে [illegible]? কেন ডাকবেন সবাইকে?

বিপিন গম্ভীর মুখে বলিল—পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যাওয়া কি ভাল নয়? আপনি এত সঙ্কোচ [illegible] করছেন কেন, আপনি প্রথম নন, আপনার মত দু-একজন এ ভাবে আশ্রম ছেড়ে গিয়েছে।

—আশ্রম ছেড়ে যাব?—এতক্ষণ রত্নাবলী দাঁড়াইয়াছিল, এবার দাওয়ায় উঠিবার ধাপটিতে বসিয়া পড়িল। বলিল—একটু বসি, পা ধরে গেছে। কি বলছেন আপনি বুঝতে পারছি না।

কথাটা সত্য নয়। রত্নাবলী বেশ বুঝিতে পারিতেছিল সব। অনেকদিন আগে, [illegible]বছর দুবছরের [illegible] না, সে তখন অল্পদিন হয় আশ্রমে [illegible] করিতে আসিয়াছে, বিপি[illegible] একদিন এমনিভাবে অসময়ে হঠাৎ সকলকে ডাকিয়াছিল। গীতা নামে একটি শিষ্যার আশ্রমে মন টিকিতেছে না, সে চলিয়া যাইবে, সকলের কাছে বিদায়

চাহিতেছে। সে দৃশ্য রত্নাবলীর মনে গাঁথা হইয়া আছে। কুটীরের সামনে মাটিতে বসানো দুটি লণ্ঠনের আলো সকলের মুখে পড়িয়াছে, কারও মুখে বেশী, কারও কম। সকলে নির্বাক—পাথরের মূর্তির মত নির্বাক। এখনকার চেয়ে শিষ্য ও শিষ্যার সংখ্যা তখন কম ছিল আশ্রমে।

সীতা কাঁদিতেছিল। দাওয়ায় বসিয়া মুখ নিচু করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। কয়েকদিন আগে সীতার স্বামীকে বিপিন আশ্রমেরই কি একটা কাজে দূরদেশে পাঠাইয়াছে, তিন-চারদিন পরে সে ফিরিয়া আসিবে। কল্যাণী নামে আশ্রমের একটি মেয়েকে বিপিন সেই ক'টা দিন সীতার সঙ্গে তার কুটীরে থাকিতে বলিয়া দিয়াছিল। বছর বার বয়স ছিল কল্যাণীর আর ছিল কাঠির মত সরু চেহারা। একটু তফাতে দাওয়ার একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে ভয়ার্ত চোখে চাহিয়াছিল। সীতার মুখের চেয়ে কল্যাণীর সেই দৃষ্টিই রত্নাবলীর বেশী স্পষ্টভাবে মনে আছে।

সকলেই জানিত, একঘণ্টা আগে কল্যাণীর বাবাকে অবিলম্বে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং সে গরুর গাড়ী আনিতে গিয়াছে। কল্যাণীর বাবার মত রূপবান পুরুষ রত্নাবলী কখনো দেখে নাই। শান্তির খোঁজে ভদ্রলোক সদানন্দের আশ্রমে আসিয়াছিল, কিন্তু একটু স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় বিপিনের সঙ্গে ক্রমাগত খিটিমিটি বাধিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিতেছিল। মানুষটাকে সকলেই পছন্দ করিত, মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আবার সংসারে ফিরিয়া যাইতেছে জানিয়া সকলের দুঃখও হইয়াছিল, আনন্দও হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনার সীতা-সংক্রান্ত আকস্মিক পরিণতিতে সকলে থতমত খাইয়া গিয়াছিল।

তারপর বিপিন সীতাকে বলিয়াছিল—আপনি তবে তৈরী হয়ে নিন।—তখন সীতা বলিয়াছিল—আমি যাব না—উনি না ফিরে এলে এক পা নড়ব না আমি এখান থেকে।

বিপিন যেন স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিল—সে কি!

সীতা প্রায় আর্তনাদ করিয়া বলিয়াছিল—উনি নেই, এভাবে আপনারা আমায় তাড়িয়ে দিতে পারেন না।

বিপিন গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল—আপনাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কে?

কল্যাণীর বাবা গরুর গাড়ী আনিয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বিদায় হইয়া গিয়াছিল, সীতা কয়েকটা দিন আশ্রমে ছিল। সীতার স্বামী কিন্তু আর আশ্রমে ফিরিয়া আসে নাই। বিপিন কি তাকে আশ্রমের কাজে বাহিরে পাঠাইয়াছিল? বাহিরে থাকিতে আশ্রমের কোন কথা কানে যাওয়ায় আর সে ফিরিয়া আসে নাই? অথবা নিজেই সে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল? এইসব ছিল তখন সকলের জিজ্ঞাস্য। এখনও এসব জিজ্ঞাস্যই রহিয়া গিয়াছে। কয়েকদিন স্বামীর প্রতীক্ষা করিয়া সীতাও যেন আশ্রম হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

বিপিন রত্নাবলীকে লক্ষ্য করিতেছিল। আশ্রমের নিয়ম তো আছেই, তাছাড়া রত্নাবলী নিজেও অত্যন্ত সাবধান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, রত্নাবলীর দেহটাই বড় বেহায়া। দেখিতে দেখিতে বিপিনের মনে হয় কি, এর কাছে কোথায় লাগে মাধবীলতা, গ[illegible]র কাছে কাঁথার মত? তবু মাধবীলতার আকর্ষণ কত বেশী। রত্নাবলী[illegible] এতকাল সে কি দেখিয়াও কোনদিন চাহিয়া দেখিয়াছে? [illegible]রে হোক নদীর ঘাটে হোক, রত্নাবলী দৃষ্টিপথে পড়িলে তাকে না দেখিয়া অবশ্য থাকা কঠিন, অন্ততঃ তাড়াতাড়ি সরিয়া যাওয়ার আগে,—মেয়েদের দিকে তাকানো উচিত নয় মনের এই ছুঁতাতেও অন্ততঃ—একটিবার রত্নাবলীকে দেখিতেই হয়, কিন্তু সে দেখা ওই দেখা পর্যন্তই। রত্নাবলী যেন আকর্ষণ করে না, কেবল মনটা বিচলিত করিয়া দেয় কিছুক্ষণের জন্য। মাধবীলতা ও রত্নাবলীর তুলনামূলক সমালোচনাটা বিপিন আগেও যে কোনদিন করিতে পারিত, কিন্তু এই মুহূর্তের আগে কথাটা যেন তার খেয়ালই হয় নাই। কথাটা মনে পড়িয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। সে জানে, এখন তাকে এই দাওয়ায় বসাইয়া কুটীরের সামনে খোলা যায়গায় জ্যোৎস্নালোকে মাধবী আর রত্নাবলী

যদি পরস্পরে কিছু তফাতে দাঁড়ায়, যাতে এক একটি চোখের কোণে সে এক একজনকে আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া জ্যোৎস্নার আবরণ অঙ্গে চাপানোর প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃতা দেখিতে পায়, দুটি চোখই তার অপলক হইয়া থাকিবে রত্নাবলীর দিকে কিন্তু মন তার পড়িয়া থাকিবে মাধবীলতার কাছে। অভদ্র কল্পনাটি বিপিনের রোমাঞ্চকর মনে হয়। বিপিনের নিজেরই একটা ধারণা ছিল যে মোটামুটি হিসাবে বছর ত্রিশেক বয়স হইবার পর মানুষের আর এ ধরনের কল্পনা ভাল লাগে না, ছেলেমানুষী মনে হয় হাসি পায়—রাজা সাহেবের বাড়ীতে দেয়ালে টাঙ্গানো কয়েকটি নগ্না নারীর প্রকাণ্ড চিত্র দেখিয়া বিপিন ওই ধারণাটি সৃষ্টি করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল যে এই ছবিগুলির দিকে কেউ তাকাইয়াও দেখে না, দেখিয়া দেখিয়া আর কারও কিছুমাত্র কৌতূহল নাই—রক্তমাংসের স্ত্রীলোকের বেলাও মানুষের তাই হয়, প্রথম বয়সটা কাটিয়া যাওয়ার পর নারীদেহ সম্বন্ধে মানুষের সমস্ত কৌতূহল মিটিয়া যায়। প্রথম বয়স বিপিনের বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বয়সটাও প্রায় কাটিতে চলিল, তবু রত্নাবলী ও মাধবীলতা সম্বন্ধে ছেলেমানুষী কল্পনা করিতে তার ভাল লাগিতেছে কেন, এটা অবশ্য বিপিন ভাবিয়া দেখিল না। রত্নাবলীর পাশে বসিয়া সে হঠাৎ একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ফেলিল—এত জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল বলিবার নয়। রত্নাবলী আরও ভয় পাইয়া গেল। পাশে বসে কেন বিপিন? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেন বিপিন? অমন করিয়া তাকায় কেন বিপিন জ্ঞানী বৃদ্ধের মত?

—আপনি বড় ছেলেমানুষ রতন দেবী!

গা ঘেঁষিয়া বিপিন বসিয়াছে। বিপিন যদি এবার গায়ে হাত দেয়? যদি জড়াইয়া ধরে? পুরুষ মানুষকে রত্নাবলী বিশ্বাস করে না। মেয়েমানুষ সব সময়েই সংযত থাকিতে পারে, কিন্তু পুরুষ মানুষের সময় শুধু অন্যমনস্কতা, হয়তো পাঁচ-সাত বছর কোন মেয়ের কথা মনেও পড়িল না, কিন্তু তার পাশে গা ঘেঁষিয়া বসিবার পর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে হয়তো এমন পাগলামী করিয়া বসিল যার তুলনা

হয় না। বিপিনের কিছু হইবে না, বিপদে পড়িবে সে। সে যদি গোলমাল করে, সকলে যদি বুঝিতেও পারে যে দোষ আগাগোড়া বিপিনের তবু বিপিনের এতটুকু আসিয়া যাইবে না, মারা পড়িবে সে-ই।

—উমা-মাসী আসছে বোধ হয়।

সহজভাবে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াও কোন লাভ হইল না, রত্নাবলীর নিজের কানেই কথাগুলি শুনাইল যেন সে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রণয়ীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

বিপিন একটু হাসিল।

—আসুন না, সকলেই তো আসবেন।

—সকলে আসবেন কেন! ও-কথা বলছেন কেন আপনি!

কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে কিনা মনে মনে রত্নাবলী তাই ভাবিতেছিল, গলাটা তাই কাঁদ কাঁদ শোনাইল। মেয়েদের প্রকৃতিই এই রকম—একটা কিছু করিবে কি করিবে না ভাবিতে ভাবিতে কাজটা অর্ধেক করিয়া ফেলে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে নিজেকে দান করার আগে ঠিক করিয়া ফেলিতে পারে নাই আত্মদান করিবে কি না।

[ লেখকের মন্তব্য: কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই, রত্নাবলীকে বুঝিতে হইলে কথাটা মনে রাখা দরকার। কোন বিষয়ে আগে হইতে মন স্থির করিয়া ফেলিবার ক্ষমতাটাই মনের জোরের চরম প্রমাণ হিসাবে প্রায় সকলেই গণ্য করিয়া থাকে, আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওটা গোঁয়ারতুমিরই রকমফের। ধরা বাঁধা নিয়মগুলি জীবনে কাজে লাগে না, ধরা বাঁধা নিয়ম কি জীবনে বেশী আছে? যেগুলিকে অপরিবর্তনীয় নিয়ম বলিয়া মনে হয়, আসলে সেগুলি মানুষের আরোপ করা বিশেষণ মাত্র, উল্টাটাও অনায়াসে খাটিতে পারিত। মানুষ কি চায়, মানুষ কি করে এবং মানুষের কি চাওয়া উচিত আর মানুষের কি করা উচিত, এর কি কোন নির্দিষ্ট ফরমূলা আছে? অন্যের প্রস্তুত করা ফরমূলা চোখ কান বুজিয়া অনুকরণ করা,

হয় বোকামি নয় গোঁয়ারতুমি। মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যারা সুবিধাবাদী, তারা বোকাও নয় গোঁয়ারও নয়। এই জন্ত তারা আগে হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া চরম সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, দরকার মত কাজ আরম্ভ করে কিন্তু মন সিদ্ধান্তের বাঁধনে বাঁধা পড়িতে চায় না। শশধরের বাহুর বাঁধন রত্নাবলী মানিয়া লইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনও সে কি স্বীকার করিবে নারীজন্ম তার সফল হইল অথবা মস্ত একটা ভুল সে করিয়া বসিয়াছে ঝোঁকের মাথায়? দেহ অবশ্য তার অবশ হইয়া যাইবে, চোখ মেলিয়া চাহিবার ক্ষমতাও হয়তো থাকিবে না, মনে প্রায় এই ধরনেরই একটা চরম সিদ্ধান্ত সমস্ত চিন্তাকে দখল করিতে চাহিবে যে জীবনের তার অতীতও ছিল না ভবিষ্যতও থাকিবে না, তবু সে তখনও ভাবিতে থাকিবে যে, শশধর যদি তাকে কামনা করে, নিজেকে সে কি তখন দান করিবে? নিজেকে দান করা কি উচিত হইবে তার?

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রত্নাবলীর এই প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তিটা একটু অসাধারণ। সে যেন ইচ্ছা করিয়া নিজেকে ধাঁধাঁয় ফেলিয়া দেয়। সে যেন সব সময় সচেতন হইয়া থাকে যে, কি করিবে না করিবে ঠিক সে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং তাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।]

বিপিন আবার মৃদু একটু হাসিয়া বলিল—আপনি বড় ছেলেমানুষ। —বলিয়া নিছক বাহাদুরী করার জন্যই গম্ভীর মুখে হাত বাড়াইয়া রত্নাবলীর গালটা টিপিয়া দিল। রত্নাবলী মাথায় ঝাঁকি দিল, আধ হাত সরিয়া বসিল এবং ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—আর কিছুই করিল না। একটু অপেক্ষা করিয়া রত্নাবলীর নিশ্চেষ্ট শান্তভাবে খুসী হইয়া বিপিন বলিল—মাধুকে নিয়ে যাচ্ছি, মহেশবাবুর বাড়ীতে রেখে আসবো বলে। এখন কয়েকদিন ঐখানেই থাকবে, তারপর যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরে যাবে। ওর পক্ষে আশ্রমে থাকাও চলবে না, আমাদেরও ওকে রাখা চলবে না। আপনি বলছেন, আপনি সঙ্গে

না গেলে ওকে আপনি যেতেই দেবেন না, আমি তাই ভাবলাম আপনিও বুঝি চিরদিনের মত ওর সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে চাইছেন। তাই সকলকে ডাকার কথা বলছিলাম। আপনি তো মাধবীর মত চুপি চুপি আশ্রমে আসেন নি, আপনি কেন চুপি চুপি আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন—যেতে হলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই যাবেন।—বলিয়া বিপিন হাসিতে লাগিল।

গাল টিপিয়া দেওয়ায় রত্নাবলী আধ হাত তফাতে সরিয়া গিয়াছিল, এবার প্রায় হাতখানেক কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল- মাধু চলে যাচ্ছে আশ্রম থেকে?

সায় দিবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে যাওয়ায় বিপিনের মুখ প্রায় রত্নাবলীর মুখের সঙ্গে ঠেকিয়া গেল। তা হোক, তাতে দোষ নাই, গোপন কথার আদান-প্রদানের সময় মানুষের মুখ কাছাকাছিই আসে। ভিতরের কৌতূহল রত্নাবলীর চোখ দুটিকে যেন সত্যসত্যই খানিকটা বাহিরের দিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। তেমনি চাপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করিল—কি করেছে মাধু? কার সঙ্গে করেছে?

—কি করবে? কার সঙ্গে করবে? ওতো আশ্রমে চিরকাল থাকবার জন্য আসে নি—কদিন বেড়িয়ে গেল, এই মাত্র।

—আমার কাছে লুকোন কেন? বলুন না? পায়ে পড়ি, বলুন।

—কি বলব?

রত্নাবলী হতাশ হইয়া গেল। অভিমানে সরিয়া বসিল। কি করিয়াছে মাধবী? আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে এমন কি অপরাধ মেয়েটা করিয়াছে! এতকাল সঙ্গে থাকিয়াও জানিতে পারিল না! জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তো মাধবীকে, মাধবী চলিয়া যাওয়ার আগে।

—বসুন, ডেকে দিচ্ছি মাধবীকে।

—আপনি বসুন, আমিই ডেকে আনছি।

ডাক শুনিয়া মাধবীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।

—এখুনি যেতে হবে আপনার সঙ্গে ?

—হ্যাঁ, এখুনি যেতে হবে।

—চলুন তবে, যাই।

যাওয়ার সময় দাওয়ায় বসিয়া রত্নাবলী ক্ষীণস্বরে একবার মাধবীলতাকে ডাকিল। মাধবী সাড়া দিল না। ছুটিয়া গিয়া উন্মাদিনীর মত সদানন্দের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাকে খুন করিয়া ফেলিবার জন্য তার ধৈর্য ধরিতেছিল না। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠায়! সে এত সস্তা, মানুষের কাছে তার মর্যাদা এত কম যে প্রকাশ্যভাবে বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে অভিসারে যাওয়ার হুকুম পাঠাইয়া দিতে পারে এমন অনায়াসে!

বিপিন আশ্চর্য হইয়া বলে—ওদিকে কোথায় চলেছ ?

মাধবীলতা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—ক্ষপরদালালি করবেন না—আমি পথ চিনি।

—শোনো, শোনো। দাঁড়াও।

পিছনে পিছনে খানিকটা প্রায় ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতার হাত ধরিয়া বিপিন তাকে দাঁড় করায়। মাধবী বলে—ও! আপনি বুঝি পাওনা মিটিয়ে নেবেন আগে ? শীগগির নিন, একটু তো ঘুমোতে হবে রাত্রে ?

বিপিন কোমল কণ্ঠে বলে—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মাধু ? কি বকছ পাগলের মত ?

মাধবীলতাও কোমল কণ্ঠে বলে—মাথা খারাপ হবে না ? যা আরম্ভ করে দিয়েছেন আপনারা, এতে মাথা ঠিক থাকে মানুষের ? এর চেয়ে কুমারসায়েবের মিস্ট্রেস হওয়াই আমার ভাল ছিল, কিছুদিন তো মজা করে নিতাম।

এখানটা ফাঁকা, কাছাকাছি দু-একটি মোটে গাছ আছে। এদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো আশ্রমের কুটিরগুলির কয়েকটি মাত্র চোখে

পড়ে আর এদিকে চোখে পড়ে সদানন্দের কুটীর। জ্যোৎস্নালোকে কুটীর ও আবেষ্টনীর মধ্যে ফাঁকা মাঠে মাধবীলতার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে বিপিনের মনে হয়, আঙ্গুলগুলি যদি তার পাখীর পালকের মত কোমল হইয়া না যায় আর কে[illegible] মেয়েটার সর্বাঙ্গে সস্নেহে আঙ্গুল বুলাইয়া না দেয় পৃথিবীটাই রসাতলে চলিয়া যাইবে! অকারণে নিজেকে এই মেয়েটার জন্য মহাশূন্যে বিলীন করিয়া দিবার কোনও একটা কারণ কি আবিষ্কার করা যায় না? অসহ্য কোন যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না এই মেয়েটার জন্য? অসম্ভব কোন কার্য সম্ভব করা চলে না? ভাবিতে ভাবিতে মাধবীলতার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিপিন মৃদুস্বরে বলে—মাধু, কে তোমার ওপর অত্যাচার করছে বল, কাল তাকে আশ্রম থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। এ আশ্রম আমার, দলিলপত্রে আমার নাম আছে, আমার কথার ওপর কারও কথা কইবার অধিকার নেই। কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে, একবার তার নামটি শুধু তুমি বল।

কি উগ্র উদারতা বিপিনের! এদিকে চাপিয়া ধরিয়াছে মাধবীর মাথাটা নিজের বুকে, মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কে অত্যাচার করিয়াছে তার উপর, কে কষ্ট দিয়াছে তার মনে? একটু কাঁদে মাধবীলতা, একটু ফোঁস ফোঁস করে। বিপিন ব্যাকুল হইয়া বলে—কেন কাঁদছ মাধু? কেঁদো না। বল না তুমি কি চাও? অন্য কোথাও চলে যাবে?

—কোথায় যাব? কার কাছে যাব?

—যেখানে যেতে চাও পাঠিয়ে দেব। নিজে আমি তোমার নামে বাড়ী কিনে দেব, ব্যাঙ্কে তোমার নামে টাকা জমা রেখে দেব—

—আপনার মিস্ট্রেস হয়ে থাকতে হবে তো?

বিপিন একটু ভাবিল। হাতের আঙ্গুল পাখীর পালক নয় বলিয়া আপসোস করার সময় সদানন্দ যেমন ভুলিতে পারিতেছিল না যে মাধবীলতার ঠোঁটের নিচে দাঁত আছে আর আঙ্গুলের ডগায় নখ আছে আর রক্তমাংসের তলায় হাড় আছে, বিপিনও তেমনি এখন কেবলি

ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল যে মাধবীলতা যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বিপিন তারপর জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি বল?

মাধবীলতা চুপ। বিপিন সত্যই মানুষ নয়।

—যাকগে, ওসব কথা পরে হবে। এখন চলো তোমাকে মহেশ-বাবুর ওখানে রেখে আসি।

—মহেশবাবুর ওখানে?

—হ্যাঁ। এখানে তোমার থাকা চলবে না।

মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বিপিনের সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া নৌকাটিতে উঠিয়া বসিল। ছোট ডিঙ্গি নৌকা, ছাউনি নাই, হাল নাই, বসিবার ভাল ব্যবস্থাও নাই। তবু পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার চেয়ে নৌকায় মহেশ চৌধুরীর বাড়ী যাওয়া অনেক সুবিধা। বিপিন নৌকা বাহিতে জানে।

কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়া মহেশ চৌধুরী সারিয়া উঠিল। এ কয়দিন কত লোক আসিয়া যে তার খবর জানিয়া গেল হিসাব হয় না। কেবল খবর জানা নয়, পায়ের ধূলা চাই। সদানন্দের আশ্রম জয় করিয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরীও পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছে। লোকের ভিড়েই মহেশ চৌধুরীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, মাধবীলতাকে পৌঁছিয়া দিতে আসিয়া কথায় কথায় এই বিপদের কথাটা শুনিয়া বিপিন ভাল পরামর্শ দিয়া গেল। পরদিন হইতে শশধর সকলকে একটি করিয়া তুলসীপাতা বিতরণ করিয়া দিতে লাগিল· উঠানের মস্ত তুলসীগাছটি দেখিতে দেখিতে দু-একদিনের মধ্যে হইয়া গেল প্রায় ন্যাড়া। যারা আসে তাদের প্রায় সকলেই চাষী-মজুর কামার-কুমার শ্রেণীর এবং বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক— তুলসীপাতা পাইয়াই তারা কৃতার্থ হইয়া যাইতে লাগিল।

বিপিন প্রত্যেক দিন খবর জানিতে আসে। কার খবর জানিতে আসে, মহেশের অথবা মাধবীলতার, সেটা অবশ্য ঠিক বুঝা যায় না। যদিও মহেশের কাছেই সে বসিয়া থাকে অনেকক্ষণ, আলাপ করে নানা বিষয়ে। আশ্রমে বিপিনের কাছে মহেশ বহুদিন ধরিয়া যে অবহেলা অপমান পাইয়া আসিতেছে সে কথা কেউ ভুলিতে পারিতেছিল না, এখন মহেশের খাতির দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের কদমগাছের নিচেই কি মহেশের সব লাঞ্ছনার সমাপ্তি ঘটিয়াছে? সদানন্দ কি সত্যই এতকাল মহেশকে পরীক্ষা করিতেছিলেন, বিপিন এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলে তারই ইঙ্গিতে মহেশের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিতেছিল? পরীক্ষায় মহেশ সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ায় এবার বিপিন বাড়ী আসিয়া তার সঙ্গে ভাব করিয়া যাইতেছে, সেবার জন্য মাধবীলতাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে?

বিপিন আসে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে, আর মহেশ চৌধুরীর

ভক্তদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখে। কয়েক দিন পরে মহেশ চৌধুরীর আশীর্বাদ-প্রার্থীদের সংখ্যা কমিয়া যাইতে থাকে, বিপিনের উৎসাহেও যেন ভাঁটা পড়িয়া যায়। প্রতিদিন আর তাকে বাগবাদায় দেখা যায় না। আসিলেও মহেশের কাছে সে বেশীক্ষণ বসে না।

মহেশ ব্যাকুলভাবে মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করে—বিপিনবাবু যে আর আসেন না মা?

মাধবীলতা বলে—কাজের মানুষ, নানা হাঙ্গামায় আছেন, সময় পান না।

—বড় ভাল লোক। কি বুদ্ধি, কি কর্মশক্তি, কি তেজ, কি উৎসাহ—সবরকম গুণ আছে ভদ্রলোকের। এমন একটা মানুষের মত মানুষ, জানো মা, আমি আর দেখি নি।

বিপিনের এরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া মাধবীলতা হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। বুদ্ধি হয়তো আছে, কিন্তু বুদ্ধি থাকিলেই কি লোক ভাল হয় নাকি? ওই স্তিমিত নিস্তেজ মানুষটার কর্মশক্তি, তেজ আর উৎসাহ!—যার মুখের চিরস্থায়ী বিষাদের ছাপ সংক্রামিত হইয়া মানুষের মনে বৈরাগ্য জাগে?

এখানে মাধবীলতার ভাল লাগে না। মহেশ যে কদিন দক্ষিণের ভিটার ঘরটিতে দেড়শো বছরের পুরানো খাটে শুইয়া জ্বরের ঘোরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে থাকিয়া থাকিয়া বলিত—ওরা আমার কাছে আসছে কেন? প্রভুর কাছে পাঠিয়ে দাও ওদের—সে কদিন সেবার হাঙ্গামায় একরকম কাটিয়া গিয়াছিল, মহেশ সুস্থ হইয়া উঠিবার পর মাধবীলতার সব একঘেয়ে লাগে। গ্রামের মেয়েরা দু-চারজন করিয়া সকলেই প্রায় মাধবীলতাকে দেখিয়া গিয়াছে। পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু এদের মাধবীলতার ভাল লাগে না। তাই নিজেও সে এদের কাউকে কাছে টানিবার চেষ্টা করে নাই, নিজে হইতে তার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া ভাব জমাইবার ভরসাও এদের হয় নাই। বেড়াইতে আসিয়া অভদ্র বিস্ময়ের সঙ্গে এরা মাধবীলতাকে শুধু দেখিয়াই যায়। আশ্রমবাসিনী কুমারী সন্ন্যাসিনী ( বয়স কত

হইয়াছে ভগবান জানেন ) সাধারণ বেশে আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে বাস করিতেছে, গাঁয়ের মেয়েদের কাছে সে কতকটা স্বর্গচ্যুতা অপ্সরী কিন্নরীর মত রহস্যময়ী জীব।

এখানে মানুষ নাই, বৈচিত্র্য নাই। স্নেহমমতা আদরযত্ন আছে, বিভূতির মা মেয়ের মতই মাধবীলতাকে আপন করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কেবল মেয়ের মত সব সময় একজনের আপন হইতে কি মানুষের ভাল লাগে? আশ্রমের জীবনের পর কেমন নীরস একঘেয়ে মনে হয়। আশ্রম নির্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জনতা; আশ্রমের নিয়মে বাঁধা জীবন শান্ত, কিন্তু সে নিয়মও অসাধারণ, সে শান্তিও অসামান্য। কি যেন ঘটিবার অপেক্ষায় গাছ-পালায় ঘেরা আশ্রমের ছোট ছোট কুটীরগুলিতে প্রতিমুহূর্তে উন্মুখ হইয়া থাকা যায়—মনে হয়, এই বুঝি আশ্রমের গাম্ভীর্যপূর্ণ শান্তভাব চুরমার করিয়া প্রচণ্ড একটা অবরুদ্ধ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে, এমন একটা কাণ্ড ঘটিবে যা দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া হাত-তালি দিয়া নাচা যায়। এখানে কোনদিন কোন কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বিপিনকে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে—উনি কি বললেন?

—কিছু বলেন নি।

—কিছুই না? একেবারে কিছু না?

বিপিন মাথা নাড়িয়া বলে—কি বলবে? বলবার ক্ষমতা থাকলে তো বলবে। কি কুক্ষণে যে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল মাধু।

মাধবী ভয় ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকে। তার জন্য বিপিন আর সদানন্দের মনান্তর হইয়া গেল? জানালা দিয়া গ্রামের পথ দেখা যায়, বর্ষায় একেবারে শেষ করিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও ভালরকম মেরামত হয় নাই। পথের ধারে অবনী সমাদ্দারের বাড়ীর সামনে একটি গরু বাঁধা আছে। রোজই বাঁধা থাকে, ঘাসপাতা খায় আর কয়েকদিনের বাছুরটির গা চাটে। আজ বাছুরটি যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য না? মাধবীলতা যেদিন যে-সময় কথা পাড়িল

সে চলিয়া আসায় সদানন্দের কি অবস্থা হইয়াছে, সেইদিন সেই সময় বাছুরটি উধাও হইয়া গিয়া গাভীটিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে!

—আশ্রমের কিসে উন্নতি হবে সে চিন্তা ওর নেই, দিনরাত নিজের কথাই ভাবছে। আমার এটা হল না, আমার ওটা হল না, আমার এটা চাই, আমার ওটা চাই। ওকে নিয়ে সত্যি মুস্কিলে পড়েছি মাধু।

—কেন—উনি বেশ লোক।

মাধবীলতার মুখে একথা শুনিয়া বিপিন 'প্রায় চমকাইয়া যায়। নৌকায় উঠিবার আগে রাগের মাথায় সদানন্দের কুটীরের দিকে পা বাড়াইয়া, স্টেজে সরলা কোমলা বনবালার অভিনয় করিয়া করিয়া হয়রান হইয়া গরম মেজাজে সাজঘরে ফিরিয়া আসা বেশ্যার মত ফুঁসিতে ফুঁসিতে মাধবীলতা যেসব কথা বলিয়াছিল বিপিন তার একটি শব্দও ভোলে নাই। জ্যোৎস্নালোকে দেখা মুখভঙ্গিও ভোলে নাই মাধবীলতার। সদানন্দের অত্যাচার মেয়েটার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তার চোখের আড়ালে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিবার সুযোগ সদানন্দ পাইয়াছে ভাবিয়া সে রাগের চেয়ে অনুতাপের জ্বালাতেই জ্বলিয়াছিল বেশী। সে বিপিন, আশ্রমের কোথায় মাটির নিচে কোন চারার বীজ হইতে অঙ্কুর মাথা তুলিতেছে এ খবর পর্যন্ত যে রাখে, তাকে ফাঁকি দিয়া সদানন্দ এত কষ্ট দিয়াছে মাধবীলতাকে! কি হইয়াছিল তার? আগেই কেন সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে নাই? কেন আশ্রমকে চুলায় যাইবার অনুমতি দিয়া নিজে গা এলাইয়া দিয়াছিল অসহায় শিশুর মত?

সদানন্দের কুটীরের সামনে একটা কদমগাছের নিচে মহেশ চৌধুরীর মহাযুদ্ধ এবং মাধবীলতার মধ্যস্থতায় সে যুদ্ধের সমাপ্তির পর কয়েকটা দিন যেভাবে কাটিয়াছিল ভাবিলে বিপিনের এখন লজ্জা করে। শরীরটা একটু দুর্বল ছিল কিন্তু দাঁতের ব্যথা ছিল না। স্নায়ু ভোঁতা হইয়া থাকা উচিত ছিল বিপিনের, শ্রান্ত অবসন্ন দেহে দু-তিন দিন পড়িয়া পড়িয়া ঘুমানোই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তার

বদলে কি তীব্র মানসিক যন্ত্রণাই সে ভোগ করিয়াছে। বার বার কেবলি তার মনে হইয়াছে সে কি ভুল করিয়াছে ছলে বলে কৌশলে দিগন্তের কোল হইতে তার আদর্শের সকলতাকে আশ্রমের এই মাটিতে টানিয়া আনিবার সাধনা কি তার ভ্রান্তি-বিলাস মাত্র! এভাবে কি বড় কিছু মানুষ করিতে পারে না! নিজের জন্য সে কিছু চায় না, এইটুকুই কি তার নৈতিক শক্তিকে অব্যাহত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ন্যায় অন্যায়ের বিচারের চেয়ে কার্যসিদ্ধিকে বড় ধরিয়া লইয়াছে বলিয়াই কি তার এত চেষ্টা আর আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মনে মনে নিজের দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের হিসাব করিয়া বিপিন বড় দমিয়া গিয়াছে। কতটুকু লাভ হইয়াছে, কতটুকু সার্থকতা আসিয়াছে। কোনদিকে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। আশ্রম বড় হইয়াছে, আশ্রমের সম্পত্তিও বাড়িয়াছে, লোকজনও বাড়িয়াছে, কিন্তু উন্নতি হয় নাই। ভাল উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা আর ফন্দিবাজিকে সে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, সে-সব একান্তভাবে তার নিজস্ব গোপন পরিকল্পনার অঙ্গ, আশ্রমের জীবনে কেন সে সমস্তের প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া ওঠে। আর এদিকে মহেশ চৌধুরী, সরল নিরীহ বুদ্ধিহীন ভালমানুষ মহেশ চৌধুরী, না চাহিয়া সে সকলের হৃদয় জয় করিয়াছে, না জানিয়া নিজের দুঃখময় ব্যর্থ জীবনকে পর্যন্ত সার্থকতায় ভরিয়া তুলিয়াছে। কি এমন মহাপুরুষ মহেশ চৌধুরী যে তার পাগলামী পর্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। আর কি এমন অপরাধ বিপিন করিয়াছে যে, সকলে তাকে কেবল ফাঁকিই দেয়, সদানন্দ হইতে মাধবীলতা পর্যন্ত। এইসব ভাবিতে ভাবিতে বিপিন মড়ার মত বিছানায় পড়িয়া থাকিয়াছে—অন্য মানুষ সে অবস্থায় ছটফট করে। সেই সময়েই বিপিন ভাবিয়া রাখিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর সঙ্গে ভাব করিয়া লোকটাকে একটু ভালভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তবে বিশেষ উৎসাহ তার ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে মহেশ চৌধুরীকে কাজে লাগাইবার পরিকল্পনা মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আর আশ্রমের পরিসর বাড়ানো সম্ভব নয়, সম্প্রতি যে আশ-

বাগানটা পাওয়া গিয়াছে তাই লইয়াই আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সুতরাং রাজাসাহেবের ভয়ে মহেশ চৌধুরীকে এড়াইয়া চলিবার আর তো কোন কারণ নাই। আশ্রমে অর্থ সাহায্য করাও রাজাসাহেব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিছুদিন আর পাওয়া যাইবে না। ভবিষ্যতে আবার যদি রাজাসাহেবের কাছে কিছু আদায় করা সম্ভব মনে হয়, তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।

এদিকে, যাদের চাষাভূষো মানুষ বলে, জনসাধারণ নামে আশ্রমকে যারা ঘিরিয়া আছে গ্রাম আর পল্লীতে, তাদের সঙ্গে আশ্রমের একটু যোগাযোগ ঘটানো দরকার। ওদের বাদ দিয়া কোন প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ওদের সঙ্গে এখন যে সংযোগ আছে আশ্রমের, সে না থাকারই মত। কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের নরনারী আশ্রমে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে এবং সদানন্দকে প্রণাম করিতে আসে, প্রণামান্তে কিছু প্রণামীও দিয়া যায়—কিন্তু সে আর কজন মানুষ, সে প্রণামী আর কত! তিন দিনের পথ হাঁটাইয়া অনেক দূরের গ্রাম হইতে মানুষকে যদি আশ্রমে টানিয়া আনিতে হয় আর এক একদিনের প্রণামীর পরিমাণ দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে দেশের সর্বত্র আশ্রমের শাখা খুলিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দেওয়া সম্ভব করিতে হয়, তাহা হইলে অন্য কিছু করা চাই, কেবল সদানন্দকে দিয়া কাজ চলিবে না।

মহেশ চৌধুরীকে এরা পছন্দ করে—এইসব সাধারণ মানুষগুলি। মানুষটাও ভাল মহেশ চৌধুরী। শিশুর মত সরল।

কয়েকদিন আসা-যাওয়া মেলা-মেশা করিয়া বিপিন কিন্তু একটু ভড়কাইয়া গেল। মহেশ চৌধুরীর আসল রূপটা সে আর খুঁজিয়া পায় না। ভালমানুষ, শিশুর মত সরল, কিন্তু জোর কই। আশ্রমের কদমতলায় তার যে মনের জোরের পরিচয় বিপিনকে পর্যন্ত কাবু করিয়া কয়েকদিন আনমনা করিয়া রাখিয়াছিল। ছেলের কথা বলে, ঘরের কথা বলে, নিজের কথা বলে আর এই সব কথার মধ্যে ফোড়ন দেয় ভগবানের কথার—শান্তি চাই মহেশের, শান্তি! অনেক দুঃখ

পাইয়াছে মহেশ, সে জন্য কোন দুঃখ নাই, এবার একটু শান্তি না পাইলে যে শেষ জীবনটাও মন দিয়া ভগবানকে ডাকা হয় না মহেশের!

—ভগবানকে ডাকবার জন্য আমরা আশ্রম করি না।

মহেশ চৌধুরী কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলে—এখনও আমার সঙ্গে ছলনা করবেন বিপিনবাবু? ভগবানকে ডাকার জন্য ছাড়া আশ্রম হয়? তবে ভগবানকে ডাকার সুবিধের জন্যে অন্য কিছু যদি করেন—সে সবও ভগবানকে ডাকারই অঙ্গ।

—আপনি তো প্রভুর বাণী শোনেন?

—শুনি বৈকি।

—উনি কি কোনদিন বলেছেন, আশ্রমে যারা আছেন তাদের কাজ হল ভগবানকে ডাকা?

—বলেন বৈকি—সব সময়েই বলেন। আমরা সবাই পাপী তো বিপিনবাবু?—প্রশ্ন শুনিয়া বিপিন গুম খাইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী সায় না পাইয়াও বলে—মহাপাপী আমরা। আমাদের কি ক্ষমতা আছে নিজে থেকে ভগবানকে ডাকবার? তাই যদি পারতাম বিপিনবাবু, মনে আমার এমন অশান্তি কেন—সকলের মনে অশান্তি কেন! প্রভু আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন কি করলে ভগবানকে ডাকবার ক্ষমতা হয়, কি করলে আমরা ভগবানকে ডাকতে পারি। কাণ্ডারী একমাত্র ভগবান, কিন্তু গুরুদেবের চরণতরীই ভরসা।—তর্কের কথা নয়, তর্ক বিপিন করে না, কথায় কথা তুলিয়া মানুষটাকে বুঝিবার চেষ্টা করে। অন্য সব দিক দিয়া সে হতাশ হইয়া যায়, একটিমাত্র ভরসা থাকে মহেশের নিজের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা। নিজে যা জানিয়াছে তার বেশী কিছু জানিতে বা বুঝিতে চায় না, সদানন্দের কথা হোক, শাস্ত্রের বাক্য হোক, তার নিজের ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা। এদিক দিয়া মহেশ ভাঙ্গিবে কিন্তু মচকাইবে না।

এ রকম মানুষ দিয়া বিপিনের কাজ চলিবে কি?

—আচ্ছা প্রভু যদি আপনাকে কোন অন্যায় আদেশ দেন, সে আদেশ আপনি পালন করবেন?

—প্রভু অন্যায় আদেশ দিতে পারেন না।

—মনে করুন দিলেন—

—ও রকম ছেলেমানুষী অসম্ভব কথা মনে করে কি লাভ হবে বলুন?

বিপিনের ধৈর্য অসীম।

—ওঁর আদেশ অন্যায় আমি তা বলছি না। ধরুন, উনি ঠিক মত আদেশই দিয়েছেন, আপনার মনে হল আদেশটা সঙ্গত নয়; তখন আপনি কি করবেন?

মহেশ নিশ্চিন্তভাবে বলে—আদেশ অন্যায় বলে ওঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব।

—আদেশটা পালন করবেন তো?

—উনি যদি আমার মনের ধাঁধা মিটিয়ে দিয়ে আদেশ পালন করতে বলেন, তবে নিশ্চয় করব।

—আর যদি মনের ধাঁধা না মিটিয়ে শুধু আদেশ পালন করতে বলেন?

মহেশ হাসিয়া বলে—যান মশায়, আপনার আজ মাথার ঠিক নেই। ওরকম উনি কখনো বলতে পারেন?

—যদি বলেন?

—আপনি আবার সেই অসম্ভব কল্পনার মধ্যে যাচ্ছেন।

বিপিনের ধৈর্য সত্যই অসীম।

—বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যদি বলেন? এতদিন আপনাকে সেরকম পরীক্ষা করছিলেন না, এই রকম কোন পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আপনাকে অন্যায় আদেশ পালন করতে বলেন?

—পরীক্ষার জন্য? আরও পরীক্ষা করবেন?—মহেশের মুখ চোখের পলকে শুকাইয়া যায়। ভীত সন্ত্রস্ত শিশুর মত অসহায় চোখ মেলিয়া সে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। সদানন্দের পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। কি ফেল করিয়াছে আজও মহেশ চৌধুরী ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই, শুধু জানিয়াছে যে সদানন্দ

তাকে অনুগ্রহ করিয়াছে, জানিয়া এই সৌভাগ্যেই সর্বদা ডগমগ হইয়া আছে। পরীক্ষার কথা মনে হইলেই তার মুখ শুকাইয়া যায়।

বিপিনের পিছনে বিভূতির মা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল। দুধের বাটি হাতে করিয়া আসিয়াছে। দুধটা বেশী গরম ছিল, এমনিভাবে ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকাতেও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইতে কোন বাধা হইতেছে না তাই এতক্ষণ দুজনের অপরূপ আলাপে বাধা দেয় নাই। এবার বলিল—বিপিনবাবু, ওঁর সঙ্গে আপনি কথায় পারবেন না। গুরুদেবের সমস্ত আদেশ উনি চোখ কান বুজে মেনে চলবেন—ভাববেন না।

তবু বিপিনের ভাবনার শেষ হয় না। এমন সমস্যায় সে আর কখনও পড়ে নাই। একটা মানুষকে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত ঠিক করিয়া ফেলিতে যে এত ভাবিতে হয় বিপিনের সে ধারণা ছিল না। আশ্রমে যদি স্থান দেওয়া হয় মহেশকে, কাজে কি তার লাগিবে মহেশ?

মাধবীলতাকে পর্যন্ত অন্যমনে এক সময় সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে—মহেশবাবু লোক কেমন মাধু?

মাধবীলতা সংক্ষেপে বলে—ভাল নয়।

সদানন্দকে মাধবীলতা ভাল লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল মনে পড়াতেও বিপিনের হাসি আসিল না। মাধবীলতা অন্য মানদণ্ড দিয়া বিচার করিতেছে—ভাল শব্দটারও অনেক রকম মানে আছে।

গম্ভীরমুখে সে জিজ্ঞাসা করে—আশ্রমে ফিরে যাবে মাধু?

—যাব।

—কি করবে আশ্রমে গিয়ে?

এ প্রশ্নের জবাব মাধবীলতা দিতে পারিল না।

বিপিন ভাবিতেছিল, মাধবীলতাকে প্রথমে আশ্রমে ফিরাইয়া আনিবে, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশকেও আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে বলিবে কিনা ঠিক করিবে। ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটিতে লাগিল। সদানন্দের নাগালের মধ্যে আবার মাধবীলতাকে আনিয়া ফেলিতে বিপিন আর সময়ই পায় না। নিজেই সে বুঝিতে পারে না মাধবীলতাকে ফিরাইয়া আনিবে ঠিক করিয়াও মহেশের ওখানে মেয়েটাকে কেন ফেলিয়া রাখিয়াছে। এবার অবশ্য সে মাধবীলতার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিবে, নিজেও সতর্ক থাকিবে, তবু যেন ভয় হয়।

সদানন্দ বড় ভয়ানক মানুষ। ( বিপিনের মতে )

সদানন্দের মানুষ বশ করার যে ক্ষমতাকে অসামান্য গুণ মনে করিয়া বিপিন এতদিন আশ্রমের কাজে লাগাইয়াছে, আজ সেই ক্ষমতাকে অনিষ্টকর ভয়ানক কিছু বলিয়া গণ্য করিতে বিপিনের দ্বিধা হয় না। বিজ্ঞানের সুবিধাভোগীরা যে ভাবে বিজ্ঞানকে অভিশাপ দেয়, সদানন্দকেও বিপিন আজকাল তেমনি ভাবে কাজ ফুরানো পাজীর দলে ফেলিয়াছে। কেবল মাধবীলতার জন্য এ বিরাগ নয়, সদানন্দের কাজ প্রকৃতপক্ষে ফুরায় নাই, মনে হইয়াছিল সদানন্দকে বাদ দিয়াও আশ্রম চালানো যাইবে কিন্তু কল্পনাটা কার্যে পরিণত করিবার নামেই নানারকম আশঙ্কা মনে জাগায় আপনা হইতেই বিপিন টের পাইয়াছে যে সদানন্দকে সে বিদায় দিতে চায় বটে কিন্তু এখনও সেটা সম্ভব নয়।

যে কোন বুদ্ধিমান উৎসাহী লোক সদানন্দকে সামনে দাঁড় করাইয়া এরকম একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিতে পারিবে—সদানন্দকে বিদায় করার পক্ষে এই এখন সব চেয়ে বড় বাধা। সদানন্দ শুধু চলিয়া গেলে আরও বেশী কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া আশ্রমকে সে চালাইয়া নিতে পারিবে, কিন্তু প্রতিহিংসার উদ্দেশ্যে সদানন্দ,

প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলে পারিবে না। হয়তো পারিবে, কোন বিষয়েই নিজেকে বিপিন অক্ষম ভাবিতে পারিবে না, কিন্তু সাধ করিয়া সে হাঙ্গামা টানিয়া আনিবার সাহস বিপিনের নাই।

বিপিনের সাহস কি কম? বিপিন কী ভীরু?

মাধবীলতা তাই বলে। বলে—বিপিনবাবু? উনি অপদার্থ ভীরু কাপুরুষ—

বলে মহেশকে। প্রাণ খুলিয়া বিপিনের নিন্দা করিতে পারে। মহেশ চৌধুরীর উপর বিরক্তিটা তার এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, লোকটাকে দেখিলেই গায়ে যেন আজকাল তার জ্বর আসে। কিছুদিন আগে মাধবীলতা বিপিনকে বলিয়াছিল, মহেশ চৌধুরী লোক ভাল নয়। তখন বিপিনের সাহচর্য সে সহ্য করিতে পারিত না। আজকাল মহেশ চৌধুরীর একসুরে বাঁধা মনোবীণার একঘেয়ে ঝঙ্কার-গুলি একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তোলায় বিপিনের মধ্যেও হঠাৎ সে কিছু কিছু বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। বিপিনের কাছে আর তাই মহেশ চৌধুরীর সম্বন্ধে কোনরকম মন্তব্য করে না, মহেশ চৌধুরীর কাছে বিপিনকে বিশেষণের পর বিশেষণে অভিনন্দিত করিয়া চলে—চালবাজ, মিথ্যুক, লোভী, অসংযত প্রভৃতি কত সংজ্ঞাই যে বিপিনকে সে দেয়।

বিপিনের প্রশংসায় মহেশ কিন্তু পঞ্চমুখ। কারও সম্বন্ধে মহেশ কখনও কোন কারণেই মত বদলায় না—অন্ততঃ স্বীকার করে না যে নিন্দা প্রশংসায় কারও সম্বন্ধে তার ধারণার কিছুমাত্র পরিবর্তন হইয়াছে। নিন্দা সে জগতে কারও করে না, একবার যার যে গুণগান করিয়াছে চিরকাল সমান উৎসাহের সঙ্গে তার সেই গুণ-কীর্তনই করিয়া যায়।

মাধবীলতার মুখে বিপিনের বিশেষণগুলি শুনিয়া সে একে একে বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিতে বসে যে, মাধবীলতা ভুল করিয়াছে, ওসব বিশেষণ বিপিনের প্রতি প্রয়োগ করা চলে না। বিপিন মহান্, উদার, আত্মত্যাগী মহাপুরুষ,—চাল বিপিনের নাই, মিথ্যা সে কখনও

বলে না, লোভী সে নয়, সংযমের তার তুলনা নাই। বিপিনের ভীরুতার অপবাদটিরও মহেশ প্রতিবাদ করে।

মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলে—বিপিনবাবু ভীরু কাপুরুষ? কি যে তুমি বলো মা! ওঁর মত বুকের পাটা কটা মানুষের থাকে?

মাধবীলতা রাগিয়া বলে—কি যে দেখেছেন আপনি বিপিনবাবুর মধ্যে! উনি যদি ভীরু কাপুরুষ নন, কে তবে ভীরু কাপুরুষ? শুনুন বলি তবে। আশ্রমের ক্ষতি করবেন ভয়ে আপনাকে উনি আশ্রমে নিতে ভরসা পাচ্ছেন না।

রাগের মাথায় ভিতরের মস্ত বড় কথা যেন ফাঁস করিয়া দিয়াছে এমনি গর্বভরা অনুতাপের ভঙ্গিতে মাধবীলতা একদৃষ্টে মহেশ চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মহেশ চৌধুরী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যায়। মনে হয়, ভিতরের আসল কথাটা জানিতে পারিয়া বুঝি চটিয়াই গিয়াছে! কিন্তু কথা শুনিয়া বুঝা যায় এত সহজে খেইহারা হইবার মানুষ সে নয়।

—ভয় তো বিপিনবাবুর মিথ্যে নয় মা! আমাকে আশ্রমে ঠাঁই দিলে আশ্রমের ক্ষতির আশঙ্কা আছে বৈকি! আমি হলাম মহাপাপী, আমার সংস্পর্শে—

বিপিনের ভীরুতার প্রমাণটি ফাঁসিয়া যায়। চালের উপরেই বিপিন চলে এ ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে কিন্তু উদাহরণ দাখিল করিতে গিয়া বিপিনের চালবাজির একটি দৃষ্টান্তের কথাও মাধবীলতা আগে এতদিন অনেক চেষ্টাতেও মনে করিতে পারে নাই। বিপিনের ভীরুতার কয়েকটি জোরালো দৃষ্টান্ত আজ সে কোনরকমেই স্মরণ করিতে পারে না। বিপিন ভীরু সন্দেহ নাই, কিন্তু কবে কোথায় সে ভীরুতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে?

ভাবিতে গেলে সত্যই বড় বিস্ময় বোধ হয়। বিপিনের কি তবে দোষ বলিয়া কিছুই নাই? অভাব কেবল তার গুণের? সদ্‌গুণ একেবারে নাই বলিয়াই লোকটার চালচলন এমন নিন্দনীয় মনে হয়? সংসারে মানুষ হয় ভালমন্দ মেশানো, কারও মধ্যে ভাল থাকে বেশী

কারও মধ্যে কম, কিন্তু বিপিনের মধ্যে ভালর নামগন্ধও নাই। তাই কি বিপিনকে মনে হয় খারাপ লোক, যদিও তার মধ্যে মন্দের ভাগটাও খুঁজিয়া মেলে না। কথাটা যেন দাঁড়াইয়া যায় ধাঁধাঁয়—ভালও নাই মন্দও নাই, কি তবে আছে বিপিনের মধ্যে? কিসের মাপকাঠিতে মানুষ তাকে মানুষ হিসাবে বিচার করিবে? তাকে কি ধরিয়া নিতে হইবে নিন্দা প্রশংসার অতীত মহামানব বলিয়া?

বিপিন মহামানব! ভাবিলেও মাধবীলতার হাসি আসে। কিন্তু ধারণা দিয়া—আপনা হইতে মনের মধ্যে যে সব ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে সেই ধারণাগুলি দিয়া—বিপিনের বিচার না করিলে, বিপিনের দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে ওজন করিতে বলিলে, বিপিন সত্যই পরিণত হয় মহামানবে।

নিজের সমস্যাগুলি নিয়া অত্যন্ত বিব্রতভাবে বিপিনের দিন কাটিতেছে, মাধবীলতার খবর নেওয়ার সময়ও বিশেষ পাইতেছে না, এমন সময় বিভূতি একদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিল। মহেশের অসুখ উপলক্ষ্যে তাকে বাড়ী ফিরিতে দেওয়া হইয়াছে। না বলিয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে পারিবে না, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বাড়ীতে থাকিবে।

ছেলের চেহারা দেখিয়া বিভূতির মা কাঁদিয়াই আকুল। মহেশ বলিল—কাঁদছ কেন? পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

বিভূতি বলিল—ক্ষিদে পেয়েছে মা, খেতে দাও। খালি খেতে দাও, দিনরাত শুধু খেতে দাও, আর কিছু নয়।

পরদিন ভোরবেলা মহেশ ছেলেকে নিয়া সদানন্দের চরণ বন্দনা করিতে বাহির হইল। চরণ বন্দনার উদ্দেশ্যে আশ্রমে যাইতেছে একথা অবশ্য বিভূতিকে জানাইল না, শুধু বলিল—আমাদের একবার আশ্রম থেকে ঘুরিয়ে আনবি চল্‌তো।

—কি হবে আশ্রমে গিয়ে? এ্যাদ্দিন পরে এলাম, গাঁয়ের সকলের সঙ্গে দেখা-টেকা করি?

—পরে দেখা করিস। আগে আশ্রম থেকে ঘুরে আসবি চল।

কিন্তু বিভূতির কাছে আশ্রমের কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। গ্রামের চেনা মানুষগুলির সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই মনটা তার ছটফট করিতেছিল। তার আসিবার খবরটা সে আসিয়া পৌঁছিবার অনেক আগেই গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, তবু কাল কেউ তাকে দেখিতে আসে নাই বলিয়া বিভূতি একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। তার সংস্পর্শে আসিতে কয়েকজনের ভয় হওয়া সম্ভব, অন্ততঃ ভয় ভাঙ্গিতে কিছুদিন সময় লাগিবে, কিন্তু চোর্য়া গাইয়ের সঙ্গে কপিলা গাইয়ের বাঁধা পড়িবার আতঙ্কটা কি সকলের মধ্যেই এত বেশী প্রচণ্ড যে একজন তার খবর নিতেও আসিল না?

না আসুক, বিভূতি নিজেই সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া ভয় ভাঙ্গাইয়া দিয়া আসিবে। আশ্রমে যাওয়ার প্রস্তাবে সে তাই ইতস্তত করিতে থাকে।

আশ্রমে যাওয়ার নামে মাধবীলতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলে—তাই চলুন, আশ্রম দেখে আসবেন।

বিভূতি হাসিয়া বলে—আশ্রম দেখা কি আর আমার বাকী আছে, ঢের দেখেছি।

—সে আশ্রম আর নেই, কত পরিবর্তন হয়েছে দেখে অবাক হয়ে যাবেন।

বিভূতির জেলে যাওয়ার আগে সদানন্দের আশ্রম কেমন ছিল এবং তারপর আশ্রমের কি পরিবর্তন হইয়াছে মাধবীলতার জানিবার কথা নয়, এটা তার শোনা কথা। মাধবীলতার উৎসাহ দেখিয়া বিভূতি আর আপত্তি করিল না, তিনজনে আশ্রমের দিকে রওনা হইয়া গেল—মহেশ, মাধবীলতা আর বিভূতি। বিভূতির মা গেল না, বলিল—আশ্রম মাথায় থাক, তোমরা ঘুরে এসো।

বাড়ীর সামনে কাঁচা পথ ধরিয়া তিনজনে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে, শশধর আসিয়া জুটিল। আশ্রমে যাওয়ার একটা সুযোগও শশধর ত্যাগ করে না।

মহেশ মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁটতে পারবে তো মা ?

মাধবীলতা হাসিয়া বলিল—আমাকে জিজ্ঞেস না করে বরং আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।

মহেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দুর্গা, দুর্গা। সত্যি ওর চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

আশ্রমে পৌছিয়া প্রথমেই দেখা হইয়া গেল রত্নাবলীর সঙ্গে। মাধবীলতাকে দেখিয়া সে একগাল হাসিয়া বলিল—বেঁচে আছিস ?

মহেশ তাকে জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছ মা ?

কাছেই একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল, কদিন আগে গাছটা কাটা হইয়াছে। বিভূতি গুঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া সে আর নড়িবে না।

মাধবীলতা বলিল—কাঠপিঁপড়ে হুল ফুটিয়ে দেবে কিন্তু।

বিভূতি বলিল—দিক, গোখরো সাপ কামড়ালেও এখন আমি নড়ছি না।

তখন সেইখানে কাঠের গুঁড়িতে বসিয়া সকলে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। শীতের সকালের প্রথম মিষ্টি রোদ আসিয়া পড়িতে লাগিল সকলের গায়ে। আরামে এমন জমিয়া উঠিল আলাপ যে মনে হইতে লাগিল, সদানন্দের চরণ বন্দনার কথাটা মহেশও ভুলিয়া গিয়াছে! কিছুক্ষণ পরে কুটীর হইতে বাহির হইয়া তাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার সময় স্বয়ং সদানন্দকেও কেউ দেখিতে পাইল না। খেয়াল হইল সদানন্দ যখন সামনে আসিয়া রোদ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে প্রণাম করিল মহেশ, তারপর মামার অনুকরণে শশধর। রত্নাবলী প্রণাম করায় মাধবীলতাও টিপ্ করিয়া একটা প্রণাম ঠুকিয়া দিল।

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছ মাধু ?

মাধবী বলিল—ভালই আছি।

মহেশ বিভূতিকে বলিল—এঁকে প্রণাম কর।

আগের কথা সদানন্দের মনে ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল—থাক্, থাক্।

মহেশ জোর দিয়া আবার বলিল—প্রণাম কর বিভূতি, এঁর আশীর্বাদে তুমি ছাড়া পেয়েছ।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিভূতি উঠে নাই। বসিয়া থাকিয়াই সে দুহাত একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—নমস্কার, ভাল আছেন? অনেকদিন পরে দেখা হল। আপনার আশীর্বাদ গবর্ণমেণ্টকেও টলিয়ে দিতে পারে তা তো জানতাম না!

সদানন্দ শান্তভাবে বলিল—আমার বলে নয়, আশীর্বাদ আন্তরিক হলে ভগবানকে পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে বাবা।

বিভূতি আরও বেশী শান্তভাবে বলিল—ভগবানের কথা বাদ দিন, তিনি তো সব সময়েই টলছেন মাতালের মত। টাল সামলাতে প্রাণ বেরোচ্ছে আমাদের।

মাধবীলতা চোখ বড় বড় করিয়া বিভূতির দিকে চাহিয়া থাকে। রত্নাবলীর সাদা দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করে। অস্থির হইয়া ওঠে মহেশ। কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়াই যেন প্রথম দিকে ব্যাকুলভাবে শুধু বলিয়া চলে 'আহা', 'ওকি' আর 'ছি ছি'। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া সোজা আর শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া, গম্ভীরকণ্ঠে ডাকে—বিভূতি!

বসা অবস্থাতেই সোজা আর শক্ত হইয়া বিভূতি বলে—কেন?

—পায়ে হাত দিয়ে এঁকে প্রণাম কর, নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও।

—এঁকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না বাবা। ক্ষমা চাওয়ার মত অন্যায় কথা কিছু বলি নি।

—এঁকে আমি দেবতা মনে করে পূজা করি, আমার ছেলে তুই, এঁকে তোর প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না? যা মনে এল বলে বসলি মুখের ওপর, তবু তোর অন্যায় কথা বলা হল না?

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

—করবি না প্রণাম?

—না।

এবার প্রশান্তকণ্ঠে সদানন্দ বলিল—মহেশ, কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করে দিলে তুমি?

—ছেলেমানুষী প্রভু?

—তুমি কি ভাব ওর প্রণাম পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি?

—তা ভাবি নি প্রভু। ও প্রণাম করুক না করুক আপনার তাতে কি আসবে যাবে—সর্বনাশ হবে ওর নিজের। ও যে আমার সন্তান প্রভু?

সদানন্দ অভয় দিয়া বলিল—ভয় নেই, ওর কিছু হবে না। প্রণাম নিয়ে আমি আশীর্বাদ বিক্রী করি না মহেশ, আশীর্বাদ করাটা আমার ব্যবসা নয়, ভুলে যাও কেন? ছেলেমানুষের কথায় যদি আমি রাগ করি, আমি যে ওর চেয়েও ছেলেমানুষ হয়ে যাব।

মহেশ ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিল—তা কি জানি না প্রভু? আপনি দেবতা, আপনার কি রাগদ্বেষ আছে? কিন্তু আপনাকে প্রণাম না করলে ওর অকল্যাণ হবে।

—অনিচ্ছায় প্রণাম করার চেয়ে না করাই ভাল, মহেশ।

—না প্রভু। প্রণম্যকে প্রণাম করতেই হয়। প্রণাম করতে করতে মনে ভক্তি আসে।—বিভূতি, প্রণাম কর এঁকে।

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

মহেশ আবার বলিল—বিভূতি প্রণাম কর। এই দণ্ডে যদি প্রণাম না কর এঁকে, আমি যেমন আছি তেমনিভাবে যে দিকে দু চোখ যায় চলে যাব, কোনদিন আর ফিরব না।

বিভূতি শুকনো মুখে কোন রকমে বলিল—আমি পারব না বাবা!

মাধবীলতার সব কথাতেই ফোড়ন দেওয়া চাই। পিতার আদেশ আর মিনতি যেখানে ব্যর্থ হইয়া গেল, যে দিকে দু চোখ যায় চলিয়া যাওয়ার ভয় প্রদর্শন পর্যন্ত কাজে লাগিল না, সেখানে কাতরকণ্ঠে

বিভূতিকে অনুরোধ না জানাইয়া সে পারিল না—আহা, এমন করে বলছেন সবাই, করুন না প্রণাম একবারটি ?

এমন সময় আসিল বিপিন।

কারও দিকে বিপিন চাহিয়াও দেখিল না। সোজাসুজি মাধবীলতার কৈফিয়ৎ দাবী করিয়া বলিল—আমায় না জানিয়ে আশ্রমে এলে যে মাধু ?

বিপিনের মুখ দেখিয়া আর গলার আওয়াজ শুনিয়া মাধবীলতার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। মহেশ বলিল—আমি ওকে এনেছি বিপিনবাবু।

বিপিন তীব্রস্বরে ধমক দিয়া বলিল—চুপ করুন, আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করি নি।

প্রকাশ্যভাবে কেউ কোনদিন বিপিনকে উঁচু গলায় কথা বলিতে শোনে নাই—বিশেষতঃ সদানন্দের সামনে।

সকাল বেলাই এমন একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইবে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। মনে মনে সকলেই একটা শঙ্কা-জড়িত অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। বিভূতি সদানন্দকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করায় যে খাপছাড়া কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, বিপিনের আবির্ভাবে এখনকার মত সেটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য ? মহেশ চৌধুরী ছাড়িবার পাত্র নয়। সে প্রকাশ্য-ভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে, বিভূতি সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম না করিলে যেদিকে দু চোখ যায় চলিয়া যাইবে। বিপিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেলেই সে আবার ছেলেকে নিয়া পড়িবে।

কিন্তু কি বোঝাপড়া হইবে বিপিনের সঙ্গে ? মহেশ চৌধুরী কি চুপ করিয়া থাকিবে বিপিনের ধমক সহ্য করিয়া ? ধমকটা সদানন্দ দিলে সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিত, সদানন্দ এমন প্রচণ্ড শব্দে ধমক দিলে এতটা খারাপ শোনাইত না। মহেশ চৌধুরীর মত ভক্তকে ধমক দিবার অধিকার সদানন্দের মত মহাপুরুষের থাকে এবং

আগেও অনেকবার অনেক ছুঁতায় মহেশ চৌধুরীকে সে অপমান করিয়াছে। সদানন্দের অপমান অনেকটা গা-সহা হইয়া আসিয়াছে মহেশ চৌধুরীর। কিন্তু বিপিনের অপমান সে সহ্য করিবে কেন? দুজনে যদি এখন কলহ বাধিয়া যায়!

মহেশ চৌধুরী কি বলে শুনিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরীর মুখ দেখিয়া বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। বিপিনের ধমকটা তার কানে গিয়াছে কি না—এ বিষয়েও যেন কেমন সন্দেহ জাগে! চাহিয়া সে থাকে মাধবীলতার মুখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য তার দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ ও অস্বাভাবিক মনে হয় যে, এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর তার একটা নূতন রূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনায় শশধর ও সদানন্দের কেমন ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরীর মুখ ধীরে ধীরে গম্ভীর হইয়া আসে। আকাশের দিকে একবার মুখ তুলিয়া উদাস কণ্ঠে সে বলে—মাধু আশ্রমে আসতে পাবে না হুকুম দিয়েছিলেন, আমি জানতাম না বিপিনবাবু!

মহেশ চৌধুরীর ভঙ্গিটাই মারাত্মক। তার উপর 'হুকুম' শব্দটা সকলের কানে যেন বিঁধিয়া যায়।

মাধবীলতার অপরাধ-ক্লিষ্ট মুখের ম্লানিমায় স্নায়বিক মূঢ়তার ভাবটাই এতক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছিল, তবে মহেশ চৌধুরী ছাড়া সেটা কেউ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছিল কিনা সন্দেহ। নিজের প্রয়োজনে কে আর ও-ভাবে তরুণী মেয়ের মুখ দেখিতে শেখে? সোজাসুজি ভীরুতা আর কোমলতার অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া নেওয়ায় কত ভাল লাগিতেছিল সকলের, কেমন দরদ সকলে বোধ করিতেছিল মেয়েটার জন্য! কিন্তু ওরকম বর্বরের মত মায়া করা মহেশ চৌধুরীর ধর্ম নয়, ওরকম সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা তার নাই। মানুষের এই স্বগত রসানন্দরূপী পিপাসা-সৃষ্টির আগ্রহ ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় অসংখ্য ছোট ছোট মুক্তির মধ্যে মহেশ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। মাধবীলতার ভীরু কোমল কাঁদ কাঁদ মুখখানা দেখিয়া মহেশ চৌধুরী ছাড়া আর কে বুঝিতে পারিত তার ভয় বা দুঃখ হয় নাই, আকস্মিক স্নায়বিক উত্তেজনায় সে একটু

দিশেহারা হইয়া গিয়াছে। খোঁচা দিয়া তার আত্মমর্যাদার জ্ঞান জাগাইয়া তুলিবার এবং তার অবরুদ্ধ তেজকে মুক্তি দিবার বুদ্ধি বা সাহস আর কার হইত? সোনালী রোদের মতই মাধবীলতার মুখে লালিমার আবির্ভাব ঘটিতে দেখিয়া মহেশ আবার বলে—এবারকার মত ওকে মাপ করুন বিপিনবাবু। আপনি ওকে বারণ করেছেন জানলে—বিপিনের আদেশ অমান্য করায় মাধবীলতার যে অকথ্য অপরাধ হইয়াছে তার বিরাটত্ব অনুভব করিয়া মহেশ চৌধুরী নিজেই যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কোন রকমে এবারকার মত মেয়েটাকে বিপিনের ক্ষমা পাওয়াইয়া দিবার ব্যাকুলতায় যেন দিশেহারা হইয়া যায়। মাধবীলতার হইয়া সে যেন বিপিনের পায়ে ধরিয়া বসিবে।

এবার মাধবীলতা ফোঁস করিয়া ওঠে—বারণ করেছেন মানে? উনি বারণ করবার কে? বেশ করেছি আমি আশ্রমে এসেছি।

বিপিন বলে—আশ্রমটা বেড়াবার যায়গা নয় মাধু।

মাধবীলতা ব্যঙ্গ করিয়া বলে—কি করবেন, মারবেন?

সদানন্দ বলে—আহা, কি আরম্ভ করে দিয়েছ তোমরা?

সে কথা কানে না তুলিয়া বিপিন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলে—ছেলেমানুষী করো না মাধু। আমার সঙ্গে এসো।

মহেশ তাড়াতাড়ি সায় দিয়া বলে—যাও মা, যাও। বিপিনবাবুর সঙ্গে যাও।

মহেশ চৌধুরী ফোড়ন না দিলে হয়তো মাধবীলতার উদ্ধত ভাবটা ধীরে ধীরে নরম হইয়া আসিত। বিপিনের সংযমহারা রাগ দেখিতে ভিতরে ভিতরে তার যেন কেমন ভাল লাগিতেছিল। সেদিন রাত্রের কথা মাধবীলতার মনে পড়িয়া গিয়াছে, বিপিন যখন তাকে মহেশ চৌধুরীর বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিল। সে রাত্রের স্মৃতি ভুলিবার নয়, মাধবীলতা ভুলিয়াও যায় নাই। হঠাৎ তার খেয়াল হইয়াছে, সে রাত্রে বিপিন তার সঙ্গে যে আশ্চর্য ব্যবহার করিয়াছিল, তার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে যেখানে যাইতে চায় পাঠাইয়া দিবে, তাকে বাড়ী কিনিয়া দিবে,

তার নামে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবে, মাঝখানে কয়েকদিনের ছেদ দিয়া আজ দিনের আলোয় বিপিন যেন সেই ব্যবহারেরই জের টানিয়া চলিয়াছে। তফাৎ কেবল এইটুকু যে, মাঝখানের সময়টাতে সে যেন সত্যসত্যই নিঃসন্দেহে বিপিনের হইয়া গিয়াছে! বিপিনের রাগ আর ধমক দিয়া জোর গলায় কথা বলার মধ্যে পর্যন্ত মাধবীলতা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে বিপিন জোর খাটাইতেছে আত্মীয়তার, অন্য কিছুর নয়। সে যেন বিপিনের মেয়ে বা বৌ, বা ওইরকম একটা কিছু।

কিন্তু মহেশ চৌধুরী ফোড়ন কাটায় এতগুলি মানুষের সামনে বিপিনের ব্যবহারে মেজাজটা তার চড়িয়াই যাইতে থাকে। সকলের সামনে এভাবে শাসন করিতে গেলে মেয়ে বা বৌও চটিয়া যায় বৈকি!

মাধবীলতা বিভূতির সামনে গিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পিছন ফিরিয়া।

—চলুন আমরা ফিরে যাই বিভূতিবাবু। যাবেন?

—আমার ওখানে একবার আসবে না মাধু?—সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে বলিল—যাও মা যাও, প্রভুর মন্দিরে একবার যাও।

মাধবীলতা জবাবও দিল না।

বিভূতি এতক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া সে বাড়ীর দিকে রওনা হওয়ার উপক্রম করে, সকলে দাঁড়াইয়া থাকে কাঠের পুতুলের মত। বিভূতি অস্বীকার করিয়াছে প্রণাম করিতে, মাধবীলতা ফিরিয়া চলিল আদেশ অমান্য করিয়া! চারিদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে না কি সদানন্দের বিরুদ্ধে? আশ্রমে দাঁড়াইয়া সদানন্দকে এভাবে অপমান আর অমান্য করা! দাঁতের বদলে রত্নাবলীর চোখ দুটি চকমক করে। শশধর বোকার মত হাঁ করিয়া থাকে। কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বিপিন অসহায় ক্রোধ দমন করার জন্য একটা বিড়ি ধরায়। সদানন্দের ভীতিকর গাম্ভীর্য

ঘনীভূত হইয়া আসে। বিপিন আর সদানন্দ দুজনের মনেই প্রায় এক ধরনের অদম্য ইচ্ছা জাগে—ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বগলদাবা করিয়া বিভূতিকে আথালি-পাথালি প্রহার করা।

মহেশ ডাকে—বিভূতি।

বিভূতি দাঁড়ায় এবং মুখ ফিরাইয়া তাকায়। মাধবীলতা দাঁড়ায় কিন্তু মুখ ফিরায় না।

মহেশ বলে—এখানে এসো।

বিভূতি কাছে আসে এবং হাই তোলে। মাধবীলতা সঙ্গে আসে কিন্তু মুখ নিচু করিয়া থাকে।

মহেশ বলে—প্রভুকে প্রণাম কর।

সদানন্দ বলে—তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ মহেশ।—সদানন্দের গলা কাঁপিয়া যায়।

মহেশ হাতজোড় করিয়া বলে—বাড়াবাড়ি প্রভু? ও যদি আপনাকে এখন প্রণাম না করে, আমায় যে যেদিক দু চোখ যায় চলে যেতে হবে প্রভু!

সদানন্দ বলে—তাই যাও তুমি, বজ্জাত কোথাকার!

মহেশ তখনও হাতজোড় করিয়া বলে—ওকে প্রণাম না করিয়ে কেমন করে যাব প্রভু।

সদানন্দ বাক্যহারা হইয়া থাকে। মহেশ বলে—বিভূতি প্রণাম কর প্রভুকে।

বিভূতি নড়ে না। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া সশব্দে মহেশের গালে বসাইয়া দেয় এক চড়।

কিছুদূরে চালার নিচে আশ্রমের অধিকাংশ নরনারী জমা হইয়াছিল; দু-চারজন করিয়া তখনও আসিয়া জুটিতেছিল। সদানন্দ আজ আত্মজ্ঞান লাভের প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মচর্যের স্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিবে। সকলে নিঃশব্দে সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতে করিতে কাঠের গুঁড়িটার কাছে এদের লক্ষ্য করিতেছিল। এতদূর হইতে কথা বুঝা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সকলের চলাফেরা আর অঙ্গভঙ্গির নির্বাক

অভিনয় দেখিয়া বেশ অনুমান করিতে পারিতেছিল যে রীতিমত একটি নাটকীয় ব্যাপারই ঘটিতেছে। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া মহেশ চৌধুরীর গালে যে চড় বসাইয়া দিয়াছে, এটা তারা স্পষ্টই দেখিতে পাইল। হঠাৎ একটা জোরালো গুঞ্জনধ্বনি উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল।

সদানন্দ সকলের আগে একবার চাহিয়া দেখিল চালার দিকে। অনেক সাক্ষীর সামনেই মহাপুরুষ সদানন্দ সাধু মহেশ চৌধুরীকে মারিয়া বসিয়াছে বটে। এখন কেবল ঘটনাটা সকলের চোখে পড়িল, পরে বিস্তারিত বিবরণ শুনিবে।

রত্নাবলীর চোখ আর দাঁত দুই-ই তখন চকচক করিতেছে। মাধবীলতা একটু অস্ফুট শব্দ করিয়া মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে ডান হাতের চারটি আঙ্গুল—ছেলেবেলায় মাধবীর এই অভ্যাসটা ছিল, বড় হইয়া কোনদিন এভাবে সে মুখে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দেয় নাই।

থতমত খাইয়া গিয়াছিল সকলেই, কিন্তু দেখা গেল অবাধ্য বিভূতি বাপের অপমানের প্রতিকার করিতে বড়ই চটপটে। মহেশ চৌধুরীর মোটা বাঁশের ছড়িটি কাঠের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া রাখা ছিল। চোখের পলকে লাঠিটা তুলিয়া নিয়া সে সদানন্দের দিকে আগাইয়া আসিল। দেশের জন্য মানুষ খুন করার কেবল পরামর্শ করার জন্য এতগুলি বছর সে আটক থাকিয়া আসিয়াছে, আজ বাপের জন্য হয়তো সত্যসত্যই মানুষ খুন করিয়া বসিত। বাধা দিল মহেশ।

—ছিঃ বিভূতি, ছিঃ!

বিভূতির হাতের লাঠি ছিনাইয়া নিয়া সদানন্দের পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মহেশ চৌধুরী তার মাথা গুঁজিয়া দিল।

—আপনাকে রাগিয়েছি, আমায় মাপ করুন প্রভু। ছেলে আমার আপনাকে লাঠি নিয়ে মারতে উঠেছিল, আমায় মাপ করুন প্রভু।

প্রায় আর্তনাদ করার মত চীৎকার করিয়া বিভূতি বলিল—তোমার কি লজ্জাসরম নেই বাবা?

—কি বকছিস্ তুই পাগলের মত? প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে

প্রণাম কর। ও বিভূতি, শীগগির প্রণাম কর প্রভুকে! আমি না তোর বাপ বিভূতি? আমার দেবতাকে মারবার জন্য তুই লাঠি তুলেছিস, হাত যে তোর খসে যাবে রে, কুষ্ঠ হবে যে তোর হাতে! শীগগির প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে শীগগির প্রণাম কর।

পাগল হইয়া গিয়াছে মহেশ চৌধুরী? বিভূতি সভয় বিস্ময়ে সদানন্দের পদতলে বাপের সর্বাঙ্গীণ আত্মোৎসর্গ চাহিয়া দেখে আর তার অভিনব মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া যায়। মাধবীলতা কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলে—প্রণাম করে নিন্। তারপর ওঁকে নিয়ে বাড়ী যাই চলুন।

বিভূতি একটু ইতস্তত করিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিবার জন্য আগাইয়া যায়। মহেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সদানন্দের পা দুটিকে মুক্তি দেয়। হাত জোড় করিয়া নিবেদন জানায়—প্রভু আশীর্বাদ করুন ছেলের যেন আমার সুমতি হয়।

৯

বিকালে মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে সকলে পিঠা পায়েস খাইতে বসিয়াছে। খাওয়ার জন্য বিভূতির লুব্ধ ব্যাকুলতা দেখিয়া তার মার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। ছেলে বাড়ী ফেরার পর বিভূতির মা আজকাল কেবল নানা রকম খাবারই তৈরী করে। বিভূতি খাইতে পারে না, সামান্য কিছু খাইলেই তার পেট ভরিয়া যায়, দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মত উগ্র খাওয়ার লোভের তার তৃপ্তি হয় না। তার চাহনি দেখিয়া কত কথাই যে মাধবীলতার মনে হয়। হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া মাথায় সে একটা ঝাঁকুনি দেয়।

ভিতরের চওড়া বারান্দায় অর্ধচন্দ্রাকারে সকলে বসিয়াছে, মুখোমুখি হওয়ার সুবিধার জন্য। বৈকালিক জলখাবার শেষ হইতে কোন কোনদিন দুঘণ্টা সময়ও লাগিয়া যায়। রাজ্যের কথা আলোচনা হয় এই সময়। আজ কথাবার্তা তেমন জমিতেছিল না। সকালের ঘটনায় একমাত্র মহেশ চৌধুরী ছাড়া সকলেই কমবেশী অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

হঠাৎ বিভূতি বলিল—আচ্ছা বাবা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল—কে আগে কথা তোলে দেখছিলাম। পাগলামী মনে হয়েছে তোদের, না? কেন বল তো? পাগলের কথা কাজ কোন কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, আমি তো খাপছাড়া কিছু বলিও নি, কিছু করিও নি।

—বল নি, কর নি?

—না। আমি আবোলতাবোল কথা কোনদিন বলি না, খাপছাড়া কাজ করি না। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতে পারে, তা সেটা সবারি হয়।

—এরকম অহঙ্কার তো কখনও দেখি নি তোমার! নিজেকে প্রায় মহাপুরুষ দাঁড় করিয়ে দিচ্ছ।

মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়িল—তা করি নি, একটা সোজা সত্যি কথা বলেছি। তোর অহঙ্কার মনে হল কেন জানিস্? তোর সঙ্গে কথা বলার সময় আমার মনে আছে তুই আমার ছেলে, কিন্তু আমার বিচার করার সময় তুই ভুলে যাচ্ছিস যে আমি তোর বাপ। কথাটা প্রভুকে বললে অন্যভাবে বলতাম—শুনলে আমার বেশী বেশী বিনয় দেখে তুই চটে যেতিস, তখন তোর খেয়াল থাকত যে আমি তোর বাপ, আর নিজের বাপের আত্মমর্যাদা জ্ঞানের অভাব দেখে লজ্জায় দুঃখে অপমানে তোর মাথা হেঁট হয়ে যেত।

এভাবে মহেশ চৌধুরীকে কথা বলিতে মাধবীলতা কখনো শোনে নাই। সে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে মহেশ চৌধুরীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহেশ চৌধুরী আবার বলিল আত্মমর্যাদা বলতে তোরা কি বুঝিস জানিস? ফাঁকা গর্ব, গোঁয়ার্তুমি। মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়া তোদের আত্মমর্যাদা টেঁকে না, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকি লাগবে, দরকার হলে প্রকাশ্যেও হাতাহাতি হয়ে যাবে, লাঠি হাতে মারতে উঠবি, তবে তোদের আত্মমর্যাদা খাড়া থাকতে পারবে। কি বল মাধু, তাই নয়?

মাধবীলতার মুখ ভর্তি ছিল, খাবারটা গিলিয়া কথা বলিতে হওয়ায় বড়ই সে লজ্জা পাইল।

—কি জানি, ওসব বড় বড় দার্শনিক কথা ভাল বুঝি না।

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল—বড় বড় দার্শনিক কথা আবার কখন বললাম? জানলে তো বলব! আচ্ছা, কথাটা বুঝিয়ে বলছি তোমাকে।

—থাক না, আমার না বুঝলেও চলবে।

—উঁহুঁ, তা চলবে না। কথাটা তোমায় না বুঝিয়ে ছাড়ব না।

মহেশ চৌধুরীর একগুঁয়েমিতে মাধবীলতার হঠাৎ বড় হাসি পায়। মনে হয়, সে যদি কথাটা না বুঝে, সদানন্দের চরণ দর্শনের জন্য একদিন যেমন ধন্না দিয়াছিল, আজ সকালে যেভাবে বিভূতিকে

সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করাইয়াছে, তেমনি একটা কিছু কাণ্ড মহেশ চৌধুরী আরম্ভ করিয়া দিবে। বলে—বুঝেও যদি না বুঝি ?

মহেশ চৌধুরী শান্তভাবে বলিল—হেসো না, হাসতে নেই। বুঝবে বৈকি, বললেই বুঝবে। শোন বলি। সকালে বিপিনবাবুর সঙ্গে যে ঝগড়া করলে, মানুষটার মনে কষ্ট দিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করলে, আত্মমর্যাদা বাঁচাবার জন্য তো ? তুমি ভাবলে, বিপিনবাবুর সঙ্গে ভালভাবে কথা বললে সবাই তোমাকে ভীরু ,অপদার্থ মনে করবে, লোকের কাছে তোমার অপমান হবে। ব্যাপারটা কি বিশ্রী দাঁড়িয়ে গেল বল তো ? তুমিও উল্টেপাল্টে সারাদিন ওই কথাই ভাবছ, বিপিনবাবুও ভাবছেন। তোমাদের দুজনের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি যদি হাসিমুখে দুটো মিষ্টি কথা বলতে, এক মুহূর্তে বিপিনবাবুর রাগ জল হয়ে যেত। তুমিও চাইছিলে ঝগড়া না হয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে ভাব হোক, বিপিনবাবুও তাই চাইছিলেন—আত্মমর্যাদা বাঁচাবার জন্য তোমাদের ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তোমরা সকলকে হিংসা কর কি না তাই এমন হয়। নিজের যাতে কোন ক্ষতি নেই পরের জন্য সেটুকু ত্যাগও করতে পার না।

মাধবীলতা কথা বলিল না।

বিভূতি বলিল—গালে যে চড় মারে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ার চেয়ে ওরকম ঝগড়া ঢের ভাল।

মহেশ চৌধুরী বলিল—গালে চড় মেরেছেন, প্রভুর সঙ্গে আমার কি শুধু এইটুকু সম্পর্ক বিভূতি ? আমি তো চিরদিন প্রভুর পায়ে লুটিয়ে আসছি ? প্রভুকে যদি আগে থেকে দেবতার মত ভক্তি না করতাম, আজ গালে চড় মারার পর মানুষকে আমার ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা দেখাবার জন্য প্রভুর পায়ে ধরতাম, তা হলে অন্যায় হত। তার মানে কি দাঁড়াত জানিস। আমি যেন প্রভুর চেয়ে বড়। কিন্তু প্রভুর সম্বন্ধে আমার অহঙ্কার নেই, দীনতা নেই, উদারতা নেই—আমি সোজাসুজি তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করি। গালে যখন উনি চড় মারলেন, আমি বুঝতে পারলাম উনি ভয়ানক রাগ করেছেন। আমার মনে বড়

কষ্ট হল, তাই ওঁর পায়ে ধরলাম। উনি আমায় বড় ভালবাসেন বিভূতি—আমায় মারার জন্য না জানি মনে মনে কত কষ্ট পাচ্ছেন।

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—মানুষের পক্ষে মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করা—

মহেশ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলিল—উচিত নয়। মানুষ কখনও মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করে না। কিন্তু সংসারে কটা মানুষ আছে বল তো? যে মানুষ নয়, সে মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করবে না কেন বল তো? সবাই যদি মানুষ হত বিভূতি, পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত।

এবারও বিভূতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমার কথা ঠিক নয় বাবা। একজন মানুষ আরেকজনকে দেবতার মত ভয় ভক্তি করে বলেই সংসারে এত বেশী অমানুষ আছে—সবাই মানুষ হতে পারছে না। একজন মানুষের চাপে আরেকজন কুঁকড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেকথা থাক—আমাকে কেন তুমি জোর করে ওঁকে প্রণাম করালে? আমি তো ওঁকে দেবতার মত ভক্তি করি না। বরং—

মহেশ চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তুই আমার ছেলে বলে তোকে প্রণাম করিয়েছি। তুই ভক্তি করিস বা না করিস সে কথা ভিন্ন, তোকে দিয়ে ওঁকে প্রণাম করাবার ক্ষমতা থাকতেও যদি প্রণাম না করাতাম, আমার পক্ষে সেটা অন্যায় হত। অন্য কাউকে তো আমি জোর করে প্রণাম করাই না!

বিভূতি মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হঠাৎ স্বয়ং সদানন্দ মহেশ চৌধুরীর বাড়ী আসিল।

সকলে ভাবিল, বুঝি সকালবেলা মহেশ চৌধুরীর গালে চড় মারার প্রতিবিধান করিতে আসিয়াছে। ভক্তকে সদানন্দ আজ অনেক আদর করিবে।

মহেশ চৌধুরী তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া বলিল—প্রভু?

সদানন্দ বলিল—মহেশ, বিপিন আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই তোমার কাছে এলাম। তোমার বাড়ীতে থাকব।

একথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে সদানন্দ সাধুর আশ্রম হইতে সদানন্দ সাধুকেই তাড়াইয়া দেওয়া হইবে! অন্য সকলের মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গেল, কথাটা সত্যই কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, কেবল মহেশের ভাব দেখিয়া মনে হইল না সে বিশেষ অবাক হইয়াছে, সে যেন এ রকম একটা কিছু প্রত্যাশাই করিতেছিল। বিস্ময় প্রকাশ করার বদলে সে দেখাইল রাগ!

—বটে! বিপিনবাবুর স্পর্ধা তো কম নয়!

তারপর সদানন্দের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাতজোড় করিয়া ঊর্ধ্ব মুখে সদানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল—আপনি আমার এখানে থাকবেন প্রভু? আমার এত বড় সৌভাগ্য হবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আজ আমার জীবন সার্থক হল। এ বাড়ী আপনার, এ বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ আপনার দাসদাসী।

ব্যাপারটা কি হইয়াছে, কেন বিপিন হঠাৎ সদানন্দকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এ ক্ষমতা বিপিন কোথায় পাইল, সকলের মনে এ ধরনের কত যে প্রশ্ন জাগিতেছিল হিসাব হয় না। কিন্তু সদানন্দকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কারও নাই। ভরসা না পাওয়ার জন্যই হোক্ অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক মহেশ চৌধুরীও এ বিষয়ে একেবারে মুখ বুজিয়া ছিল।

অন্য কেউ কথা তুলিবে ভাবিয়া মাধবীলতা একটু অপেক্ষা করে, তারপর খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিয়া বসে—আপনাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন বিপিনবাবু?

সদানন্দ কিছু বলিবার আগেই মহেশ চৌধুরী বলে—কি যে তুমি বল মাধু? তাড়িয়ে আবার কে দেবে প্রভুকে? উনি রাগ করে চলে এসেছেন, তাও বুঝতে পার না?

সদানন্দ বলে—না মহেশ, বিপিন আমায় তাড়িয়েই দিয়েছে।

মহেশ বলে—তাই কি হয় প্রভু! আপনাকে তাড়াবার ক্ষমতা কারও নেই।

সদানন্দ বলে—তা আছে বৈকি। আশ্রমটা বিপিনের সম্পত্তি। আমি আশ্রমের শিক্ষক হিসাবে ছিলাম, ক'বছরের মাইনে ছাড়া আর কিছু দাবী করতে পারব না। বিষয়বুদ্ধি তো নেই—

—আপনার বুদ্ধির কাছে বিপিনবাবুর বিষয়বুদ্ধি!—মহেশ চৌধুরী একগাল হাসে—ক'বিঘা মেঠো জমি বিপিনবাবু নিজের নামে লিখে নিয়েছেন, আপনি জয় করেছেন মানুষগুলিকে। আশ্রম কখনো বিপিনবাবুর সম্পত্তি হতে পারে প্রভু? আপনাকে নিয়ে তবে তো আশ্রম! আপনি যেখানে থাকবেন সেখানটাই হবে আশ্রম। আপনি যখন চলে এসেছেন, আপনার সঙ্গে আশ্রমও চলে এসেছে।

সজোরে নিশ্বাস ফেলিয়া গভীর আফসোসের সঙ্গে মহেশ আবার বলে—প্রথমটা রাগ হয়েছিল, এখন আবার বিপিনবাবুর জন্য মায়া হচ্ছে। বুদ্ধির দোষে মানুষ কি সর্বনাশটাই নিজের করে।

মহেশ চৌধুরী সদানন্দের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিল। মহেশ চৌধুরীর ঘরবাড়ী সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে; ঘষা-মাজা ধোয়া-মোছা নিয়া বিভূতির মা সব সময়েই ব্যস্ত হইয়া আছে। সব-চেয়ে ভাল ঘরখানায় তাড়াতাড়ি সদানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। পিতামহের আমলের প্রকাণ্ড খাটে আনকোরা নূতন তোষক পাতা হইল—একটু ছোট হইল তোষকটা। তা হোক, লোকের ব্যবহার করা তোষক তো আর সদানন্দকে দেওয়া যায় না। তোষক ঢাকা পড়িল গায়ে দেওয়ার মুগার চাদরে। বালিশের বদলে দেওয়া হইল ঝালর দেওয়া তাকিয়া, কেবল বিশেষ উপলক্ষ্যে আসর পাতা হইলে যেগুলি কাজে লাগে। ঘরের এক কোণে পড়িল ঘরে বোনা কার্পেটের আসন, দুপাশে জ্বলিতে লাগিল ধূপধুনা আর কোণ ঘেঁষিয়া একটি মস্ত ঘিয়ের প্রদীপ। অভ্যর্থনার আরও কত ছোটবড় আয়োজনই যে মহেশ চৌধুরী করিল! কিছুকাল আগেও মহেশ চৌধুরীর বাড়ী ছিল নিস্তব্ধ, মহেশ আর তার ভাগ্নে শশধর এবং তাদের দুজনের

দুটি স্ত্রী চুপচাপ এ বাড়ীতে দিনরাত্রি কাটাইয়া দিত, কারও মধ্যে যেন প্রাণ ছিল না। তারপর মাধবীলতা আসিয়াছে, বিভূতি আসিয়াছে, আজ আসিল সদানন্দ ; মাধবীলতার পদার্পণের পর সেই যে একটু জীবনের সাড়া জাগিয়াছিল বাড়াতে, আজ যেন তা চরমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে বিশেষ একটি উৎসবে।

সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য আসিয়াছে, মুখে ফুটিয়াছে কথা। একজন কেবল আগেও যেমন চুপচাপ ছিল এখনও তেমনি চুপচাপ থাকিয়া গিয়াছে। সে শশধরের ঘোমটা-টানা বৌ। কোন ফাঁকে কখন বাড়ীর কোন আড়াল হইতে আসিয়া সে যে সদানন্দের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং আবার নিজের অন্তরালে চলিয়া গেল, কেউ খেয়ালও করিল কিনা সন্দেহ। শশধরের বৌ যে বাড়ীতে থাকে অধিকাংশ সময়ে তা টেরও পাওয়া যায় না।

মহেশ কেবল একবার একরাশি বাসন হাতে খিড়কি পুকুরে যাওয়ার সময় উঠানের কোণে পিছন হইতে তাকে পাকড়াও করিয়া বলিল—বৌমা, তুমিই প্রভুর জন্য রান্না করো। চান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেমন করে ঠাকুরদেবতার ভোগ রান্না কর না, ঠিক তেমনি করে।

শশধরের বৌ মামাশ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে না। ডাক শুনিয়া মহেশ চৌধুরীর দিকে পিছন করিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ঘোমটার মধ্যে মাথা নত করিয়া সে নীরবে সায় দিল। মহেশ চৌধুরী সরিয়া গেলে আর কিছু বলিবার নাই জানিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল খিড়কির পুকুরের দিকে।

তারপর মহেশ জিজ্ঞাসা করিতে গেল, শশধরের বৌ স্নান করিয়া ভোগ রান্না করিয়া দিলে সদানন্দের আপত্তি নাই তো ?

সদানন্দ বলিল—বাড়াবাড়ি করো না মহেশ, বাড়াবাড়ি করো না।

মহেশ বলিল—না, প্রভু।

—সকলের জন্য যা রান্না হবে আমিও তাই খাব। আমার ওসব নেই জান তো ?

—আপনি অনুমতি দিলে একটু বিশেষ ভাবেই রান্নাটা করাই প্রভু। আশ্রমের কথা আলাদা, এখানে—

সদানন্দ হাসিয়া বলিল—তুমি আমায় টিঁকতে দেবে না মহেশ।

মহেশও হাসিয়া বলিল—আপনাকে আমি আর ছাড়ব না প্রভু, আজ থেকে আপনি আমার হয়ে গেলেন।

অন্য কেহ হইলে হয়তো একথার জবাবে তামাসা করিয়া বলিত, আজ তোমার সম্পত্তি হয়ে গেলাম মহেশ? কিন্তু ওসব রসিকতা সদানন্দের আসে না। মহেশ যে তাকে সত্যসত্যই স্থায়ীভাবে এখানে আটকাইয়া ফেলিবার বিরাট আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সদানন্দের এটা যেন ভাল লাগিতেছিল না। বিপিন একবার রাগ করিয়া আশ্রম হইতে কয়েকদিনের জন্য কিছু না বলিয়া যখন চলিয়া গিয়াছিল, আশ্রমের পাশের আমবাগানটি যেবার সে বাগাইয়া আনে, তখন বিপিনের জন্য তার কি রকম মন কেমন করিয়াছিল সদানন্দের মনে আছে। আজ নিজে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াও তার তেমনি মন কেমন করিতেছে। সেবার যেমন কেবলি মনে হইত বিপিন ফিরিয়া আসিবে, আজ তেমনি আশা হইতেছে বিপিন হয়তো ডাকিতে আসিবে, হাতে-পায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাইবে।

মহেশ চৌধুরী বলে—আশ্রম থেকে আপনার জিনিষপত্র সব আনিয়ে নিই প্রভু?

সদানন্দ বারণ করিয়া বলে—না, না, এখন থাক। তাড়াতাড়ির কি আছে!

জন্মের মত আশ্রম ত্যাগ করিয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছে, বলিয়া আসিয়াছে জীবনে আর কোনদিন বিপিনের ওই জমিদারীতে সে পা দিবে না। আশ্রমের সঙ্গে আর তার কিসের সম্পর্ক? তবু তার নিজস্ব জিনিষপত্রগুলি যতক্ষণ আশ্রমে আছে একটু যেন যোগাযোগ বজায় রহিয়াছে ততক্ষণ আশ্রমের সঙ্গে, ওই যোগাযোগটুকুও ঘুচাইয়া ফেলিতে সদানন্দের ইচ্ছা হয় না। তাছাড়া, সদানন্দের একটু ভয়ও হয়। জিনিষপত্রগুলি আনাইয়া নিলে বিপিন যদি আরও

রাগিয়া যায়, তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার সাধ থাকিলেও যদি ওই কারণেই সে মতটা বদলাইয়া ফেলে!

মহেশ চৌধুরীও বোধ হয় এসব কথা অনুমান করিতে পারে। সদানন্দের আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পথে আরও একটু বাধা সৃষ্টি করিতে তার আগ্রহ দেখিয়া অন্ততঃ তাই মনে হয়। জিনিষগুলি আনাইবার অনুমতি পাওয়ার জন্য সে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। পরে আনাইলেও অবশ্য চলিবে, কিন্তু এখন আনাইলেই বা দোষ কি? এক মুহূর্তের জন্যই বা সদানন্দ সামান্য একটু অসুবিধা ভোগ করিবে কেন? মহেশের তো তা সহ্য হইবে না!

কিন্তু সদানন্দ কিছুতেই অনুমতি দেয় না। বলে—আজ থাক মহেশ। কাল যা হয় করা যাবে।

বিপিন তাকে হাতে-পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া নিতে আসিবে সদানন্দের এরকম আশা করার একটু কারণ ছিল। বিপিন সত্যই তাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। সহজ ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাও। সদানন্দও রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাকে এভাবে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিপিনের মন-খারাপ হওয়া আশ্চর্য নয়, তাকে ফিরাইয়া নিতে আসাও আশ্চর্য নয়।

সেদিন সকালে বিপিনের বিনা অনুমতিতে মাধবীলতার আশ্রমে আসা এবং সদানন্দের পায়ে বিভূতিকে প্রণাম করানো নিয়া যে কাণ্ডটা হইয়া গিয়াছিল তারপর সারাদিন বিপিন আর সদানন্দের দেখা হয় নাই।

অনেক রাত্রে বিপিন সদানন্দের ঘরে আসিয়াই বলিয়াছিল—সদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম তোকে। আগের মত আমার কথা শুনে চলবি কি চলবি না তুই?

—আমি কি তোর মাগনায় কেনা চাকর যে তোর সব হুকুম মেনে চলব?

—ওসব বাজে কথা থাক। তোর সঙ্গে কোনদিন আমি ওরকম ব্যবহার করি নি, সে সম্পর্ক আমার নয় তোর সঙ্গে। আমার কথা

শুনে চলা মানে আমার হুকুম মেনে চলা নয়। নিজেই ভেবে দেখ, আমি বুদ্ধি খাটিয়ে আশ্রমের উন্নতির ব্যবস্থা করব, তুই আমার একটা কথা মানবি একটা কথা মানবি না, তা হলে কি আশ্রম চলে? আশ্রমের জন্য তোকে দরকার আছে, কিন্তু আশ্রম চালাবার ক্ষমতা তোর নেই, তুই যদি—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আসল কথাটা শুনি?

বিপিন একটু চুপ করিয়া থাকিয়াছিল। রাগ করিবে না এবং তর্ক করিবে না ঠিক করিয়াই সে এখন সদানন্দের কাছে আসিয়াছে, কিন্তু আজকাল কথায় কথায় সদানন্দের সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা হয়, ঝগড়া করিবার সাধ জাগে।

—আসল কথাটা এই। আগে যেমন সব বিষয়ে আমার কথা শুনে চলতিস তেমনিভাবে যদি না চলিস, তোকে দিয়ে আমার কাজ হবে না।

—না হলে কি করবি?

—তোকে বিদেয় দেব।

—বিদেয় দিবি! তোর তো স্পর্ধা কম নয়? তোকে কে বিদেয় দেয় ঠিক নেই—

—আমার আশ্রম থেকে আমাকে কে বিদেয় দেবে?—বিপিন হাসিয়াছিল।

সদানন্দ সগর্বে বলিয়াছিল—আমি একটা মুখের কথা বললে সবাই তোকে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে তা জানিস?

বিপিন নির্বিকার ভাবেই বলিয়াছিল—বলেই দেখ না মুখের কথাটা?

কথাটার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। সদানন্দ হুকুম দিলেও আশ্রমের কেউ বিপিনের বিরুদ্ধে যাইবে না। এ বিষয়ে সদানন্দের মনেও বরাবর একটা খটকা আছে। সকলে তাকে ভক্তি করে বটে কিন্তু তার সাধুতার মধ্যে যেমন ফাঁকি আছে, সকলের ভক্তির মধ্যেও তেমনি একটা ফাঁকি আছে বলিয়া সদানন্দের সন্দেহ হয়।

বিপিন একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিয়াছিল—তুই বড় বোকা সদা। সবাই টিপ্ টিপ্ করে প্রণাম করে আর তুই ভাবিস তোর জন্য প্রাণ দিতে সবাই ছটফট করছে। প্রাণ পাওয়া অত সহজ নয় রে! আমি তোকে ভড়ং শিখিয়েছি, সেই ভড়ং করে লোকের মনে তুই জন্মিয়েছিস একটা ভয়। তুই থাকিস একটা ধোঁয়ার আড়ালে, তোর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, সকলের সামনে মহাপুরুষের মত চলিস ফিরিস, সবাই তাই তোকে মহাপুরুষ ভেবে রেখেছে। কল্পনা জগতের অবাস্তব প্রমাণ দেখিয়ে দেখিয়ে তোকে আমার মহাপুরুষ দাঁড় করাতে হয়েছে। তুই যে মহাপুরুষ নোস্ তার একটা বাস্তব প্রমাণও কেউ যাতে না পায় সেইজন্যই তোকে আমার লুকিয়ে রাখতে হয়। সকলে তোকে কি রকমের ভয় ভক্তি করে জানিস? কাল যদি আমি রটিয়ে দিই তোর অত্যাচারে মাধুকে আশ্রম ছাড়তে হয়েছে, সবাই তাই বিশ্বাস করে বসবে। মাধুকে নিয়ে কয়েকটা যে বোকামি করেছিস, সেগুলি হবে তার বাস্তব প্রমাণ। এত বড় সাধু তুই, কিন্তু তোর সাধুত্বের বাস্তব প্রমাণ নেই কিনা, তাই মাধুর সম্বন্ধে তোর বোকামির ওই কটা তুচ্ছ প্রমাণেই তোর সাধুত্ব ফেঁসে যাবে।

—মাধুকে নিয়ে কি বোকামি করেছি?

—জানিস না? তা নাও জানতে পারিস! চোর কি করে জানিস, যখন দরকার নেই তখন বেশী বেশী সাধু বনে থাকে, আর চুরি করবার সময় ভাবে কেউ জানতে পারছে না। তবু চোর ধরা পড়ে জেলে যায়। আজ সকালেই তো সকলের সামনে কেঁদে কেঁদে বললি, একবার আমার ঘরে আসবে না মাধু? আহা, একটা মেয়ের কাছে কি করুণ মিনতি মহাপুরুষ সদানন্দের! মাধু মুখ ফিরিয়ে গটগট করে চলে গেল। কথাটা কেউ মনে আনছে না তাই, কিন্তু একবার যদি কেউ সুর তোলে, কারও দু বার ভাবতে হবে না কিসের মানে কি।

এবার সদানন্দ রাগ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, বিপিনের মনটাই কদর্য। কতদূর কদর্য, লাগসই উপমা দিয়াও বুঝাইয়া দিয়াছিল।

বিপিন যা ভাবে কেউ তা ভাবিবে না। সকলে তো বিপিন নয়, বিপিনের মত কুৎসিত মন তো নয় সকলের, বিপিন যেমন বড়লোকের পা-চাটা, ফন্দিবাজ, হীন, বিশ্বাসঘাতক মানুষ—

—তিন দিনের মধ্যে তুই আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাবি। আমি যাই হই, আশ্রমের কুটোটি পর্যন্ত আমার, তা মনে রাখিস। তুই সত্যি আমার চাকর—তোকে থাকবার কোয়ার্টার দিয়েছি, খেতে পরতে দিয়েছি, চাইলে মাইনে বাবদ কিছু টাকা পাবি, বাস্। আর কোন কিছু অধিকার তোর নেই।

—আচ্ছা, রাজাসায়েবের সঙ্গে সে বোঝাপড়া হবে।

—রাজাসায়েব? রাজাসায়েব কি করবেন? দুদিন আগে রাজাসায়েবের যা খুসী করার ক্ষমতা ছিল, এখন আর নেই। এখন সমস্ত কিছুর মালিক আমি। তুই কি ভাবিস সেবার গিয়ে আমি শুধু আমবাগানটা বাগিয়ে এনেছি? সব নিজের দখলে এনেছি। টাকা পয়সার মালিক তো ছিলাম প্রথম থেকেই, এবার জমিজমারও মালিক হয়েছি। কি করবেন বল রাজাসায়েব, ক'বিঘা জমির জন্য ছেলেকে তো আর জেলে পাঠাতে পারেন না।

—জেল!

—আমি না বাঁচিয়ে দিলে মাধুর জন্য নারাণবাবুর জেল হত বৈকি।

—ও!

সদানন্দ চুপ করিয়াছিল অনেকক্ষণ।

—আশ্রমের আয়ে প্রথম থেকে তোর অধিকার ছিল?

—ছিল বৈকি। আমার নামে আশ্রম হল, আশ্রমের আয় আমার হবে না? লোকসান হলেও অবশ্য আমার ঘাড়ে চাপত। প্রথমে ক'জনকে নিয়ে কতটুকু আশ্রম হয়েছিল মনে আছে সদা? তখন তোরা ভাবতেও পারিস নি একদিন আশ্রম এতবড় হবে—দিনরাত কেবল কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতিস, আশ্রম চলবে না, আশ্রম চলবে না। রাজাসায়েবও আশ্রমের এ রকম উন্নতির কথা ভাবতে পারেন নি, তাই প্রথম দফার অল্প জমি আমাকে একেবারে দান করে

দিয়েছিলেন। পরের দফায় যখন জমি দিলেন, তখন করলেন কি জানিস, এত সব অধিকার চেয়ে বসলেন যে আশ্রম নিয়ে যা খুসী করতে পারেন। আমি তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। জানতাম, একদিন সমস্ত ক্ষমতা আবার আমার হাতেই ফিরে আসবে।

এক মুহূর্তের জন্য বিপিন থামিয়াছিল, তারপর আবার বলিয়াছিল, এসব কথা তোকে বলতাম না, তোকে আর রাখা চলবে না বলেই বললাম। আমার আশ্রম ছেড়ে তুই চলে যা ভাই, দোহাই তোর। গোলমাল তুই করতে পারিস, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না, যেতে তোকে হবেই। গোলমাল না করে যদি চলে যাস, আশ্রমের এতদিনের লাভের একটা ভাগ বরং তোকে দেব, যতই হোক, এতদিন তো তুই আশ্রমের উন্নতিতে সাহায্য করেছিস, কিছু দাবী তোর আছে। ওই টাকায় যেখানে খুসী নিজের একটা ছোটখাট আশ্রম তুই খুলতে পারবি।

রাত্রি বাড়িবার জন্যই ঘরের আলোটার জ্যোতি যেন একটু ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। দুজনে চুপ করিয়া থাকিয়াছে। বিপিন একবার ভাল করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে সদানন্দের, সদানন্দ একবার ভাল করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে বিপিনের। ব্যাপারটা গুরুতর তাই তারা ভিন্ন কে বুঝিবে কি গুরুত্ব সেই দেখার! দুজনে তারা বন্ধু, বন্ধুর মধ্যে ছাড়া এমন ব্যাপার ঘটে না, এ রকম বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় না! সদানন্দ কি বলিত অনুমান করা কঠিন, বিপিন একটা খাপছাড়া কথা বলিয়া বসায় সে আর মুখ খোলে নাই।

—আরও একটা জিনিষ তোকে দিলাম সদা। মাধুকে তুই নিস্। ওকে দিয়ে আমার আর দরকার নেই।

বিপিনের শেষ কথাটার কোন মানে হয়? মাধবীলতাকে সে দান করিয়া দিল, মাধবীলতা যেন তার সম্পত্তি! আশ্রমটা সম্পূর্ণরূপে নিজের দখলে আনার জন্য এতদিন মাধবীলতাকে তার দরকার ছিল,

এখন আর দরকার নাই তাই বন্ধুকে দিয়া দিয়াছে! কেমন লাগে কথাটা ভাবিতে? মনটা কিরকম জ্বালা করে? কে বলিয়াছে বিপিনকে, মাধবীলতাকে তার দরকার আছে?

তবু বিপিনের কথার একটা ইঙ্গিত নিন্দনীয় অভিপ্রায়ের ধারাবাহিক অবাধ্যতার মত মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়ায়। মাধবীলতাকে নিয়া সদানন্দ এবার যা খুসী করিতে পারে, বিপিনের দিক হইতে এতটুকু বাধার সৃষ্টি হইবে না। মাধবীলতাকে বিপিন আশ্রমে আনিয়াছিল কিন্তু ওর সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তার শেষ হইয়া গিয়াছে। হয়তো এতটুকুই ছিল বিপিনের আসল বক্তব্য। মাধবী-লতার সম্বন্ধে বন্ধুকে অভয় দেওয়া।

মহেশ যখন সদানন্দকে তার ঘরে একা বিশ্রাম করিবার সুযোগ দিয়াছে, সকলকে বারণ করিয়া দিয়াছে ঘরে যাইতে, তখন মাধবীলতা আসিয়া হাজির হয়।

—এসো মাধু। বোসো। —ব্যাপার কি বলুন তো?

—বসছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি হল?

—ব্যাপার আর কি হবে, ঝগড়া করে চলে এলাম। ও রকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে মানুষের পোষায়? এতদিন সহ্য করে-ছিলাম, আর সহ্য হল না।

মাধবীলতা মুখ গম্ভীর করিয়া বলে—আপনাদের দিয়ে কোন ভাল কাজ হতে পারে না। খালি নিজেদের মধ্যেই মারামারি করবেন তো কাজ হবে কি। ছি ছি, নিজের নিজের স্বার্থচিন্তাই যদি করবেন দিনরাত, এসব কাজে কেন আসেন আপনারা?

সদানন্দ গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলে—স্বার্থচিন্তাই যদি করতাম মাধু, আশ্রম ছেড়ে আজ চলে আসতে হত না। বিপিনের বদলে আশ্রমটা আমিই দখল করতাম।

—পারলে তো করতেন।

মাধবীর মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়া বলে—আমাকে কি তুমি বিপিনের মত অপদার্থ ভাব?

—বিপিনবাবুকে আমি অপদার্থ ভাবি না।

—মহাপুরুষ ভাব বুঝি?

সদানন্দের ব্যঙ্গের জবাবে মাধবীলতাও ব্যঙ্গ করিয়া বলে—বিপনবাবু কেন মহাপুরুষ হবেন, মহাপুরুষ তো আপনি!

মাধবীলতা আর সে মাধবীলতা নাই। সদানন্দের কাছে সব রকম চাপল্য হারাইয়া আর সে জড়সড় হইয়া যায় না, ভয়ে ভয়ে হিসাব করিয়া কথা বলে না, অনায়াসে ব্যঙ্গ করে। মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের ব্যবহারও অবশ্য বদলাইয়া গিয়াছে। বাহিরের সকল ভক্তের সঙ্গে আলাপ করার অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই প্রথম প্রথম সে মাধবী-লতার সঙ্গে আলাপ করিত, মাঝে মাঝে সব গোলমাল হইয়া যাইত বটে কিন্তু তার যেন ছিল ছেলেমানুষী ভাবপ্রবণতার আবরণে মানবীকে দেবতার প্রশ্রয় দেওয়া, দেবতার বাড়াবাড়ি অন্তরঙ্গতার জবাবেও যাতে মাথা তুলিবার সাহস মানবীর হয় না। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ করাটা তার নামিয়া গিয়াছে বিপিনের সঙ্গে আলাপ করার স্তরে।

মাধবীর আগের মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়াছিল, এবারকার ব্যঙ্গে হাসিয়া বলে—তোমার কাছে তাই বটে। আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নেই!

—কেন?

—তোমাকে যে তাহলে দ্বিচারিণী হতে হবে।

মুখ মাধবীর লাল হয় না, বিবর্ণ হইয়া যায়। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়।

সদানন্দ নিচু গলায় ব্যগ্রভাবে বলে—রাগ করলে মাধু? শোন, শুনে যাও—

কিন্তু মাধবীলতা আজকাল বড়ই অবাধ্য হইয়াছে, কোন কথাই শুনিতে চায় না।

সদানন্দ যতই আশা করুক, বিপিন তো আসেই না, আশ্রম

হইতে কোন শিষ্যও আসে না। সদানন্দ কারও কাছে কিছু বলিয়া আসে নাই, আশ্রমের শিষ্যদের কিছু জানাইবার কথা ভাবিতেও তার সঙ্কোচ হইতেছিল। বিপিন তাদের কি বুঝাইয়াছে সেই জানে! হয়তো আশ্রমের কেউ এখনও জানিতেই পারে নাই, সদানন্দ চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে অথবা সদানন্দ বাগবাদায় মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছে। হয়তো বিপিন তাদের বুঝাইয়াছে, সদানন্দ বিশেষ কারণে কিছুদিন মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে বাস করিতে গিয়াছে, তাকে গিয়া কারও দর্শন করা বারণ। বিশেষ কারণটাও হয়তো বিপিন সকলকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিয়াছে। মাধবীলতার আকর্ষণ।

মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলে বিপিন যে এমন একটা ইঙ্গিত করার সুযোগ পাইবে, এখানে আসিবার আগে সদানন্দের সেটা খেয়াল হয় নাই। যাই হোক, এখন নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথাটা সে ভাবে। মাধবীলতা এখানে আসিবার কয়েকদিন পরে সেও আসিয়া হাজির হইয়াছে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া কলঙ্ক রটানোর পক্ষে এ একটা জোরালো যুক্তিই বটে। ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিলে এই বলিয়া সদানন্দ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় যে, বিপিন কি বলিয়াছে কি বলে নাই না জানিয়া নিজের মনের অনুমান নিয়া বিচলিত হওয়ার কোন কারণ হয় না। হয়তো ক্ষতিকর কিছুই বিপিন বলে নাই, সদানন্দের অন্তর্ধানের একটা সাধারণ ও সঙ্গত কারণই সকলকে জানাইয়াছে। আর যদি সত্য সত্যই তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা বিপিনের জাগিয়া থাকে, তবে হয়তো সেই সঙ্গে একথাও সকলকে জানাইয়া দিয়াছে যে কয়েকদিন পরেই সাধুজী আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

আশ্রমের কেউ না আসুক, আশে পাশের গ্রামের নরনারী দলে দলে সদানন্দকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসে। প্রথমে ঝোঁকের মাথায় সদানন্দ এখানে সকলের কাছে নিজের আশ্রম ত্যাগের ভিতরের ব্যাপারটা ঘোষণা করিয়া ফেলিয়াছিল, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশ

চৌধুরীকে বলিয়া দিয়াছে, কথাটা কয়েকদিন যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়।

—এখন সকলকে জানিও, আমি এমনি কয়েকদিন তোমার এখানে থাকতে এসেছি।

—প্রভু?

সদানন্দ বুঝিতে পারিয়াছে।

—না মিথ্যে কথা তোমায় বলতে বলি নি মহেশ। তোমরা যে জানো আমি কেন আশ্রম ছেড়ে এসেছি একথা অস্বীকার করবে কেন? শুধু বলবে যে কারণটা এখন প্রকাশ করা হবে না।

পরদিন সকালেই দলে দলে দর্শনার্থীর সমাগম ঘটায় মহেশ বারণ না মানিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে ভাবিয়া সদানন্দ প্রথমটা বড়ই রাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরী বলে—আজ্ঞে না, আমি কিছুই বলি নি। আপনি এখানে এসেছেন জেনে সকলে প্রণাম করতে আসছে।

—আমি এখানে এসেছি একথাটাও এত তাড়াতাড়ি নাই বা ছড়িয়ে দিতে মহেশ? দু'দিন একটু শান্তিতে থাকতাম।

—আপনি এসেছেন একথা কি ছড়িয়ে দেবার দরকার হয় প্রভু? মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে যায়। সূর্যকে কি লুকিয়ে রাখা চলে প্রভু! কাল সকালে যখন এলেন, তখনি গাঁয়ের অর্ধেক লোক জেনে গেছে আপনি এসেছেন। কালও অনেকে এসেছিল, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে দিই নি। আজ আসতে বলে দিয়েছিলাম।

সকলে আসে, প্রণাম করিয়া যায় এবং অনেকে প্রণামীও দেয়। মাধবীলতা কাছে উপস্থিত থাকিলে কেউ কেউ কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকে দেখে, কৌতূহলের সঙ্গে মেশানো থাকে ভয়। কে জানে মাধবীলতার সম্বন্ধে তাদের মনে কি কল্পনার ছায়া ভাসিয়া আসিতে সুরু করিয়াছে। মেয়ে দরকার হয় এমন সাধনাও তো সাধু পুরুষেরা করে, শব-সাধনার মত যে সব সাধনার কাল্পনিক বিবরণ শুনিলেই সাধারণ মানুষের রোমাঞ্চ হয়।

প্রণামী নিয়া একটু বিপদ হয়। প্রণামী নেওয়া হইবে কিনা সদানন্দও ঠিক করিতে পারে না, মহেশও ঠিক করিতে পারে না। প্রথমে মুখ খোলে মহেশ।

—কি করব প্রভু?

—তুমি কি বল মহেশ?

—আমার মনে হয় প্রণামী এখন না নেওয়াই ভাল। এখন প্রণামী নিলে যেন নিজের জন্য নেওয়া হবে প্রভু। আশ্রম খোলা হলে তখন আশ্রমের জন্য প্রণামী নিলে দোষের হবে না।

শুনিয়া সদানন্দ ভাবে, মহেশ তবে তাকে দিয়া নুতন একটি আশ্রম খুলিবার কল্পনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে? কে জানে প্রথম হইতেই মনে মনে মহেশের এ মতলব ছিল কি না! হয়তো এ রকম একটা উদ্দেশ্য নিয়াই তাকে বাগানোর জন্য এতকাল মহেশ হাজার অপমান সহিয়াও আশ্রমে যাতায়াত করিয়াছে, অতিভক্তির বন্যায় তাকে ভাসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। প্রথম প্রথম মহেশকে একটু বোকা মনে হইত, কিন্তু এখন সময় সময় তাকে সদানন্দের বিপিনের চেয়েও চালাক মনে হয়।

না, ঠিক বিপিনের চেয়ে চালাক নয়, বিপিনের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে হয়। বিপিনের সঙ্গে মহেশের পার্থক্য এত বেশী প্রকট যে দুজনের বুদ্ধিকে এক শ্রেণীতে ফেলিতে মনে খটকা লাগে। মহেশও হয়তো বিপিনের মতই ভাল উদ্দেশ্যে ভড়ং করে, মিথ্যার আশ্রয় নেয়, মনে মনে ধারণা পোষণ করে যে রোগীকে আর শিশুকে ভুলানোর মত জগতের পীড়িত বয়স্ক শিশুগুলিকেও দরকার মত ভুলাইলে দোষ হয় না, তবু যেন বিপিনের বেলা এসব মনে হয় অন্যায়, কিন্তু মহেশের বেলা অন্যায়ের প্রশ্ন মনেও আসে না।

তবে, একথাও সত্য যে বিপিনের ঘোরপ্যাঁচ বুঝা যায়। উদ্দেশ্য তার অতি মহৎ এটা বুঝা গেলেও প্যাঁচ যে কষিতেছে সে অতি জটিল, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। মহেশের উদ্দেশ্য না বুঝিলেও কখনও জোর করিয়া ভাবা চলে না তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ

আছে, মতলব হাসিল করিবার জন্য তলে তলে সে চালিতেছে চাল।

কেন এমন হয়? দশজনের ভালর জন্য একজনের সর্বনাশ করাটা বিপিন অন্যায় মনে করে না কিন্তু কারও সামান্য একটু ক্ষতি করার চিন্তা মহেশের পক্ষে মনে আনাও সম্ভব নয়, এইজন্য? সদানন্দের মনে হয়, আরও অনেক কারণ আছে। মহেশের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে, বিপিনের যা নাই। বিপিনের মধ্যে এমন কতকগুলি দোষ আছে, মহেশের যা নাই। কিন্তু আসল গুণ বা দোষ, যার শাখা-প্রশাখাই মানুষের মধ্যে ছোট বড় নানা রকম দোষ-গুণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, মানুষের তো দশটা থাকে না? কি সেই গুণ মহেশের এবং কি সেই দোষ বিপিনের অথবা কি সেই দোষের অভাব মহেশের এবং কি সেই গুণের অভাব বিপিনের যার জন্য দুজনের মধ্যে এতখানি পার্থক্য সম্ভব হইয়াছে?

ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ আনমনে বলে—আচ্ছা, এখন তবে প্রণামী নিও না।

মনে হয়, সাধু সদানন্দ যেন মহেশ চৌধুরীকে এই কয়েকটি কথার মধ্যে নূতন একটি আশ্রম খুলিবার অনুমতিই দিয়া ফেলিয়াছে, মহেশ চৌধুরীর মুখখানা আনন্দে এমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

## ১১

দিন কাটিয়া যায়, আশ্রম হইতে বিপিনও আসে না, কোন শিষ্যও আসে না। সদানন্দ আকাশ-পাতাল ভাবে মন খারাপ করিয়া। শিষ্যদের না আসিবার কারণটা যে সদানন্দ মোটামুটি অনুমান করিতে পারে না, তা নয়। বিপিনের কোন কারসাজি আছে নিশ্চয়। কিন্তু আশ্রমে কি এমন ভক্ত তার একজনও নাই বিপিনের কোন কথায় কান না দিয়া যে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসাটা দরকার মনে করে? মুখখানা তার বড় বিমর্ষ দেখায়। কেউ সেটাকে ভাবে গাম্ভীর্য, কেউ মনে করে গভীর চিন্তার ছাপ। যে বুঝিতে পারে সাধু সদানন্দের মুখখানা বিষণ্ণ দেখাইতেছে, সে ভাবে সাধু-সন্ন্যাসী মানুষের আবার মন খারাপ হওয়া কেন? মাধবীলতা মনের দুঃখে মাথা নাড়িয়া ভাবে, নাঃ, লোকটার একটুও মনের জোর নেই।

একদিন রাত্রি আটটার সময় বিনা খবরে রত্নাবলী আসিয়া হাজির হয়। সঙ্গে কেউ নাই। কার একটা মোটা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া একাই এতখানি রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে।

মাধবীলতা চোখ কপালে তুলিয়া বলে—কি করে এলি!

রত্নাবলী হাসিয়া বলে—এলাম।

মাধবীলতা খুঁত খুঁত করিয়া বলে—দিনের বেলা এলেই হত, নয়তো কাউকে সঙ্গে নিয়ে—

—চুপি চুপি এলাম যে লুকিয়ে!

—কেন, লুকিয়ে কেন?

—বিপিনবাবু টের পেলে তাড়িয়ে দেবে না আশ্রম থেকে?

—দেয় দেবে তাড়িয়ে, এখানে এসে থাকবি তুই।

—আহা, সেটা জানতে হবে তো আগে? এখানে থাকতে পাব কিনা না জেনে আগে থেকে ওখানকার আশ্রয়টা তো আর ঘুচিয়ে দিতে পারি না।

রত্নাবলী গোড়া হইতে হাসিতেছিল, এবার হাসিল শশধরের দিকে তাকাইয়া।

ঘরে অনেক লোক, কিছুক্ষণ আগে মহেশ চৌধুরীর চেষ্টায় এ ঘরে বাড়ীর সকলের ঘরোয়া মজলিস বসিয়াছে। হাতে পায়ে ধরিয়া সদানন্দকেও মহেশ এ মজলিসে টানিয়া আনিয়াছে। সতরঞ্চি বিছান প্রকাণ্ড চৌকীতে অন্য সকলে বসিয়াছে, কিন্তু তফাতে অন্য একটি ছোট চৌকীতে ঘরে বোনা সুদৃশ্য আসনে সদানন্দের বসিবার ব্যবস্থা। আশ্রমে সদানন্দের কুটীরে মাঝে মাঝে শিষ্য ও ভক্তদের মজলিসে সদানন্দ উপস্থিত থাকিত, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা, সদানন্দকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, এসব অধিকার ভক্তদের কিছু কিছু থাকিত, তবু সে মজলিসের সঙ্গে এ মজলিসের অনেক তফাৎ। যেটুকু স্বাভাবিক হওয়ার স্বাধীনতা সেখানে সকলকে দেওয়া হইত, সদানন্দের সামনে সেটুকু স্বাধীনতা কাজে লাগানোর সাহস কারও হইত না, সকলে কথা বলিত ভয়ে ভয়ে। এখানে মহেশ নিজেই বাজে গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, রত্নাবলী যখন ঘরে ঢোকে বিভূতি রস দিয়া দেশের কাহিনী বলিতেছে, সকলে মন দিয়া শুনিতেছে তার কথা, সদানন্দের দিকে কারও নজর নাই! বিপিন সদানন্দকে আড়ালে রাখিত তার অসাধারণত্ব অটুট রাখিবার জন্য, মহেশের সব ব্যবস্থাই যেন উল্টা, সে যেন সকলের সামনে টানিয়া আনিয়া সদানন্দের কৃত্রিম অসাধারণত্বের আবরণটি ঘুচাইয়া দিতে চায়। বিভূতির গল্প শুনিতে শুনিতে সদানন্দ এই কথাটাই ভাবিতেছিল। বিভূতির মাও ঘরে আসিয়াছে, ছেলের দুর্দশার রসালো কাহিনী শুনিতে শুনিতে তার চোখ ছলছল করিতেছিল। ঘরে আসে নাই কেবল শশধরের ঘোমটা-টানা বৌ। তবে তার অনুপস্থিতিটা কেউ একবার খেয়াল করিয়াছে কিনা সন্দেহ। বাড়ীর কারও চেতনায় নিজের অস্তিত্বের সাড়া না তুলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার কঠিন সাধনায় বৌটি প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ফেলিয়াছে।

রত্নাবলীর কথার জবাবে মহেশ চৌধুরী বলিল—তুমি তো আমার

মেয়ে, মা ? এখানে থাকতে পাবে কিনা তাতে তো তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নয় মা !

রত্নাবলী এবার হাসিল না।—না না, এমনি কথাটা বলেছিলাম মাধুকে তামাসা করে। থাকতে পাব বৈকি এখানে।

—তুমি এখানে এসে থাকলে আমরা বড় সুখী হব মা।

—আমি তো যখন খুসী আসতে পারি, কেবল উমা মাসীর জন্মে—রত্নাবলী একটু হাসিল।

মহেশ বলিল—প্রভু যখন এখানে আছেন, ওঁকে বললে উনি এসে এখানে থাকতে রাজী হবেন না ?

—মনে তো হয় না। উনি বড় চটেছেন।

রত্নাবলী আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করে নাই। সদানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এবার জিজ্ঞাসা করিল—উমা চটেছে কেন ?

—আজ্ঞে, আপনি সন্ন্যাস ছেড়ে দিলেন বলে।

—সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম ! সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম মানে ?

—সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন নি আপনি ?

—বিপিন বলেছে বুঝি ?

রত্নাবলী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, বলিল—তা ছাড়া সন্ন্যাস না ছাড়লে গেরস্তের বাড়ী তিন রাত্রির বেশী বাস করছেন কি করে !

সদানন্দের তীব্র দৃষ্টিপাতে রত্নাবলী মাথা হেঁট করে, সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। মহেশ চৌধুরী চোখ বুজিয়া হাঁটুতে হাত বুলায়। মাধবীলতা চাহিয়া দেখিতে থাকে সকলের মুখের দিকে।

হঠাৎ সদানন্দ বলিল—তাই বুঝি তুমি আজ আমায় প্রণাম করলে না ?

রত্নাবলী মাথা হেঁট করিয়া রাখিয়াই বলিল—আজ্ঞে না। আমার আজ কাউকে প্রণাম করতে নেই।

—ওঃ !—বলিয়া সদানন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।—আর কি বলেছে বিপিন আমার নামে ?

মহেশ চৌধুরী হাত জোড় করিয়া বলিল—প্রভু ?

সদানন্দ অধীর হইয়া বলিল—না মহেশ, আমায় শুনতে দাও। বলো রতন, বলো আর কি বলেছে বিপিন?

রত্নাবলী বলিল—আমি আর কি বলব, ওতো সবাই জানে।

—তবু তুমিই বল না শুনি।

রত্নাবলী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি জানেন না কিছু?

সদানন্দ বলিল—না। কি জানি না?

—তবে তো সত্যি নয়!—খুব সম্ভব রত্নাবলীর বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায়, কিন্তু সেটা মুখে ভাল করিয়া ধরা পড়ে না, হাসি ছাড়া আর কিছুই রত্নাবলীর মুখে ভাল করিয়া পরিস্ফুট হয় না।—ওমা, আমি তো সত্যি কিনা জানতেই ছুটে এলাম! সত্যি নয় তবে! কি কাণ্ড মা, এঁ্যা! এমন করেও বলতে পারেন বিপিনবাবু!

—কি ছ্যাবলামি করছ রতন? কি সত্যি নয়? কি বলেছে বিপিন?

সদানন্দের ধমকে রত্নাবলী মুষড়াইয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল—আর আমি তা উচ্চারণ করতে পারব না। সত্যি যখন নয়, ছি ছি···

কিন্তু আর কি এখন উচ্চারণ না করিলে চলে? কদিন ধরিয়া আশ্রম আর বিপিনের কথা ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দের মাথা গরম হইয়া গিয়াছে, তার উপর রত্নাবলীর এতক্ষণের ভণিতা! সদানন্দ সিধা হইয়া বসিয়া ডাকে—রতন!—আর সে ডাক শুনিয়া ঘরের সকলের বুক কাঁপিয়া ওঠে।

—আমার দিকে মুখ করে বসো।

রত্নাবলী সদানন্দের দিকে মুখ করিয়া বসে।

—চোখের দিকে তাকাও আমার।

রত্নাবলী সদানন্দের চোখের দিকে তাকায়।

—এইবার বলো।

রত্নাবলী বলে, তবে বলার আগে চোখ নামাইয়া নেয়। প্রথমে আশ্রমে রটিয়াছিল সদানন্দ সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়াছে। তারপর

কয়েকদিন আগে রটিয়াছে, সদানন্দ নাকি মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে। সন্ন্যাস ত্যাগ করার উদ্দেশ্যও তাই। খবরগুলি অবশ্য রত্নাবলী সোজাসুজি বিপিনের কাছে শোনে নাই। তবে আশ্রমে বিপিন ছাড়া এসব খবর আর কে ছড়াইবে ?

আশ্রমের কেউ আসে নাই কেন ? বিপিন একদিন আশ্রমের সকলকে একত্র করিয়া বলিয়া দিয়াছে, যে কারণেই হোক, সদানন্দ যখন কারও কাছে বিদায় না নিয়া আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া উচিত হইবে না। যতই হোক, এতদিন তো সদানন্দ তাদের শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ছিলেন। যুক্তিটার জন্য যত না হোক, বিপিনের হুকুমের বিরুদ্ধে কেউ আসিতে সাহস পায় নাই। বিপিন এইরকম ভাবেই হুকুম দেয়। তা ছাড়া, মনেও সকলের প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। কয়েকজন খুব কাঁদিয়াছে। সদানন্দ সিধা হইয়াই বসিয়া থাকে কিন্তু নিজেকে তার বড়ই দুর্বল অসহায় মনে হইতে থাকে। সে ছাড়া এ জগতে আর সকলেই কি অবস্থা বুঝিয়া হিসাব করিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া নিজের কাজ হাসিল করিয়া চলিতে পারে, সে-ই কেবল সব সময় ঠকিয়া যায়, না পারে গুছাইয়া কোন একটা কাজ করিতে, না পারে নিজেকে বিপদের হাত হইতে বাঁচাইয়া চলিতে ? বিপিন যখন ওদিকে তার নামে নানা কথা রটাইয়া আটঘাট বাঁধিয়া নিতেছে, সে তখন ভাবিতেছে কখন বিপিন আসিবে হাতে-পায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিতে—অনুতপ্ত, লাঞ্ছিত বিপিন। বিপিন যে বলিয়াছিল বাস্তব জগতে তার কোন দাম নাই, কথাটা তো মিথ্যা নয় ! কত হিসাব করিয়া বিপিন কাজ করে, প্রত্যেকটি সুযোগ সুবিধা কিভাবে কাজে লাগায়, সে শুধু বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে। গৃহস্থের বাড়ী তিনরাত্রির বেশী বাস করা যে সন্ন্যাস ত্যাগের কত বড় একটা প্রমাণ সাধারণ মানুষের কাছে, আর এক্ষেত্রে সন্ন্যাস ত্যাগের কারণ হিসাবে মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়ার উদ্দেশ্য যে কত জোরালো সমর্থক যুক্তি, কিছুই বিপিনের ভাবিতে বাকী থাকে নাই। আর এখানে আসিবার পরে

তার শুধু একবার খেয়াল হইয়াছিল মাত্র যে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া বিপিন কুৎসা রটনার সুযোগ পাইবে।

এখন সদানন্দ বুঝিতে পারে, এর চেয়ে কুৎসা রটানো ঢের ভাল ছিল। কারও কারও মনে একটু খটকা লাগিত মাত্র। মহেশ চৌধুরীর এ বাড়িতে আজ কত যুগ ধরিয়া একটি পারিবারিক জীবনের ধারা বহিতেছে, বাড়ীতে গৃহিণী আছে, একটি বৌ আছে, মেয়েরা মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করে, এখানে মাধবীলতা আর সাধু সদানন্দের বাস করাটাই তো নিন্দনীয় হইতে পারে না। মাধবীলতার পিছনে পিছনে সদানন্দও মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইয়াছে, কুৎসার স্বপক্ষে শুধু এই যুক্তি। কিন্তু ও-যুক্তি বাতিল হইয়া যাইত দুদিনে, সদানন্দ যখন ঘোষণা করিয়া দিত আশ্রম সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—অনাচার ও ব্যভিচারে ভরা বিপিনের টাকা রোজগারের উপায় যে আশ্রম! কিন্তু বিপিন তার নিন্দা করে নাই, তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে নাই, কেবল এত বড় সাধু যে সদানন্দ তার সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সংসারী হওয়ার ইচ্ছার জন্য বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। এ গুজবও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যাইবে, কিন্তু লোকের মনে একটা ছাপ থাকিয়াই যাইবে। কত কথাই মনে হইবে লোকের। কেউ কেউ ভাবিবে, কোন কারণে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। কেউ ভাবিবে, বিবাহটা বোধ হয় দরকার হইল না, বিবাহ ছাড়াই—

মাধবীলতা সদানন্দের সম্পত্তি, সদানন্দের কোন রোমাঞ্চকর গোপন সাধনার জন্য মাধবীলতাকে প্রয়োজন হয়, এসব কল্পনাও যে ইতিমধ্যে অনেকের মনে দেখা দিয়াছে আশেপাশের গ্রামে, সে খবরটা সদানন্দ জানিত না। নিজে সাধু বনিয়া থাকিয়া সাধু-সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা যে কি রকম সে বিষয়ে সদানন্দের পরিষ্কার ধারণা নাই। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেও সাধু-সন্ন্যাসীর কিছু আসিয়া যায় না, স্ত্রীও যদি সন্ন্যাসিনী সাজিয়া থাকে। তখন তাকে বলে মাতাজী এবং ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া তার পায়েও প্রণাম

করে। সাধু-সন্ন্যাসীর নামে স্ত্রীলোক সংক্রান্ত কুৎসা বলিয়া কিছু হয় না। সাধু-সন্ন্যাসী তো সামাজিক জীব নয়, সাধারণ মানুষ নয়। তাদের কথাই আলাদা। স্ত্রীলোক ছাড়াও তাদের সাধনা চলে, স্ত্রীলোক নিয়াও সাধনা চলে। যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, যে মুক্ত পুরুষ, তার আবার ব্যভিচার কিসের? কত বদমেজাজী সাধু থাকে, কথায় কথায় রাগে আগুন হইয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়, মারিতে ওঠে—কিন্তু সেজন্য কে মনে করে এই সাধুটি ক্রোধ রিপুর বশ, রিপুই যখন দমন করিতে পারে নাই, এ আবার সাধু কিসের! রাগারাগি গালাগালির জন্যই বরং লোকের ভয়ভক্তি আরও বাড়িয়া যায়। কামও তো একটা তুচ্ছ রিপুমাত্র!

তবে জটা ভস্ম বিবর্জিত, প্রচলিত কুসংস্কার ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রচারকারী আদর্শবাদী সাধু সম্বন্ধে লোকের মনে অনেক রকম খুঁতখুঁতানি থাকে। এসব সাধু চমকপ্রদ কিছু করে না কিনা, ওষুধ দেয় না, রোগ ভাল করে না, মরা মানুষকে বাঁচায় না, ভবিষ্যৎ গুণিয়া দেয় না, বৃষ্টি নামায় না, হিমালয়ের দুর্গম গুহায় দিন-যাপনের কাহিনী শোনায় না, মাটির নিচে কিছুদিনের জীবন্ত সমাধির পর জ্যান্ত হইয়া উঠিয়া আসে না—এক রকম কিছুই করে না। শুধু বলে, এই করো না, ওই করো না।

তবে সদানন্দকে লোকে অবিকল এই ধরণের সাধুর পর্যায়ে ফেলে না। সদানন্দের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি আর কার্যকলাপের বিজ্ঞাপন বিপিন আগে প্রচার করিয়াছিল।

সকলের আগে কথা বলিল মহেশ চৌধুরী।

—বিয়ের কথাটা মিথ্যে নয় মা। তবে বিপিনবাবু একটু ভুল শুনেছেন। মাধুর বিয়ে হবে আমাদের বিভূতির সঙ্গে।

মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের বিবাহের গুজব রটিয়াছে শুনিয়া সকলে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর কথা শুনিয়া চমকাইয়া গেল। সকলে এমনভাবে মুখ ফিরাইল মহেশ চৌধুরীর দিকে যে ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি লাগিল সকলেরই, বিভূতির প্যাট করা

চুলের কিছু অংশ সিঁথির লাইন ডিঙাইয়া ওপাশে চলিয়া গেল। মাধবীলতার কানে বিভূতির মার আদর করিয়া পরাইয়া দেওয়া দুল দুটি কানের সামনে আর পিছনে জোরে জোরে আঘাত করিয়া দুলিতে লাগিল, রত্নাবলীর এলো খোঁপা খুলিয়া গেল।

তারপর খোঁপা ঠিক করিতে করিতে রত্নাবলী বলিল—সত্যি ?

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল—সত্যি বৈ কি মা। এখন একটি শুভদিন দেখে—

—দিন ঠিক হয় নি ?

—বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে আর দিন ঠিক হতে কতক্ষণ লাগে মা ?

অন্য সকলে এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এবার সদানন্দ বলিল—মহেশ ?

—প্রভু ?

সদানন্দ কিছুই বলিল না।

রত্নাবলী বলিল—কিন্তু তুই কি মাধু ? আমায় জানাস নি কিছু ?

মাধবীলতাও কিছু বলিল না।

রত্নাবলী একবার এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া এক রকম টানিতে টানিতেই তাকে সঙ্গে লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তখন বিভূতি গম্ভীর মুখে ডাকিল—বাবা ?

মহেশ চৌধুরী বলিল—বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাও। কিন্তু এখন না-ই বা বললি ? ভেবে চিন্তে কথা বলতে কিছু দোষ আছে ? যদি কিছু বলার থাকে, কাল না হয় পরশু বলিস, কেমন ?

বিভূতি খুব সম্ভব বলার কথাটা ভাবিয়া দেখার বদলে কথাটা এখনই বলিয়া ফেলিবে না ভাবিয়া চিন্তিয়া কাল পরশু বলিবে গম্ভীর মুখে প্রচণ্ডভাবে তাই ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ বলিল—তোমার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না মহেশ ?

—প্রভু ?

মুখখানা একবার একটু বিকৃত করিয়া সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল,

বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল—ঘরে গেলাম মহেশ। ঘণ্টাখানেক পরে একবার শুনে যেও।

মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া বিভূতিও উঠিয়া গেল।

বিভূতির মা তখন বলিল—তুমি আর মেয়ে পেলে না?

—কেন, মাধু তো বেশ মেয়ে।

—আমার অমন ছেলে, তার জন্যে কুড়োনো মেয়ে?

—অন্য মেয়েকে তোমার ছেলে বিয়ে করলে তো! ছাখো, হয়তো শেষ পর্যন্ত না বলে বসবে। কথাটা ভেবে দেখতে রাজী হয়েছে, এইটুকু যা ভরসা। আমি তো ভাবলাম, মুখের উপরেই বুঝি বলে বসে—চোখ বুজিয়া মহেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। পরক্ষণে চোখ মেলিয়া বিভূতির মার ডান হাতটি বুকের উপর রাখিয়া বলিল—এখনো বুক কাঁপছে ছাখো।

রত্নাবলীকে আশ্রমের সীমানা পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে গেল শশধর। এতক্ষণে মাধবীলতা যেন এতরাতে লুকাইয়া রত্নাবলীর একা এখানে আসার কারণটা বুঝিতে পারিল। একা আসিলেও তাকে যে কেউ পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে যাইবে তা কি আর রত্নাবলী জানিত না? এবং সঙ্গে যে যাইবে তার শশধর হইতেই বা বাধা কি?

অন্য সময় মাধবীর মনে ব্যাপারটা পাক খাইয়া বেড়াইত, আজ তার এমন একটা বিষয়েও মাথা ঘামানোর ক্ষমতা ছিল না। কি উদ্ভট মানুষ মহেশ চৌধুরী! কেমন অনায়াসে বলিয়া বসিল বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে! কাউকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করিল না। এক মুহূর্ত আগে এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা কি কারও কল্পনাতে ছিল?

অথবা আগেই কথাটা সকলে আলোচনা করিয়াছিল, সে-ই কিছু জানে না? তাকে না জানাইয়াই সকলে তলে তলে বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে? কিন্তু, তাও কি সম্ভব!

কি হইবে এবার? মহেশ চৌধুরী তো যা মুখে আসিল বলিয়াই খালাস, ফলটা দাঁড়াইবে কি? সদানন্দ কি বলিবে? কি করিবে

সদানন্দ ? সদানন্দের সেদিনকার সেই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাধবী-লতার মনে ভাসিয়া আসিতে থাকে—আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নেই, তোমাকে যে তাহলে দ্বিচারিণী হতে হবে !

সদানন্দের ভয়টাই মাধবীলতার মনে সব চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়। বিভূতিকে বিবাহ করার কথা সে কখনো ভাবে নাই, এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা তার কল্পনাতেও আসে নাই। আজ এ বিষয়ে মাথা ঘামানোই তার পক্ষে উচিত ও স্বাভাবিক ছিল সব চেয়ে বেশী, কিন্তু কথাটা যে বিবেচনা করা দরকার, নিজের মনে তারও যে এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে আজকালের মধ্যে, এটা যেন তার খেয়ালও হইল না। বিভূতির জীবন-সঙ্গিনী হইতে নিজে সে রাজী আছে কি না, নিজেই সে তা এখনো জানে না। তবু সদানন্দ কি ভাবিবে, সদানন্দ কি বলিবে, সদানন্দ কি করিবে কল্পনা করিয়া সর্বাঙ্গে যেন রীতিমত অপরাধমূলক ভয়ের টিপ্‌টিপানি অনুভব করিতে থাকে।

নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া মাধবীলতা ভাবিতেছিল, কে যেন পাশে আসিয়া বসিল সন্তর্পণে, চোরের মত। মুখ ফিরাইয়া মাধবীলতা দেখিল শশধরের স্ত্রী। ঘোমটা কমাইয়া দিয়াছে, তবু কপাল প্রায় সবখানিই ঢাকা।

—দিদি ?

আজ সে প্রথম ঘোমটা কমাইয়া মাধবীলতার সঙ্গে কথা কহিল, এতদিন কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও মাধবীলতা তাকে কথা বলাইতে পারে নাই। হাত দেখিয়াই বোঝা যায় বৌটির রঙ খুব সুন্দর, মুখের রঙ আরও টুকটুকে।

—ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে দিদি ?

এমন সুন্দর মুখের এত আনন্দের কথা কি যে বিশ্রী শুনাইল বলিবার নয়। বৌটি ফোক্‌লা।

সদানন্দ বলে—তবে কি তুমি বলতে চাও, ওদের মধ্যে কোন কথাই হয় নি, বিভূতি আর মাধুর মধ্যে ?

মহেশ বলে—আজ্ঞে না। তবে দুজনে বেশ ভাব হয়েছে সেটা তো বোঝাই যায়।

সদানন্দ বলে—ভাব তো আর প্রণয় নয় মহেশ! দুজনে সর্বদা মেলামেশা করছে, ওদের ভাব হওয়াটা আশ্চর্য কি! কিন্তু বিয়ে হল আলাদা ব্যাপার। সকলের সামনে কথাটা বলার আগে ওদের একবার জিজ্ঞাসা করা তো তোমার উচিত ছিল। আমার সঙ্গেও তো পরামর্শ করতে পারতে একবার?

—সময় পেলাম না যে প্রভু? আপনার নামে অমন একটা কুৎসিত কথা রটেছে শুনে মনে হল, বিয়ে যখন এদের হবেই, আর দেরী না করে মেয়েটিকে কথাটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। মাধুর সম্পর্কে আপনার নামে আর কোন কথাই তাহলে উঠতে পাবে না।

—বিয়ে যখন ওদের হবেই মানে?

—আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে বিয়েটা ওদের নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে প্রভু। ছেলেটার মাথাও একটু ঠাণ্ডা হবে, মেয়েটাও সুখী হবে।

শুনিলে মনে হয় না, বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহ যে হইবেই সে বিষয়ে মহেশ চৌধুরীর কিছুমাত্র সন্দেহ আছে। কারও মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কারও সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই, যাদের বিবাহ দুঘণ্টা আগেও তাদের ইঙ্গিতেও ব্যাপারটা জানানো হয় নাই, তবু যেন মহেশ চৌধুরী জানে এ বিবাহ হইয়া যাইবে। রাগে সদানন্দের গা যেন জ্বলিয়া যায়। একটু ভয়ও হয়। মহেশ চৌধুরীর একগুঁয়েমির কিছু কিছু পরিচয় সে পাইয়াছে।

—জানো মহেশ, তোমার ব্যাপার ভাল বুঝতে পারছি না। বিভূতির একটা বিয়ে দিতে চাও, ভাল কথা। কিন্তু মাধুর সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে? মাধু আশ্রমে এসেছে, সংসার ওর ভাল লাগে নি বলে, সেবা আর আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ওর জীবনটা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা। আমি ওকে দীক্ষা দেব, নিজে ওকে সাধনপথে চালিয়ে নিয়ে যাব। ওর বিয়ের প্রশ্নই তো উঠতে পারে না।

—প্রভু?

—তুমি বুঝতে পার না মহেশ, ও মেয়েটির মধ্যে খাঁটি জিনিষ আছে? আমি কি সাধে ওকে বেছে নিয়েছি। একদিন ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে, হাজার হাজার মানুষের জীবনে একদিন ও সুখ-শান্তি এনে দেবে। এমন একটা খাঁটি জিনিষ নষ্ট হতে দেওয়া যায়!

—প্রভু?

—বল না, কি বলতে চাও? আলোচনা করবার জন্যই তো ডেকেছি তোমায়।

—বিয়ে না হলে মেয়েটির মন শান্ত হবে না, প্রভু। বিয়ের জন্য মেয়েটি ছটফট করছে।

সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলে—তোমায় বলেছে নাকি, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে দিন, বিয়ের জন্য আমি ছটফট করছি মহেশবাবু?

মহেশ হাত জোড় করিয়া বলে—আপনার তো অজানা কিছু নেই প্রভু! কেন মনে কষ্ট দিচ্ছেন আমার? কোন মেয়েই অমন করে বলেও না, পারেও না। কিন্তু মেয়েমানুষের মন কি বোঝা যায় না? রাজা-সায়েবের ছেলে তো ওকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে বার করে এনেছিল।

—ছেলেমানুষ হঠাৎ একদিন মনের ভুলে কি করেছিল—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। নইলে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইতাম? বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছা মেয়েটির মনে প্রবল।

—কিন্তু মহেশ—

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। বিয়েটা হয়ে যাক, দুজনকেই আপনি দীক্ষা দিয়ে পায়ের তলে আশ্রয় দেবেন। যেমন চান তেমনি করে গড়ে তুলবেন দুজনকে। আপনার কাজে দুজনে জীবন উৎসর্গ করবে। ওরা তো আপনারই সন্তান প্রভু?

সদানন্দের মনে হয়, মহেশ যেন তাকে ভক্তি-মাখা চাবুক মারিয়াছে।

এ বিষয়ে বিভূতি সত্যই বড় ছেলেমানুষ—বিবাহ করার বিষয়ে। এতটুকু অভিজ্ঞতা নাই। মেয়েদের সম্বন্ধে কোনদিন সে যে মাথা ঘামায় নাই তা নয়, তবে সেটা খুবই কম। অস্পষ্ট একটা ধারণা তার মনে আছে যে, দেখিলেই ভাল লাগে এমন চেহারার আর মিশিলেই মিষ্টি লাগে এমন স্বভাবের একটি চালাকচতুর চটপটে মেয়ের সঙ্গে একদিন না একদিন প্রেম তার হইবেই, বাস্, তারপরেই মালাবদল। কিন্তু মাধবীলতা কি তার কল্পনার সেই মেয়ে? দুদিন ভাবিয়া বাপকে একটা জবাব দিবে বলিয়াছিল, সাতদিন ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিল না। তারপর মনে হইল, মাধবীলতার সঙ্গে পরামর্শ করিলে দোষ কি?

মাধবীলতা সোজাসুজি জবাব দিল—আমি কি জানি।

অর্থাৎ মাধবীলতার আপত্তি নাই। মনে মনে বড় অভিমান হয় মাধবীলতার, তাকে জিজ্ঞাসা করা কেন, কি করা উচিত? ইচ্ছা না থাকে, বাতিল করিয়া দিলেই হয়! সে তো আর পায়ে ধরিয়া সাধে নাই!

সদানন্দ অনেকবার মাধবীলতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, সে যায় নাই। কি করিবে গিয়া? সদানন্দ কি বলিবে সে ভাল করিয়াই জানে। আর ওসব কথা শুনিবার সাধ মাধবীলতার নাই। নিজে সে অনেক ভাবিয়াছে—এখনো ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে মাথার মধ্যে যখন একটা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, মনে হয় মাথার ঘিলুগুলি গলিয়া গলিয়া তালুর কাছ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে (মোমের মত), তখন হঠাৎ একসময় দু কানে তার তালা লাগিয়া গিয়া সমস্ত জগৎ বদলাইয়া যায়। স্তব্ধ ও শান্ত চারিদিক। ভাবনার তো কিছু নাই? আত্মগ্লানির কোন কারণ তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? সব ভাল, সব মিষ্টি, সব সুন্দর।

জীবনে সুখী হওয়ার পথে একটা বাধাও আর নাই। কত আনন্দ জীবনে। আপসোস শুধু এই যে সে জানে, আবার গোড়া হইতে সব সুরু হইবে, দুর্ভাবনা, অস্বস্তিবোধ, আত্মগ্লানি আর মাথার অনির্দিষ্ট দুর্বোধ্য যাতনা। প্রথমে সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়া বাড়িতে বাড়িতে কয়েকদিনে উঠিয়া যাইবে চরমে, তখন আবার দু কানে তালা লাগিয়া পাওয়া যাইবে শান্তি ও স্তব্ধতা। ব্যাপারটা মাধবীলতা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এ কি কোন অসুখ? মাথার অসুখ? পাগল-টাগল হইয়া যাইবে না তো?

সদানন্দ একদিন বিভূতিকে দিয়াই তাকে ডাকিয়া পাঠাইল। মাধবীলতা নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল—যাব?

—যাবে বৈকি, বাঃ রে!

—একা একা যেতে আমার কেমন ভয় করে।

—ভয় আবার কিসের?

সদানন্দের সামনে নিজেকে মাধবীলতার সত্যই কেমন যেন পুতুলের মত অসহায় মনে হয়। তাকে নিয়া যা খুসী করার ক্ষমতা যেন এই লোকটির কেমন করিয়া জন্মিয়া গিয়াছে।

—আমাকে একেবারে ত্যাগ করে দিলে মাধু?

মাধবীলতা পুতুলের মতই চাহিয়া থাকে। এই তো সবে আরম্ভ, আরও কত কথা সদানন্দ বলিবে! কিন্তু সদানন্দও কথা না বলিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া খানিক পরে সে সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া যায়। তখন মাধবীলতা মাথা নিচু করে, অনেক ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলে —আপনি যদি বারণ করেন—

সদানন্দ ভাবিতেছিল সেদিনকার কথা, আঙ্গুলগুলিকে সেদিন পাখীর পালকের চেয়ে কোমল করিয়া মাধবীলতার গায়ে বুলাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। আজ মারিতে ইচ্ছা হইতেছে। এমন কোমল, এমন মোলায়েম গা মাধবীলতার, দেখিলেই মনে হয় চামড়ার উপর বুঝি আর একটা অপার্থিব আবরণ আছে (এটা সদানন্দ অনেকবার কল্পনা করিয়াছে), আগে স্পর্শ করিবার কল্পনাতেই রোমাঞ্চ হইত,

আজ কাটিয়া ছিঁড়িয়া রক্তপাত করিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইচ্ছা হইতে হইতে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া সদানন্দ দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া দেয়। সত্যই কি মাধবীলতার শরীরটা সে ছিঁড়িয়া ফেলিবে না কি? চোখ দেখিয়া মাধবীলতার সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসে। পাগল না হইয়া গেলে কি মানুষের এমন চোখ হয়? কি করিবে সদানন্দ? খুন-টুন করিয়া ফেলিবে না তো?

কাছেই বসে সদানন্দ, ডান হাতে শক্ত করিয়া তার বাঁ হাতের কব্জির কাছে চাপিয়া ধরে। মায়া-মমতা যে আজ সদানন্দের মনে এক ফোঁটা নাই, রাগে দুঃখে অপমানে মানুষটা গরগর করিতেছে, মাধবীলতা অনেক আগেই সেটা টের পাইয়াছিল। এতক্ষণে সে বুঝিতে পারে, ভয়ঙ্কর একটা আঘাতে দেহে মনে তাকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করিয়া দিবার সাধটাই সদানন্দের মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এতদিন মনে মনে সদানন্দ কি ভাবিয়াছে কে জানে, হয়তো এই রকম একটা কল্পনাই মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়াছে। আজ আর কোন রকমেই ঠেকানো যাইবে না। গলা টিপিয়া তাকে মারিয়া ফেলাও সদানন্দের পক্ষে আজ আশ্চর্য নয়। মাধবীলতা জানে বাঁ হাতের কব্জিটা তার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাথার মধ্যে এমন ঝিম্‌-ঝিম্‌ করিতেছে যে ব্যথাটা ভাল রকম অনুভব করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বিস্ফারিত চোখ দুটি সদানন্দের চোখের সঙ্গে মিলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে মাধবীলতা জ্ঞান হারাইয়া সদানন্দের গায়েই ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

ঘরেই কুঁজায় জল ছিল, মাথায় খানিকটা জল চাপড়াইয়া দিয়া সদানন্দ দরজা জানালা খুলিয়া দিল। খানিক তফাতে হাত গুটাইয়া বসিয়া বিড়বিড় বকিতে লাগিল। বোধ হয়, আত্মরক্ষার এতবড় অস্ত্র আয়ত্ত করিয়া রাখার জন্য মাধবীলতাকে গালাগালি।

মাধবীলতার জ্ঞান হওয়ার পর সদানন্দ উদাস ভাবে বলিল—আচ্ছা তুমি যাও মাধু।

—আপনি কি করলেন আমার ?

—কিছুই করি নি।

মাধবীলতা সে কথা বিশ্বাস করিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। গেল একেবারে বিভূতির কাছে। নালিশ যদি করিতে হয়, হবু স্বামীর কাছে করাই ভাল।

বিভূতি শুনিয়া অবাক।

—অপমান করছেন ? কি অপমান করেছেন স্বামীজি তোমাকে ?

মাথার মধ্যে কতকগুলো বড় অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলিতেছিল মাধবীলতার, স্থান ও কালের কতকগুলি নিয়ম যেন ঢিল হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে, অথচ ঠিক যেন মাথার মধ্যেও নয়, মাথার পিছন দিকে একটা বাড়তি অঙ্গ আছে, সেইখানে কত কি জিনিষ একসঙ্গে সরু আর মোটা হইয়া যাইতেছে, কয়েকদিন পরে পরে কানে যে তার তালা লাগে সেই বীভৎস স্তব্ধতা সর্বব্যাপী আলোড়নের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া এমন একটা এলোমেলো গতি লাভ করিয়াছে যা চোখে দেখা যায়, আর এমন একটা অকথ্য ভয় ( অনির্দিষ্ট ভয়ের যে এমন একটা অবর্ণনীয় রূপ থাকে মাধবীলতার জানা ছিল না )—ব্যাপারটা বুঝিবারও নয়, বুঝাইবারও নয়। অথচ মস্তিষ্কের সাধারণ অংশটা এদিকে বেশ কাজ করিতেছে। সমস্ত ঘটনাটা অনায়াসে গড়গড় করিয়া সে বিভূতিকে বলিয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া হাত ধরিয়া টানিবার সময় ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায় আজ কি ভাবে রাক্ষসটার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

—তুমি যদি এর প্রতিকার না কর—

বিভূতির বুকে মুখ গুঁজিয়া দিয়া মাধবালতা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিভূতি কথা বলে না দেখিয়া খানিক পরে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই সে চমকাইয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিবার সময় সদানন্দের মুখ যেমন হইয়াছিল, বিভূতির মুখও তেমনি দেখাইতেছে।

—একটু বোসো, আমি আসছি।

মাধবীলতা সভয়ে তার হাত চাপিয়া ধরিল—কি করবে? থাকগে, কিছু করে কাজ নেই। যা হবার তাতো হলই—

কিন্তু আর কি বিভূতিকে আটকানো যায়? হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া গেল। সদানন্দের ঘরে গিয়া সদানন্দের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—মাধুর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার মানে?

—ছাখো বিভূতি, তুমি ছেলেমানুষ—

বাকী কথাগুলি সে বলিয়া উঠিতে পারিল না, বিভূতির ঘুঁষিতে নাকটা ছেঁচিয়া গেল। বিভূতি আরও মারিত, কিন্তু পিছন হইতে মহেশ তাকে জড়াইয়া ধরায় আর কিছু করিতে পারিল না।

—ছেড়ে দাও বাবা, বজ্জাতটাকে আমি খুন করব।

—ছি বিভূতি, ছি!

—আমাকে ছি করছ? জানো ও কি করেছে?

—জানি বৈকি।

—জানো?—বিভূতি এতক্ষণ ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছিল এবার স্তব্ধ হইয়া গেল।

নাক দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে, সেবা বেশীর ভাগ করিল শশধরের বৌ। কখন কোন ফাঁকে সে যে আসিয়া জুটিয়াছিল কেউ টেরও পায় নাই। বিভূতি একদিকে ছোট একটা টুলে বসিয়া ব্যাপার দেখিতেছিল আর থাকিয়া থাকিয়া মুখ বাঁকাইতেছিল। এখনও তার রাগ কমে নাই, বেশ বুঝা যায় একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্যই সে বসিয়া আছে। মাঝখানে একবার সে একটা মন্তব্য করিতে গিয়াছিল, মহেশ হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—দোহাই তোর, একটু থাম।—তারপর হইতে সে চুপ করিয়া আছে।

বুঝা যায়, মহেশ ভাবিতেছে।

ভাবিবার কি আছে বিভূতি বুঝিতে পারে না। তার বিরক্তির সীমা থাকে না। মহেশ যদি সব জানেই, তবে আর এই পাষণ্ড সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করিতে তো একমুহূর্ত্ত দেরী হওয়া উচিত নয়। এত সেবা-ধত্নই বা কি জন্য? ঘাড় ধরিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেই হয়।

সদানন্দ একটু সুস্থ হইলে মহেশ বলিল—বিভূতি, বড় ঘরের রোয়াকে ভাঙ্গা কাঠের বাক্সটা আছে না, তার থেকে বড় হাতুড়িটা নিয়ে আসবি ?

—হাতুড়ি দিয়ে কি করবে ?

—একটু কাজ আছে।

বিভূতি হাতুড়ি আনিয়া দিল। লোহায় মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। হাতুড়ি হাতে করিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল—প্রভু, আমার ছেলের হয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি। ছেলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করবে না, ওকে বলা বৃথা। ছেলের হয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি, আপনি তাই মঞ্জুর করুন।—

বলিতে বলিতে মহেশ চৌধুরী করিল কি, হাতুড়িটা দিয়া নিজের নাকের উপর সজোরে মারিয়া বসিল। সকলে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কেবল শশধরের বৌ আবার সেবা আরম্ভ করিয়া দিল মহেশের। সে যেন এইরকম একটা কাণ্ড ঘটিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সদানন্দের চেয়ে মহেশের যে জোরে লাগিয়াছিল তাতে সন্দেহ নাই, রক্ত আর বন্ধ হইতে চায় না। মহেশের বারণ না মানিয়া বিভূতি পাড়ার সুবিমল ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। ডাক্তার আসিয়া কিন্তু করিতে পারিল না কিছুই, থেঁতলা নাকটা পরীক্ষা পর্যন্ত নয়। মহেশ তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অতিকষ্টে খোনাসুরে বলিল—না না, আমার কর্মভোগ আমায় ভোগ করতে দিন।

সুবিমল ডাক্তারের কাছে পাড়ার লোক জানিতে পারিল, সাধু সদানন্দ আর মহেশ চৌধুরীর মধ্যে ভয়ানক রকমের একটা হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। দুজনেই দারুন আহত। মহেশ চৌধুরীর এখন ভয়ানক অনুতাপ হইয়াছে, বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যাইতে চায়।

হাতাহাতি হইল কেন ? প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি ! ও রকম তো ওদের মধ্যে লাগিয়াই আছে। অন্যদিন কথা কাটাকাটির মধ্যেই সমাপ্তি হয়, আজ হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াইয়াছে।

কথাটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত রূপ নিল অন্যরকম। ঘটনাটা অপরাহ্ণের, সন্ধ্যার পর অনেকে খবর জানিতে আসিল। সদানন্দ তখন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, তার দেখা কেউ পাইল না। মহেশ চৌধুরীর সমস্ত মুখটাই ফুলিয়া গিয়াছে, কথা বলিতেও কষ্ট হয়। তবু সে-ই সংক্ষেপে ব্যাপারটা সকলকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল। গোঁয়ার-গোবিন্দ একটা ছেলে আছে তার সকলে জানে তো? একটা ভুল বোঝার দরুন হঠাৎ রাগের মাথায় সে সদানন্দকে অপমান করিয়া বসে। ছেলের হইয়া মহেশ চৌধুরী তাই শাস্তি গ্রহণ করিয়াছে।

রসিক ভট্চায মহেশ চৌধুরীর বন্ধু। সে বলিল—তুমি কি উন্মাদ মহেশ?

কাল পরশু তোমার সঙ্গে ও বিষয়ে তর্ক করা যাবে, কেমন? —বলিয়া মহেশ চৌধুরী শয়ন করিতে ভিতরে গেল।

যে দশ-বারজন উৎসাহী ও কৌতূহলী পরিচিত লোকের কাছে মহেশ চৌধুরী কথাগুলি বলিল—তারা তখন ডাকাইয়া আনিল বিভূতিকে। কি হইয়াছিল? সদানন্দকে সে কি অপমান করিয়াছিল? কেন অপমান করিয়াছিল? কি দিয়া সদানন্দ মহেশ চৌধুরীকে আঘাত করিয়াছে?

কিন্তু বিভূতি তেমন ছেলেই নয়, সে সংক্ষেপে শুধু বলিল—আমি কিছু জানি না। আপনারা এবার যান তো।

সকলে দয়া করিয়া তার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়াছে, সকলকে বসাইয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইতে মহেশ চৌধুরীর কত সঙ্কোচ, কত আপসোস! আর তার ছেলে কিনা সোজাসুজি সকলকে বিদায় করিয়া দিল! ছেলেটা সত্যই গোঁয়ার।

পরদিন অনেক দূরের গ্রামে পর্যন্ত রটিয়া গেল, ছেলেটাকে বাঁচাইতে গিয়া মহেশ চৌধুরী সদানন্দের হাতে ভয়ানক মার খাইয়াছে। একটি টুঁ শব্দও করে নাই মহেশ চৌধুরী। সদানন্দ মার বন্ধ করিলে রক্তাক্ত শরীরে সদানন্দের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া ছেলের হাত ধরিয়া

ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু মহেশ চৌধুরী বলিয়াছে—প্রভুর প্রহারের চিকিৎসা—ছি!

শেষ-কথাটাতে সকলে যে কি মুগ্ধ হইয়া গেল বলিবার নয়। এমন ভক্তি মহেশ চৌধুরীর যে মার খাইয়া মরিতে বসিয়াছে তবু চিকিৎসা করিবে না—গুরু মারিয়াছে বলিয়া! সকলের কানে যেন বাজিল—মারলি মারলি কলসীকাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।

না জানি কতবড় মহাপুরুষ সদানন্দ যার জন্য মহেশ চৌধুরীর এমন অলৌকিক ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছে, এমন মহৎ প্রেরণা আসিয়াছে। সদানন্দের উপর মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন সভয় বিস্ময়ে হু হু করিয়া বাড়িয়া গেল। অনেকের মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ হয়তো মানুষ নয়, মানুষের রূপধারী—

ফিস্ ফিস্ করিয়া অন্তরঙ্গ মানুষের কানে কানেই শুধু কথাটা বলা যায়। কয়েকটি ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতরে, গেঁয়ো পথের ধারে কয়েকটি জমকাল গাছের ছায়ায় দেবতার অবির্ভাবের কথাটা কানাকানি হয়। অকাল বার্ধক্যের ছাপমারা কয়েকটি ক্লিষ্ট মুখে উত্তেজিত আনন্দের বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটে।

কয়েকটা দিন একরকম একা একা ঘরের কোণে কাটাইয়া দিবার পর সদানন্দই প্রথম কথাটা পাড়ে। বলে—আমি বরং কোথাও চলে যাই মহেশ।

মহেশ চৌধুরী বলে—আর ও কথা কেন প্রভু! সেদিন তো ক্ষমা করেছেন, ও ব্যাপার তো চুকে গেছে!

—চুকে গেছে বললেই কি সব ব্যাপার চুকে যায় মহেশ?

—আজ্ঞে তা যায় বৈকি। আমরা এখন ভাবব ও ঘটনাটা যেন ঘটেই নি, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলব। মনের বাইরে তো কোন কিছুর জের চলতে পারে না প্রভু।

মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরী এমনভাবে কথা বলে—মনে হয় ঠিক যেন সদানন্দকে উপদেশ দিতেছে। প্রথম প্রথম সদানন্দ অতটা খেয়াল করিত না, আজকাল মন দিয়া শোনে। উপদেশের মতই,

কথাগুলি সে গ্রহণ করে এবং পালন করিবার চেষ্টাও করে। মহেশ চৌধুরীর এখনকার উপদেশ, সেদিনকার ব্যাপারটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কথায় ব্যবহারে এমন ভাব দেখাইতে হইবে যেন কিছুই ঘটে নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ সেই চেষ্টাই করে। কয়েকদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণভাবে ঘরের কোণায় কাটাইবার পর হঠাৎ সেদিন হাসিমুখে গিয়া হাজির হয় সান্ধ্য-মজলিসে।

সকলেই উপস্থিত আছে। বিভূতি এবং মাধবীলতাও। প্রথমটা সদানন্দের ভয় হয়, বিভূতি হয়তো রাগ করিয়া উঠিয়া যাইবে, হয়তো একটা কেলেঙ্কারী করিয়া বসিবে। মাধবীলতা হয়তো তেমন কিছু করিবে না, সে সাহস তার নাই, কিন্তু কথায় ব্যবহারে সহজ ভাব কি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে মেয়েটা ? মহেশ চৌধুরী তো বলিয়া খালাস, সব চুকিয়া-বুকিয়া গিয়াছে, কিন্তু ওদের দুজনের পক্ষে কি চুকিয়া-বুকিয়া যাওয়া সম্ভব ?

কিছুক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সদানন্দ বুঝিতে পারে, ব্যাপারটা সত্যসত্যই সকলে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে—যতটা মুছিয়া ফেলা সম্ভব। বিভূতি আর মাধবীলতা যে একটু সঙ্কোচ আর অস্বস্তি বোধ করিতেছে প্রথমদিকে এটা পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে দুজনেই অন্যদিনের মত সহজভাবে সকলের হাসি গল্পে যোগ দিয়াছে।

সদানন্দের খুসী হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু মনটা তার হঠাৎ বড় খারাপ হইয়া গেল। আর একবার সে যেন মহেশ চৌধুরীর কাছে হারিয়া গিয়াছে। অতি শোচনীয় কুৎসিত পরাজয়। সেদিনকার ব্যাপারে মহেশ চৌধুরীর কাছে সে যে ছোট হইয়া গিয়াছে আজ এই সান্ধ্য-মজলিসে আসিয়া প্রথম সেটা সদানন্দের খেয়াল হইল।

তার মনে হইতে লাগিল, এই উদ্দেশ্যই ছিল মহেশ চৌধুরীর, তাকে হীন করার জন্যই সে হাতুড়ি দিয়া সেদিন নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল। এখনো মহেশ চৌধুরীর মুখ অল্প অল্প ফুলিয়া আছে— কি সাংঘাতিক মানুষ মহেশ চৌধুরী!

যাই হোক, একদিন যথারীতি বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহটা হইয়া গেল। প্রকাশ্য জীবনটা যেমন কাটিতেছিল প্রায় সেই রকমই কাটিতে লাগিল দুজনের, বেশভূষার কিছু পরিবর্তন দেখা গেল মাধবীলতার এবং চেহারাটাও যেন তার বদলাইয়া যাইতে লাগিল। এমন পরিবর্তন যে দেখিলে মনে প্রশ্ন জাগে, এতদিন কি অসুখী ছিল মেয়েটা, এবার সুখী হইতে আরম্ভ করিয়াছে?

বিবাহে বিপিন আসিয়াছিল, পরে আরেক দিন আসিল। সে অনেকক্ষণ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া গেল—সদানন্দ ছাড়া। আমল দিলে সদানন্দের সঙ্গেও হয়তো সে ভাব জমাইয়া যাইত—শত্রুতা ভুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজনে মানুষ মানুষের সঙ্গে যে রকম ভাব জমায়। মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে কেন্দ্র করিয়া নতুন একটি আশ্রম খুলিতেছে এ খবরটা বিপিন পাইয়াছিল কিন্তু রাগ দুঃখ বা হিংসার বদলে তার উৎসাহই দেখা গেল বেশী। নিজেই কথা তুলিয়া সে মহেশ চৌধুরীকে বলিয়া গেল যে, রেশারেশির আশঙ্কা করিবার কোন কারণই অনুমান করা যায় না, বিপিন আর মহেশের আশ্রমের উদ্দেশ্য হইবে সম্পূর্ণ পৃথক।

—আপনার আশ্রমের উদ্দেশ্যটা কি বিপিনবাবু?

প্রশ্নটা অসঙ্গত। এতকাল যে আশ্রম চলিতেছে, চারিদিকে যে আশ্রমের বেশ নামও একটু আছে, তার মালিককে বাড়ীতে পাইয়া একেবারে আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ রকম একটা প্রশ্ন না করিলেই ভাল হইত। মহেশ চৌধুরীকে বিপিন কোনদিন পছন্দ করিত না, আশ্রমে লোকটাকে সে চিরদিন দমাইয়া রাখিবার চেষ্টাই করিয়াছে, এখন হঠাৎ অতীতের কথা ভুলিয়া বাড়ী বহিয়া আসিয়া এ রকম খাতির জমানোর চেষ্টাতেই মহেশের কৃতার্থ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। আশ্রমের উদ্দেশ্য? কে না জানে বিপিনের আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা! জিজ্ঞাসা করাটাই বাহুল্য।

বিপিনের কোন জবাব না পাইয়া মহেশ চৌধুরী আবার বলিয়াছিল, —সত্যি কথাটা বলি, এতকাল আপনার আশ্রমে যাতায়াত করছি কিন্তু উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারি নি। প্রভু যতকাল ছিলেন ততকাল তবু একটা কারণ ছিল, ওঁর জন্যে—

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল—প্রভুই বটেন!

মহেশ চৌধুরী দুই কানে আঙুল দিয়া বলিয়াছিল—ছি বিপিনবাবু, ছি!

তবু তো সর্বজনবিদিত আশ্রমের উদ্দেশ্যটা বিপিন পর্যন্ত মহেশকে ঠিক ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিল না। নিজের মনেও তার ধারণা ছিল কথাটা অত্যন্ত সহজ ও সরল। বলার সময় দেশ, সমাজ ও ধর্মের মধ্যে বক্তব্যটা দিশেহারা হইয়া গেল। দেশ, সমাজ ও ধর্মের কল্যাণ তো বটেই, কিন্তু কোন দিকে, কি ভাবে?

—আহা, আশ্রমে কি হয় না হয় সে তো আপনার জানাই আছে।

মহেশ চৌধুরী সবিস্ময়ে বলিয়াছিল—কিন্তু আশ্রমে তো আপনার একরকম কিছুই হয় না? ভাল একটা যায়গা দেখে কয়েকজন লোককে শুধু থাকতে দিয়েছেন। প্রভু যখন ছিলেন তখন তবু মাঝে মাঝে দশজন এসে সদুপদেশ শোনবার সুযোগ পেত, এখন—

—এখনও পায়।

—কে বলেন?

—আমি বলি। আশ্রমে যাঁরা আছেন, তাঁরাও বলেন।

—লোকজন আসে?—মহেশ চৌধুরী সন্দিগ্ধ ভাবে বলিয়াছিল—শুনলাম লোকজনের আসা অনেক কমে গেছে?

মহেশ চৌধুরীর আশ্রম স্থাপিত হওয়ার পর বিপিনের আশ্রমে লোকজনের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল—একরকম বন্ধই হইয়া গেল বলা চলে। নূতন আশ্রমের উদ্বোধন উৎসবটা হইল বেশ জমকাল। সহর হইতে দু-চারজন নামকরা লোক আসিল, খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণও বাহির হইল। বিপিনের আশ্রমে যারা সদানন্দের উপদেশ শুনিতে যাইত তারা সকলে তো আসিলই, কাছে ও দূরের

আরও অনেক গ্রামের নারী পুরুষ ছেলেমেয়ের আবির্ভাবও ঘটিল। ভিড় হইল ছোটখাট একটি মেলার মত। তার উপর আবার ছিল কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থা। কদিন ছোটখাট গ্রামটির উপর দিয়া যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গেল তা সত্যই অভূতপূর্ব। উৎসব শেষ হইয়া গেল, দূরের যারা আসিয়াছিল সকলেই প্রায় ফিরিয়া গেল, আশ্রমের চিহ্ন হিসাবে খাড়া রহিল কেবল মহেশ চৌধুরীর বাড়ীর পাশে বাগানের পিছনের মাঠে মস্ত একটা নতুন চালা আর বাগানের বাঁশের গেটের উপরে একটুকরা আলকাতরা মাখানো চারকোণা কাঠে সাদা অক্ষরে লেখা—'শ্রীশ্রীসদানন্দ স্বামীর আশ্রম'। নতুন আশ্রমে মানুষের ভিড় কিন্তু কমিল না, মানুষের মুখে নতুন আশ্রমের আলোচনাও থামিল না। প্রত্যেক দিন দলে দলে লোক আসিয়া নতুন চালার নিচে বসে, মহেশ চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও সদানন্দের বিস্তারিত উপদেশ শোনে, দলে দলে সদানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সদানন্দ যতদিন বিপিনের কাছে ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে তার শিষ্যত্ব লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, অনেক বাছাবাছির পর বিপিন কদাচিৎ যাকে উপযুক্ত মনে করিত তাকেই কেবল সদানন্দ শিষ্য করিত। এখানে সব বাছবিচার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে আসে তাকেই সদানন্দ আলিঙ্গন দেয়।

আলিঙ্গনটাই শিষ্যের দীক্ষা। এখানে মহেশ চৌধুরীর পরামর্শে অথবা অনুরোধে এই নতুন প্রথায় দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের জন্য ব্যবস্থাটা অবশ্য অন্য রকম, দু পায়ের পাতার উপর মেয়েরা মাথা নামাইলে সদানন্দ মাথার উপর দুটি হাত রাখিয়া তাদের শিষ্যত্ব দান করে। বিভূতি আশ্রমের ম্যানেজার। প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো খাতায় সে সকলের নাম, ঠিকানা এবং প্রণামীর পরিমাণটা লিখিয়া রাখে।

মন্ত্রশিষ্যও করা হয় কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। মন্ত্রের জন্য বিশেষ ভাবে যারা আবেদন করে ও আগ্রহ জানায় কেবল তাদেরই কানে সদানন্দ মন্ত্রদান করে।

মহেশ চৌধুরীই একদিন সবিনয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া সদানন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—প্রভু, গুরু অনেকের আছে, গুরু ত্যাগ করাটা ঠিক উচিত কাজ হয় না। মন্ত্র দেওয়া তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু মন্ত্র নিয়ে শিষ্য হবার নিয়ম করলে যারা আগেই মন্ত্র নিয়েছে তাদের বড় মুস্কিল হবে। এমনি শিষ্য হতে দোষ নেই, উপদেশ শুনবে, সাধন ভজন পূজা অর্চনার নিয়মকানুন জেনে যাবে, সৎকাজে যোগ দেবে, আশ্রমের নিজের লোক হয়ে থাকবে, তাই যথেষ্ট। এ ভাবে শিষ্য করলে কারও আশ্রমে যোগ দিতে কোন অসুবিধা থাকবে না।

সদানন্দ একটু খুঁত খুঁত করিয়া বলিয়াছিল—কিন্তু নির্বিচারে সকলকে—

মহেশ চৌধুরী বলিয়াছিল—বেশী বাছাবাছি করে লাভ কি প্রভু? সবাইকে নিলে আমাদের ক্ষতিও কিছু নেই। ফাঁকিবাজ বাজে লোক হয়, খাতায় শুধু তার নামটা থাকবে। শিষ্য হলেও শিষ্য হয়েছে বলেই বিশেষ কোন অধিকারও দেওয়া হবে না যে ক্ষতি করবার সুবিধা পাবে। ক্ষতি করার ইচ্ছা যদি কারও থাকে, শিষ্য হিসাবে খাতায় নাম উঠলেও যতটা সুযোগ পাবে শিষ্য না হয়েও ততটা সুযোগ পাবে।

শুনিতে শুনিতে সদানন্দের মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরী বুঝি তাকে আশ্রম পরিচালনার কায়দা কানুন শিখাইয়া দিতেছে—গুরু যেমন শিষ্যকে শিখায়। মহেশ চৌধুরীর মুখে বিনয় ও ভক্তির স্থায়ী ছাপ থাকে, জোড় হাতে দেবপূজার মন্ত্রোচ্চারণের মত করিয়া সে কথা বলে, তবু আজকাল প্রায়ই সদানন্দের এ রকম মনে হয়। মনে হয়, এর চেয়ে বিপিন যেন ভাল ছিল, অন্তরালে সে তর্ক করিত, উপদেশও দিত, হুকুমও দিত, কিন্তু সে সব ছিল বন্ধুর মত, তার কাছে নিজেকে এতটা অপদার্থ মনে হইত না।

আরও একটা ব্যাপার সদানন্দ লক্ষ্য করে। তার নামে আশ্রম করা হইয়াছে, সে-ই একরকম ভিত্তি এই আশ্রমের অথচ খাতির যেন

লোকে তার চেয়ে মহেশ চৌধুরীকেই করে বেশী। লোকের কাছে নিজের দামটা আগের চেয়ে যে কমিয়া গিয়াছে এটা সদানন্দ স্পষ্টই অনুভব করিতে পারে। সকলের মুখে আর যেন আগের সেই সভয় ভক্তির ছাপটা খুঁজিয়া মেলে না, সকলের কথায় ও ব্যবহারে মানুষের বদলে নিজেকে আর দেবতা হিসাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না। মহেশ চৌধুরীর উপরে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে দিন দিন। এত যে ন্যাকামি মহেশ চৌধুরী করে, সকলের কাছে সব সময় মোসাহেবের মত নত হইয়া থাকে—তবু!

মাঝে মাঝে সদানন্দ সন্দেহমূলক ক্ষীণ একটা অনুভূতির মধ্যে নিজের চালচলনের ভাঙ্গনধরা পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। আগের মত তেজ কি আর তার নাই? আগের সেই সহজ আত্ম-বিশ্বাস? একটু একটু ভয় কি সে করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সাধারণ তুচ্ছ মানুষগুলিকে? মানুষের সংস্পর্শে আসিলে মাঝে মাঝে হঠাৎ সদানন্দ নিজেকে যাচাই করিবার চেষ্টা করে, কোথায় কি ঢিল হইয়া গিয়াছে তার নিজের মধ্যে যা সকলে টের পাইয়া যাইতেছে? টেরও কি পাইয়া যাইতেছে সত্যসত্যই? আর কিছুই সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, মৃদু একটা অস্বস্তিবোধের স্থায়ী অস্তিত্ব ছাড়া, আত্ম-বিশ্লেষণের অন্যমনস্কতা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইবার পর যেটা আরও বেশী জোরালো হইয়া পড়ে। সদানন্দ জানে, খুব ভাল করিয়াই জানে, এমন কোন্ পরিবর্তন তার বাহিরে প্রকাশ পায় না, কারও পক্ষে যেটা লক্ষ্য করা সম্ভব। তবু মনটা কেন যে খুঁত খুঁত করিতে থাকে! আগে কথা বলার মধ্যেও একটা বিস্ময়কর আনন্দ ছিল, নিজের কথা শুনিতে শুনিতে নিজেই সে মুগ্ধ হইয়া যাইত, সকলের অভিভূত ভাব দেখিয়া নিজের মধ্যে একটা অপার্থিব শক্তির সঞ্চার অনুভব করিত। এখন কথা হয়তো সে বলে আগের মতই, সামনের ভীরু, অসহায় আর অসুখী শিষ্যগুলিকে সুখ ও শান্তির সন্ধান দিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা যে তার আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই হয়তো বলার সময়টা তার থাকে না, কিন্তু তারপর একসময় তার মনে হইতে আরম্ভ হয়, সমস্ত

জড়াইয়া ফলটা সুবিধাজনক হইল না। এই ভীরু অসহায় আর অসুখী শিশুগুলির মনে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাব আগের মত কাজ করিতেছে না। করা সম্ভবও নয়, কারণ নিজেই কি সে বুঝিতে পারিতেছে না যে আর সব ঠিক আগের মত থাকিলেও সমগ্রভাবে ধরিলে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাবটা আর আগের মত নাই?

ব্যাপারটা সদানন্দের বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়। কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না। কখনও সে ভাবে, সব কি তার নিজের কল্পনা, আজকাল একটু কল্পনাপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে? কখনও ভাবে, এখানকার প্রকাশ্য খোলাখুলি জীবন ভাল লাগিতেছে না বলিয়া, সব বিষয়ে বিরক্তি জাগিতেছে বলিয়া, এ রকম হইতেছে? বিপিনের মত একজন তাকে আড়াল করিয়া রাখে না, অধিকাংশ সময় নিজের একটি কুটীরের অন্তরালে নিজের মনে একা থাকার সুযোগ পায় না, সেইজন্য কি আনন্দ, উৎসাহ, শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে? অথবা মাধবীলতার জন্য মন কেমন করিতেছে, চিরদিনের জন্য মেয়েটা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া?

কিন্তু মাধবীলতার জন্য বিশেষ কোন কষ্ট হইতেছে তাও সদানন্দের মনে হয় না। প্রথমটা সত্যই বড় রাগ হইয়াছিল, পছন্দসই একটা খেলনা হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া ফসকাইয়া গেলে ছোট ছেলের যেমন অবুঝ রাগ হয়, খেলনাটা একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিবার সাধ জাগে, কিন্তু সে সব সাময়িক প্রতিক্রিয়া কি মিটিয়া যায় নাই? মাধবীলতাকে দেখিলে এখন কি একটা বিতৃষ্ণার ভাবই জাগে না তার?

অন্য একটা কারণেও মাধবীলতার উপর আজকাল মাঝে মাঝে সদানন্দের রাগ হয়। মাধবীলতা প্রাণপণে তাকে এড়াইয়া চলে। কথা তো বলেই না, সামনে পড়িলে তাড়াতাড়ি সরিয়া যায়। মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরীর পারিবারিক সান্ধ্য-মজলিসে বাধ্য হইয়া যদি বা হাজির থাকে, সদানন্দের যতটা তফাতে সম্ভব, পারিলে একেবারে পিছন দিকে বসিবার চেষ্টা করে।

একদিন খুব ভোরে বারান্দায় মাধবীলতাকে একা দেখিয়া সদানন্দের একটু আলাপ করার সখ চাপিয়াছিল। নিছক আলাপ, আর কিছু নয়। হাসিমুখে সে বলিয়াছিল—এই যে মাধু। তোমার যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না।

—আমার বিয়ে হয়ে গেছে জানেন?—বলিয়া মাধবীলতা তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। মাধবীলতার বাড়াবাড়িতে সদানন্দের বড় জ্বালা বোধ হয়, সেই সঙ্গে হাসিও পায়। এত অবিশ্বাস কেন তাকে? এরকম হীন অমানুষ মনে করা? কি ছেলেমানুষ মাধবীলতা! তাই বটে, মেয়ে জাতটাই এরকম উদ্ভট হয় বটে!

এ সব ছাড়াও সদানন্দের মানসিক জগতে আরও একটা ব্যাপার ঘটে, যেটা আরও গুরুতর, আরও মারাত্মক, আরও বিস্ময়কর, আরও গভীর এবং আরও অনেক কিছু। অন্য কেউ নিজের মনের এরকম একটা অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে সে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া নিত লোকটার মাথা খারাপ হইয়াছে, কিন্তু নিজের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটায় সে বেশ বুঝিতে পারে মাথা খারাপ হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই, এটা মনোবিকার নয়, মনের মধ্যে তার এলোমেলো হইয়া যায় নাই কিছুই। যা কিছু অজানা ছিল, বুদ্ধির অগম্য ছিল, দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মত সে সব অস্পষ্টতা স্পষ্টতা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতকাল নিজের সমগ্র নিজস্বতা বলিয়া যা সে জানিত, পরিবর্তনহীন বিচ্ছিন্নতা বজায় থাকিয়াও ওই অভিনব স্পষ্টতার সঙ্গে একটা আতঙ্কময় ফাঁপর-ফাঁপর ভাবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সদানন্দ জানে সব সে বুঝিতে পারিতেছে, তবু বার বার নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে ব্যর্থ হইয়া যায়। বুঝাইবার চেষ্টাটা হয় নানা ভাবে। ধরা যাক, প্রকাণ্ড গভীর একটা বন, যার মধ্যে আনুমানিক আবছা অন্ধকার, বাঘ ভালুক সিংহ, চিরস্থায়ী ভয় ও বিষাদ—বনের ঠিক বাহিরে ঝলমলে সূর্যালোকে দাঁড়াইয়া অজ্ঞাত কারণের অসহ্য শোকে শান্ত ও নির্বিকার সদানন্দ চুপ চাপ গা এলাইয়া দিয়া মাটি হইতে কয়েক

হাত উঁচুতে বাতাসে ভাসিতেছে। এরকম আরও কয়েকটা ইচ্ছাকৃত স্বপ্নের সাহায্যে সদানন্দ নিজের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করে,নিজের মনের অপূর্ব ব্যাপারটা বুঝিতে পারে বলিয়া তার যে ধারণা আছে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্ন যা থাকে এবং জাগিয়া থাকার সময় স্বপ্ন যা হইয়া যায়, তার পার্থক্যটা ঘুচাইয়া দিবার মত ক্ষমতা তার হয় না, তাই ঘুমন্ত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নকে জাগ্রতা-বস্থায় ব্যাখ্যা হিসাবে সামনে খাড়া করিয়া জাগ্রত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নের সঙ্গে কোন মিল সে খুঁজিয়া পায় না। জাগ্রত অবস্থার কল্পনার স্বপ্ন হইলেও কথা ছিল, বিশেষ প্রশ্রয় না দিলেও বিচিত্র উদ্ভট আর অসম্ভব অনেক কিছুকে সম্ভব ধরিয়া নিয়া খাপছাড়া আনন্দ উপভোগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সদানন্দের পরিচয় আছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ।

একবার কেবল সদানন্দের মনে হইয়াছিল, এই কি প্রেম, প্রিয়কে হারানোর পর প্রেম যা হয়, আসল খাঁটি প্রেম? মাধবীলতাকে হারানোর পর হইতেই তো তার মধ্যে এরকম হইতেছে? কিন্তু নিজের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাকুলতা এত সহজে মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অজানা ও দুর্বোধ্য স্মৃতি হোক, উপলব্ধি হোক, ক্ষয়তিমূল আত্মবিকাশের বিচ্ছিন্ন অংশ হোক, অথবা আর যাই হোক, স্পষ্টতর হওয়ার যে প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে তার সঙ্গে মাধবীলতার কোন সম্পর্ক নাই। মাধবীলতা সম্বন্ধে মানসিক দুর্বলতা ঘটিবার একটা আশঙ্কা মনে আসিয়াছিল, সেই আশঙ্কাটার জন্যই এ ধরণের কথা সদানন্দের মনে আছে।

এক সময় হঠাৎ দরজা বন্ধ করিয়া সদানন্দ ঘরের কোণে মাটিতে বসিয়া পড়ে, আসন থাকিলেও মনে থাকে না। মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসে, চোখ বন্ধ করে, হাত জোড় করে—ইচ্ছায়ও নয় অনিচ্ছায়ও নয়। বিড় বিড় করিয়া বলিতে থাকে—হে ঈশ্বর, দয়া কর। ঈশ্বর বলে যদি কেও থাকো, এ সময় আমায় দয়া কর। তুমি তো জানো আমি স্বীকার করি না তুমি আছ, তবু যদি থাকো, দয়া কর। তুমি তো

সব জানো—তুমি তো জানো কি উদ্দেশ্যে আমি এখন মেনে নিচ্ছি যে তোমায় আমি স্বীকার করি না—তোমায় স্বীকার করি না মেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যটা কেন মেনে নিচ্ছি তাও তো তুমি জানো—কথা জড়াইয়া সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া যায়। মাথাটা প্রণাম করার ভঙ্গিতে মাটিতে ঠেকাইয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

এমনিভাবে ভাবোচ্ছ্বাসের নেশায় সদানন্দ অন্যমনস্কও হয়, নিজেকে শ্রান্ত ও শান্ত করিয়া ঘুমও পাড়ায়।

•

আশ্রমের বড় চালাটার পাশে সদানন্দের জন্য একখানা নতুন ঘর তোলা হয়। সদানন্দ হাসিয়া বলে—বাড়ীতে রাখতে ভরসা হচ্ছে না মহেশ!

মহেশ আহত হইয়া বলে—প্রভু!

—আহা, এত সহজে ঘা খাও কেন বলত মহেশ! তামাসা বোঝ না!

স্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ হঠাৎ বলে—না প্রভু, আমি সত্যই বড় অপদার্থ। আপনি যা বললেন ওই জন্যই আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি।

মহেশ চৌধুরীর মুখে কথাটা এমন খাপছাড়া শোনায় বলিবার নয়। অন্তঃপুরে তাকে স্থান দিতে সাহস না হওয়াও মহেশের পক্ষে যেমন আশ্চর্য, তার সামনে এ ভাবে স্বীকার করার সাহস হওয়াও তার চেয়ে কম আশ্চর্য নয়। এই মহেশ চৌধুরীই না হাতুড়ি দিয়া নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল, মাধবীলতাকে অপমান করার জন্য সদানন্দের উপর ছেলের রাগ হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত বাবদে!

—আমায় তুমি আর বিশ্বাস কর না, না মহেশ!

—বিশ্বাস করি বৈকি প্রভু, আপনি তো দেবতা। তবে সাধনার যে স্তরে আপনি পৌঁচেছেন, এখন আর আপনাকে ঘর-গেরস্থালির মধ্যে রাখতে ভরসা হয় না। আপনার জন্যে সারাদিন আমার বুকের মধ্যে কাঁপে প্রভু। আমি এ অবস্থাটা পার হতে পারি নি প্রভু, তবে আমি

তো অপদার্থ বাজে লোক, আমার সঙ্গে আপনার তুলনাই হয় না— আপনি পারবেন। আপনি নিশ্চয় পার হয়ে যাবেন।

সদানন্দ ভ্রূ কুঁচকাইয়া মহেশ চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, বুঝিয়াও যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে না মানুষটাকে, দ্বিধা সন্দেহ ভয় শ্রদ্ধা মমতা প্রভৃতি কত বিভিন্ন মনোভাব যে পলকে উদয় হয় তার হিসাব থাকে না। যা বলিল মহেশ চৌধুরী তাই কি তবে ঠিক? মিথ্যা কথা তো মহেশ বলে না। কেমন করিয়া লোকটির সম্বন্ধে এই ধারণাটা তার নিজের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল নিজেই সদানন্দ তা জানিতে পারে নাই, কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে এই ধারণাটি আর সব মনোভাবকে যখন চাপা দিয়া মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন সদানন্দ এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসে। হঠাৎ মহেশের পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলে—মহেশ, আমায় তুমি রক্ষা কর—বাঁচাও আমায়।

তিন সন্ধ্যা পরম ভক্তিভরে যার পায়ের ধুলা মাথায় ঠেকায় তাকে এ ভাবে পায়ে পড়িতে দেখিয়া মহেশ চৌধুরীর মূর্ছা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মানুষটা সে সত্যই খাপছাড়া। আরও কত তুচ্ছ কারণে কতবার যে ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু এখন ব্যাকুলতার বদলে আত্ম-প্রতিষ্ঠাই যেন তার বাড়িয়া যায়। সহজভাবেই সে বলে—প্রভু, এ রকম করবেন না। এই জন্যই তো গেরস্থালির ভেতর থেকে আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে রক্ষা করার ক্ষমতা কি আমার আছে প্রভু? নিজেকে আপনার নিজেরি রক্ষা করতে হবে—ভেবে দেখুন, নিজেকে আপনার নিজেরি রক্ষা করতে হবে।

তারপর সদানন্দ উঠিয়া বাগানে চলিয়া যায়, লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ সদানন্দ! 'গেরস্থালি!' কতবার মহেশ কথাটা উচ্চারণ করিয়াছে। মানুষটা কি কম চালাক মহেশ, কম ফন্দিবাজ। মেয়েমানুষ নয়, গেরস্থালি! গেরস্থালির মধ্যে সদানন্দকে আর রাখিতে ভরসা হইতেছে না, তাই মহেশ তাকে সরাইয়া দিতেছে! বাগান হইতে সদানন্দ মাঠে যায়, সেখানে নেংটি-পরা কে যেন একটা মানুষ একটা বাঁধা গরুকে

প্রাণপণে মারিতেছিল। দেখিয়াই প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে কাছে গিয়া সদানন্দ লাঠিটা ছিনাইয়া নিয়া লোকটাকে এক ঘা বসাইয়া দেয়।—এমন করে মারছিস, লাগে না গরুটার?—তারপর লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া লোকটার যেখানে মারিয়াছিল সেখানে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলে—আহা, তোমার লেগেছে বাবা?—তারও পরে লোকটিকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া মহেশকে বলে—একে একটা টাকা দিয়ে দাও তো মহেশ।

গরীব চাষাভূষা মানুষ সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াই ভড়কাইয়া যায়। তার উপর, সাধুটি কে তাও তার অজানা ছিল না। থতমত খাইয়াই ছিল, এতক্ষণে বলিল—মোটে একটা, আজ্ঞে?

শুনিয়াই তো সদানন্দ চটিয়া গেল।—ওরে হারামজাদা, যা করে মারছিলি গরুটাকে, তোকে খুন করে ফেলা উচিত ছিল। তার বদলে একটা টাকা দিচ্ছি, তাতে তোমার পোষাল না? যা এখান থেকে, ভাগ, কিছু পাবি না তুই।

—আজ্ঞে না কর্তা, যা দিবেন মাথা পেতে লিব।

—কিছু দেবে না তোকে—একটি পয়সাও নয়। যা এখান থেকে—গেলি? দিও না মহেশ, খবর্দার দিও না।

রাগের মাথায় সদানন্দকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া টাকার আশা ছাড়িয়া লোকটি তখনকার মত পলাইয়া যায়। টাকাটা কোমরে গুঁজিয়া সদানন্দ দাঁড়াইয়া থাকে। ঘণ্টাখানেক পরে আশ্রমের চালার নিচে মস্ত আসর বসিলে সকলের সামনে জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দ বলে—আমার মনটা বড় দুর্বল হয়ে গেছে মহেশ।

মহেশ চৌধুরী ভরসা দিয়া বলে—তাতো যাবেই প্রভু?

ভরসা পাওয়ার বদলে সদানন্দ কিন্তু আবার ভয়ানক চটিয়া ধমক দিয়া বলে—যাবেই মানে? কি যে তুমি পাগলের মত বল তার ঠিক নেই।

সদানন্দ ভাবে: আমি নিজে যে কি সাধনা করছি, আমি নিজে তা জানি না কেন? সাধনার কোন স্তরে আমি পৌঁচেছি আমার চেয়ে মহেশ চৌধুরী তা বেশী জানে কেন? ব্যাপারখানা কি?

নিজের কাছে ফাঁকি খুব ভালরকমেই চলে কি না, সদানন্দ তাই ভাবিয়া পায় না ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় কি ভাবে কোন সাধনাটা সে কবে করিয়াছে। আসন করিয়া অনেক সময় বসিয়া থাকিয়াছে বটে, আবার অনেক সময় বসিয়া থাকেও নাই। কিন্তু আসন করিয়া বসিয়া থাকিলেই কি সাধনা হয়, আর কোন রীতিনীতি নিয়ম কানুন সাধনার নাই? আসন করিয়া বসিয়াই থাক আর বিছানায় চিৎ হইয়া পড়িয়াই থাক, চিন্তা সে যে একরকম সব সময়েই করে, জীবনের তুচ্ছতম বিষয়টির মধ্যে রহস্যময় দুর্বোধ্যতা আবিষ্কার করা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট রহস্যগুলির ফাঁকি ধরিয়া ফেলা পর্যন্ত নানা ধরণের বিচিত্র চিন্তায় মসগুল হইয়া সে যে দিন কাটাইয়া আসিতেছে, এটা তার খেয়ালও হয় না। দিনের পর দিন নিজেকে নতুন চেনায় চিনিয়াছে, আবার নতুন অচেনায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারটাকে সদানন্দ সাধারণ বাঁচিয়া থাকার পর্যায়েই ফেলে। এক একজন মানুষ থাকে যারা ঘরে বসিয়া এলোমেলো লেখাপড়া করে, আগে শেষ করে দ্বিতীয়ভাগ তারপর ধরে প্রথমভাগ, জ্ঞান হয়তো তাদের জমা হয় অনেক ডিগ্রিধারী নামকরা জ্ঞানীর চেয়ে বেশী, কিন্তু জ্ঞান বলিয়া কিছু যে তারা সংগ্রহ করিয়াছে এ ধারণাটাই তাদের মনে আসে না। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া যেখানে উঠিতে হয়, বাঁশের খুঁটি বাহিয়াও যে সেইখানেই উঠিয়া পড়িয়াছে, উঠিবার পরেও অনেকে তা বিশ্বাস করিতে চায় না। সাধু-সন্ন্যাসীর যোগ সাধনার বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ হইলেও বরং কথা ছিল, এসব যে ছেলেখেলা নয় সদানন্দ তা ভাল করিয়াই জানে। নিজের অজ্ঞাতসারে সাধনার পথে

অগ্রসর হইয়া চলা এবং কঠিন ও বিপজ্জনক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছানো যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে কোনমতেই তার মাথায় ঢুকিতে চায় না।

রাত দুপুরে ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া মহেশ চৌধুরীকে ডাকিয়া পাঠায়।

—ভয় করছে প্রভু?

প্রশ্ন শুনিবামাত্র সদানন্দ টের পায়। এতক্ষণ ভয়ই করিতেছিল বটে। একটা দুর্বোধ্য বীভৎস আতঙ্ক মনের মধ্যে চাপিয়া বসিয়াছে।

তবু সাহস করিয়া সদানন্দ বলে—তুমি ভুল করছ মহেশ। আমি তো কোনদিন সাধন-ভজন কিছু করি নি।'

—রাত দুপুরে জেগে বসে এই যে হিসাব করছেন, সাধন-ভজন কিছু করেছেন না কি, এটা কি প্রভু?

সদানন্দ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

জোড়হাতে সবিনয়ে মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে নানারকম উপদেশ দেয়। সদানন্দ নিজে কেন জানে না সে সাধক? কেন জানিবে! সাধক যে নিজেকে সাধক বলিয়া জানে, সেই জানাটা কি, সদানন্দ কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছে? অনন্যসাধারণ প্রক্রিয়াগুলি ওই জ্ঞানের জন্ম দেয় আর যতদিন সাধক ওই জ্ঞানকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে না পারে ততদিন সিদ্ধিলাভের কোন ভরসাই থাকে না। সদানন্দের জানিবার তো কোন কারণ ঘটে নাই যে সে সাধনা করিতেছে, প্রক্রিয়া সে ঠিক করিয়া গিয়াছে নিজে, ও সব তার কাছে বাঁচিয়া থাকারই অঙ্গস্বরূপ। তা ছাড়া, যে রকম সাধনা সে কোনদিন করে নাই লোকের কাছে নিজেকে সেইরকম সাধক বলিয়া পরিচিত করার ফলে মনে মনে একটা তার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে সাধনার ব্যাপারে সে ফাঁকিবাজ। আসলে কিন্তু—

—আমি যে ফাঁকিবাজ তাও দেখছি তুমি জানো, মহেশ?

—ফাঁকিবাজ তো আপনি নন প্রভু।

সদানন্দ চটিয়া বলে—এই বলছ লোককে ফাঁকি দিই, সঙ্গে সঙ্গে

আবার বলছ ফাঁকিবাজ নই, তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি না মহেশ।

—আজ্ঞে, দশজনকে জানিয়েছেন, আপনি সাধু—তাতে তো ফাঁকি-বাজি কিছু নেই। দশজনের ভালর জন্য নিজেকে সাধু ঘোষণা করাও সাধু ছাড়া অন্যের দ্বারা হয় না প্রভু। নিজের জন্য তো চান নি, লোকে সাধু ভাবুক, অসাধু ভাবুক, আপনার বয়ে গেল।

সদানন্দ সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলে—নিজের জন্য চেয়েছিলাম কিনা কে জানে!

—না, প্রভু, না। তাই কি আপনি পারেন?

খানিক পরে প্রকারান্তরে সদানন্দ মহেশ চৌধুরীকে এখানে শুইয়া থাকার অনুরোধ জানায়, কিন্তু মহেশ রাজী হয় না। বলে যে, ভয়কে এড়াইবার চেষ্টা করিলে তো চলিবে না, ভয়কে জয় করিতে হইবে।

মহেশ চৌধুরীর তুলনায় নিজেকে সদানন্দের অপদার্থ মনে হয়। গভীর হতাশায় মন ভরিয়া যায়, রাগের জ্বালায় দেহের মধ্যে কি যেন সব পুড়িয়া যাইতে থাকে। মহেশ চৌধুরীর বাঁচিয়া থাকার কোন মানে হয় না, এই ধরণের উদ্ভট চিন্তা অসংখ্য খাপছাড়া কল্পনার আবরণে আসিয়া ভিড় করে। ক্রমে ক্রমে একটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার সে লক্ষ্য করে। মহেশ চৌধুরীর একটা বড় রকম ক্ষতি করার চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলেই হঠাৎ নিজেকে যেন তার সুস্থ মনে হইতে থাকে, দেহ মনের একটা যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থ অবস্থা যেন চোখের পলকে জুড়াইয়া যায়। যে আতঙ্কময় ফাঁপর ফাঁপর ভাবটা আজকাল তাকে থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে, আর যেন তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। মহেশ চৌধুরীকে মনে মনে হিংসা করিবার সময়টা জাগ্রত স্বপ্নের প্রভাব হইতে সে মুক্তি পায়, মাথার ঝিমঝিমানি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বাতাসে ভাসিয়া বেড়ানোর বদলে হঠাৎ যেন শক্ত মাটিতে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া টের পায়।

মহেশ চৌধুরীকে তীব্রভাবে ঘৃণা করিয়া, দশজনের কাছে তাকে হীন প্রতিপন্ন করার সম্ভব অসম্ভব মতলব আঁটিয়া আর নিজেকে তার চেয়ে ছোট মনে করার প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত হইয়া গিয়া সদানন্দ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। অন্ততঃ তার তাই মনে হয়। ভয়টা যে এড়ানো যায়, রক্ত চলাচল শ্লথ করিয়া দেওয়ার মত উত্তেজনাবিহান সর্বগ্রাসী ভয়, তাও কি কম? মহেশ চৌধুরী অবশ্য ভয় এড়ানোর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এসব ব্যাপারের সে কি বোঝে, কি দাম আছে তার উপদেশের? সদানন্দকে উপদেশ দিতে আসে, স্পর্ধাও কম নয় লোকটার!

দিন কাটিয়া যায়। মহেশ চৌধুরী শান্ত চোখে সদানন্দের চালচলন আর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে! মুখখানা যেন তার দিনদিন অল্পে অল্পে বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া উঠিতে থাকে।

একদিন মহেশ চৌধুরী বলে—প্রভু?

সদানন্দ একটা শব্দ করে, যেটা জবাব হিসাবেও ধরা যায়, আবার অবজ্ঞা হিসাবেও ধরা যায়।

—আর এগোতে পারছেন না প্রভু, না?

—কিসের এগোতে পারছি না? কে বললে তোমাকে এগোতে পারছি না?

মহেশ চৌধুরীর চোখ ছল ছল করিতে থাকে—এগোতে না পারলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, পিছিয়ে আসছেন কেন প্রভু? এখন পিছু হটতে সুরু করলে কি আর উপায় আছে! প্রথমটা একটু ভাল লাগে, কিন্তু দুদিন পরে নিজের হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা হবে। এমন যন্ত্রণা পাবেন, এখন ভাবতেও পারবেন না।

—তোমার উপদেশ বন্ধ কর তো মহেশ।

—উপদেশ নয়, কথাটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। নিজেই বুঝে দেখুন, কি বিপদ ঘটাচ্ছেন নিজের।

সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও সদানন্দ কিছু কিছু বুঝিতে পারে। মহেশ চৌধুরীর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পালানোর এরকম জোরালো

ইচ্ছা আগে তার হইত না এবং মহেশ চৌধুরীর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার কাজে এতটা শক্তিক্ষয়ও করিতে হইত না। নূতন একটা অনুভূতি আজকাল তার কাছে ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের জীবনের ব্যর্থতার অনুভূতি। অনুভূতিটা একেবারে নূতন, এ পর্যন্ত চাপা পড়া সঙ্কেতের মতও কোনদিন অনুভব করে নাই। মানুষের জীবনের ব্যর্থতার কথা অবশ্য সে অনেক ভাবিয়াছে, মাঝে মাঝে গভীর বিষাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে যেন অন্য জিনিস। রোগে শোকে একজন মানুষকে কষ্ট পাইতে দেখিলে সহানুভূতির মধ্যে যে বিষাদ জাগিত, সমস্ত মানুষের জীবনের মূল্যহীনতা জাগাইয়া তুলিত সেই বিষাদ। কিন্তু এখন সে যা অনুভব করে সেটা যেন ঠিক বিষাদ নয়। মানুষের বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ নাই, তার নিজের জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত লোক বাঁচিয়া ছিল তাহাদের জীবনও ব্যর্থ এবং ভবিষ্যতে যত লোক পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে তাদের জীবনও ব্যর্থ—কিন্তু তাতে যেন কিছু আসিয়া যায় না। ব্যর্থতার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর নাই জীবনের, প্রতিকারহীন জীবনব্যাপী ব্যর্থতা—। অথচ তাও যেন সদানন্দের কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। নির্বিকার ভোঁতা একটা ক্ষোভ শুধু সে অনুভব করে। জ্বর আসিবার আগে শরীর ম্যাজ ম্যাজ করার মত। এটা কি ভয়ানক কিছুর সূচনা?—মহেশ চৌধুরীর আলোচনা এই প্রশ্ন আর ভয় তার মধ্যে জাগাইয়া দেয়।

মহেশ চৌধুরীর ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে যেন কমিয়া আসিতে থাকে। জোড়হাতে ছাড়া সদানন্দের সঙ্গে সে একরকম কথাই বলিত না, আজকাল হাত জোড় করিতে ভুলিয়া যায়। 'প্রভু' শব্দটাও তার মুখে শোনা যায় কদাচিৎ। মহেশ চৌধুরীর ভক্তি শেষের দিকে সদানন্দকে বিশেষ কিছু তৃপ্তি দিত না, কিন্তু ভক্তির অভাব ঘটায় আজকাল তার ভয়ানক রাগ হয়।

সভায় কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে। মহেশ চৌধুরীর মত অন্ত

সকলের ভক্তি শ্রদ্ধাও কি কমিয়া গিয়াছে? এতকাল যাদের সে শিশু মনে করিয়া আসিয়াছে, মতামত নিয়া কোনদিন মাথা ঘামায় নাই আজকাল তাদের তাকানোর ভঙ্গিতে অনুকম্পা আর অবজ্ঞা আবিষ্কার করিয়া বুকের মধ্যে হঠাৎ তার ধড়াস্ করিয়া ওঠে। কি করিয়াছে সে? কার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে? কার সঙ্গে কিসের বাধ্যবাধকতায় সে আটক পড়িয়া গিয়াছে? দেহবাদী এইসব অপদার্থ মানুষ কেন তাকে সর্বদা ইঙ্গিত করিতেছে—আমরা কাপুরুষ, কিন্তু হে মহাপুরুষ, তোমার চেয়ে কত সুখেই আমরা বাঁচিয়া আছি!

নিছক ভাবপ্রবণতা? যে জিনিসটা চিরদিন সে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে? বুঝিয়াও সদানন্দ যেন বুঝিতে পারে না। কোনটা মনের দুর্বলতা জানিবার পরেও সেটাকে দমন করা যে এমন কঠিন ব্যাপার এতকাল তার জানা ছিল না। আগে ঘরের কোণে নিজের ছেলেমানুষীর কথা ভাবিয়া তার হাসি পাইত, এমন তুচ্ছ একটা বিষয়কে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে কেন ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইত—আজকাল ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দেওয়ার দুর্ভাবনায় মাথা যেন তার ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম করে। হাত পা নাড়ায় বাধা দিলে শিশু যেমন ক্ষেপিয়া যায়, ছেলেমানুষীকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া সদানন্দের সেইরকম উন্মাদের মত আর্তনাদ করিতে ইচ্ছা হয়।

একবার বিপিন আসিয়া বলে—তোর চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে সদা।

সদানন্দ রাগিয়া বলে—গেছে তো গেছে, তোর কি?

বিপিন উদাস ভাবে বলে—আমার আবার কি! তুই মরলেই বা আমার কি।

ফিরিয়া যাওয়ার সময় মহেশ চৌধুরীর সঙ্গে বিপিনের দেখা হয়। বিপিন হাসিয়া বলে—সাধুজীকে খেতে দেন না নাকি? মুখের চামড়া যে কুঁচকে যেতে আরম্ভ করেছে মশায়?

মহেশ চৌধুরী বলে—না খেলে কি মুখের চামড়া কুঁচকে যায় ভাই? নিজের মনকে কুঁচকে দিচ্ছেন, মুখের চামড়ার কি দোষ!—

বিষন্নভাবে মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়ে—অনেক আশা করেছিলাম, সব নষ্ট হয়ে গেল। কি খেলাই যে ভগবান খেলেন! এমন একটা মানুষ আমি আর দেখি নি বিপিনবাবু, অবতার বলা চলত। কি যে হল, নিজেকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছেন।

বিপিন অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরীর আবার বলে—গুরুর নির্দেশ মেনে সারা জীবন প্রাণপাত করে বড় বড় যোগী ঋষি যে স্তরে উঠতে পারেন না, উনি নিজের স্বাভাবিক প্রেরণায় বিনা চেষ্টায় সেই স্তরে পৌঁচেছিলেন। এক একবার আমি ভাবি কি জানেন, আমি ভুল করলাম নাকি? আমি সচেতন করিয়ে দিয়েছি বলে কি বিগড়ে গেলেন? যেমন অবস্থায় ছিলেন তেমনি অবস্থায় থাকলে হয়তো নিজের চেষ্টায় আপনা থেকে সামলে এগিয়ে চলতেন।

মহেশ চৌধুরী আপসোস দেখিয়া বিপিন আরও অবাক হইয়া যায় এতকাল লোকটাকে একটু পাগলাটে বলিয়া তার ধারণা ছিল, আজ হঠাৎ যেন ধারণাটা নাড়া খায়। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী আবার বলে—এসব লোকের মধ্যে প্রচণ্ড তেজ আর শক্তি থাকে। যেই জেনেছেন সাধনার পথে এগোতে হবে, অমনি বিদ্রোহ করে বসেছেন। সামনে এগিয়ে দেবার জন্য আমি একটু-আধটু ঠেলা দিয়েছি বলেই বোধ হয় রাগ করে পিছু হটতে আরম্ভ করেছেন। কি সর্বনাশটাই আমি করেছি বিপিনবাবু?

—যা করেছেন, ভাল উদ্দেশ্যেই তো করেছেন।

—তবু আমার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই হয়তো উচিত ছিল।

দিন দশেক পরে মহেশ চৌধুরী একদিন সকালে বিপিনের আশ্রমে গেল। বিপিন আশ্রমে ছিল না, উমা আর রত্নাবলী মহেশকে আদর করিয়া বসাইল। আজকাল মহেশ চৌধুরীর সম্মান বাড়িয়াছে—মাধবীলতা তার ছেলের বৌ।

রত্নাবলী বলিল—আপনার ওখানে এবার আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিন ?

মহেশ হাসিয়া বলিল—আমাদের ওখানে কি কারও থাকবার ব্যবস্থা আছে ? –গিয়ে থাকতে হয়।

উমা বলিল—আমাদের যেতে দিতে আপনি আপত্তি করছেন কেন বুঝতে পারি না।

—আপত্তি ? আপত্তি কিসের ! তবে কি জানেন, আপনারা গেলে বিপিনবাবু রাগ করবেন কিনা তাই আপনাদের নিয়ে যাই নি।

—বিপিনবাবু রাগ করবেন বলে ইচ্ছে হলেও আমরা কোথাও যেতে পারব না ! আমরা কি বিপিনবাবুর কয়েদী নাকি ?

—উহুঁ, তা কেন হবেন। আপনাদের ইচ্ছে হলে আপনারা যেখানে খুসী যাবেন, কিন্তু আমার কি নিয়ে যাওয়া উচিত ? সেরকম ইচ্ছেও আপনাদের হয় নি যাওয়ার হলে আপনারা নিজেরাই, যেতেন, জোর করে যেতেন।

—থাকতে দিতেন গেলে ?

—থাকতে দিতাম বৈকি।

রত্নাবলী একটু খোঁচা দিয়া বলিল—কিন্তু বিপিনবাবু যে রাগ করতেন ?

মহেশ সহজভাবেই বলিল—রাগ করলে কি আর করতাম বলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাই নি, আপনারা নিজের ইচ্ছায় গিয়েছেন তাতেও যদি বিপিনবাবু রাগ করতেন—করতেন !

—আপনি আশ্চর্য মানুষ !—উমা বলিল।

—উচিত অনুচিত জ্ঞানটা আপনার যেন একটু বেশী রকম সূক্ষ্ম। সব ব্যাপারেই কি এমনি করে বিচার করেন ?—রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

—বিবেক বড় কামড়ায় কিনা, বিচার না করে উপায় কি ? বিবেকের কামড় এড়াবার এত সহজ উপায় থাকতে জেনে শুনে সাধ করে কামড় খাওয়া কি বোকামি নয় ?

—জীবনটা একঘেয়ে লাগে না আপনার?—রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

—কেন, একঘেয়ে লাগবে কেন? সবাই বিচার করে কাজ করে, আমিও করি। অন্য দশজনে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মত কর্তব্য ঠিক করে, আমিও তাই করি। কেউ জেনে শুনে ভুল করে, কেউ বুদ্ধির দোষে ভুল করে, কেউ কেউ আবার ভুল করছে কি না করছে গ্রাহ্যও করে না। আমি একটু চালাক মানুষ কিনা তাই সব সময় চেষ্টা করি যাতে ভুল না হয়। তবু আমিও অনেক ভুল করে বসি! আমার যদি একঘেয়ে লাগে, তবে পৃথিবীর সকলেরই একঘেয়ে লাগবে।

—আপনিও তবে ভুল করেন?

—করি না? মারাত্মক ভুল করে বসি। সাধুজীকে নিয়ে গিয়ে একটা ভুল করেছি।

উমা ও রত্নাবলী দুজনেই একসঙ্গে বলে—বলেন কি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জীবনে এমন ভুল আর করি নি।

উমা আর রত্নাবলী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।—কিন্তু বিপিনবাবু ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো আপনি—

মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়িয়া বলিল—না না, তাড়াবেন কেন। দুজনে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল, বন্ধু কিনা দুজনে। বিপিনবাবু তাই রাগ করে—যাকগে, কি আর হবে ওসব কথা আলোচনা করে।

ঘণ্টাখানেক পর বিপিন ফিরিয়া আসিলে মহেশ চৌধুরী তাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গেল। তাকে আশ্রমে দেখিয়াই বিপিন অবাক হইয়া গিয়াছিল, প্রস্তাব শুনিয়া তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

—ওকে ফিরিয়ে আনতে বলছেন?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আগের অবস্থায় ফিরে এলে হয়তো আত্মসম্বরণ করতে পারবেন।

—ও কি ফিরে আসবে?

—আসবেন বৈকি।

বিপিন চুপ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া তাকায়

আর চোখ নামাইয়া নেয়। তারপর হঠাৎ বলে—দেখুন, আপনাকে সত্যি কথা বলি। মাঝে মাঝে আমি যে আপনার ওখানে যেতাম, আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সদা চলে যাওয়ার পর আমার কতগুলি ভারি মুস্কিল হয়েছে, তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে আমরা বন্ধু, ওকে ছেড়ে থাকতেও কেমন কেমন লাগছে। তাই ভেবেছিলাম, বলে কয়ে আবার ফিরিয়ে আনব। আমি অনেক বলেছি, ও কিন্তু রাজী হয় নি।

মহেশ চৌধুরী বলিল—তা জানি। আমিও ওই রকম অনুমান করছিলাম।

বিপিন চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী আবার বলিল—এতকাল রাজী হন নি, এবার বললেই রাজী হবেন। ওখানে উনি ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছেন।

বলা মাত্র সদানন্দ রাজী হইল না, তবে শেষ পর্যন্ত রাজী সে হইয়া গেল। তবে একটা চুক্তি সে করিল বড় খাপছাড়া। প্রথমটা আরম্ভ করিল যেন একটু সলজ্জ ভাবে, সঙ্কোচের সঙ্গে, বিপিনের হাঁটুর দিকে তাকাইয়া—আমার সব কথা শুনে চলবি ?

—না।

আর খানিকটা চোখ তুলিয়া সদানন্দ বলিল—কোন বিষয়ে আমায় জ্বালাতন করবি না ?

—করব।

আরও খানিকটা তুলিয়া—আমার কাছে কিছু গোপন করবি না ?

—করব।

তখন সোজাসুজি চোখের দিকে চাহিয়া সদানন্দ বলিল—আরেকটা কাজ করতে হবে আমার জন্যে। মাধুকে আমার চাই।

—মাধুকে তোর চাই ? কি করবি মাধুকে দিয়ে—ও।

বিপিন হাঁ করিয়া সদানন্দের দিকে চাহিয়া রহিল। এরকম সদানন্দের সঙ্গে তার কোনদিন পরিচয় ছিল না। মাধবীলতার জন্য আকর্ষণ অনুভব করা অবস্থা বিশেষে সদানন্দের পক্ষে সম্ভব, অবস্থা বিশেষে হঠাৎ মাথাটা তার মাধবীলতার জন্য খারাপ হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু এভাবে কোন মেয়েমানুষকে চাওয়ার মানুষ সে নয়। যদি বা মনে মনে চায়, লজ্জায় দুঃখে ঘৃণায় লোকের কাছে মুখ দেখাইতে তার অস্বস্তি বোধ হওয়া উচিত। বিপিন নিজেই দারুন অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে, সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে, মাধুকে পাওয়া সম্বন্ধে চেষ্টা করিবার কথা না দিলে সদানন্দ ফিরিয়া যাইবে না।

—কিন্তু মাধুর যে বিয়ে হয়ে গেছে ?

—তাতে কি ?

—তাতে কি ? তাতে কি ? তুই একটা পাঁঠা সদা, আস্ত পাঁঠা।

আগে বলিস্ নি কেন, বিয়ের আগে? তোর কথায় যখন উঠত বসত?

সদানন্দের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। এ জ্যোতি বিপিন চেনে! মানুষকে খুন করবার আগে মানুষের চোখে এ জ্যোতি দেখা দেয়।—কি জানিস বিপিন, আগে মেয়েটাকে বড় মায়া করতাম, তখন কি জানি এমন পাজী শয়তান মেয়ে, তলে তলে এমন বজ্জাত! একটা রাত্রির জন্যে ওকে শুধু আমি চাই, বাস্, তারপর চুলোয় যাক, যা খুসী করুক, আমার বয়ে গেল। ওর অহঙ্কারটা ভাঙ্গতে হবে।

এবার বিপিন যেন ব্যাপারটা খানিক খানিক বুঝিতে পারে। মাধবীলতা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, জীবনের সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাই সদানন্দের এত জ্বালা। নিজে সে যাচিয়া মাধবীলতাকে প্রত্যাখ্যানের অধিকার দিয়াছে তাই আজ প্রত্যাখ্যানের জ্বালা সহ্য হইতেছে না, নয়তো তাকে অবহেলা করার অধিকার কোন মেয়ের আছে, এ ধারণাই সদানন্দের মনে আসিত কিনা সন্দেহ। নিজে সে মাধবীলতাকে বড় করিয়াছে, মাধবীলতাকে অধিকার দিয়াছে অনেক, নিজের উপভোগের স্বাদ বাড়ানোর জন্য নিজের কামনাকে জোরাল করিয়াছে, ব্যাপক করিয়াছে। নয়তো কে ভাবিত মাধবীলতার কথা—কেবল মাধবীলতার কথা নয়, সে কি করে না করে আর ভাবে না ভাবে তা পর্যন্ত! বড় জোর একদিন তার কাছে মুচকি হাসির সঙ্গে আপসোস করিয়া বলিত—ছুঁড়িটা বড় ফসকে গেল রে বিপিন!

নূতন করিয়া সদানন্দকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ব্যাপারটা নিয়াই বিপিন মাথা ঘামায়। সদানন্দের সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরীর কয়েকটা মন্তব্যও সে যেন কম বেশী বুঝিতে পারে। সদানন্দের সংযম সত্যই অসাধারণ ছিল, কারণ তার মধ্যে সমস্তই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অসংযম পর্যন্ত। কেবল তাই নয়, সংযমও তার মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কামনার যার এমনি জোর নাই, ভিতর হইতে যার মধ্যে বোমা ফাটিবার মত উপভোগের সাধ কোন দিন ঠেলা দেয় নাই, আত্মজয়ের তো তার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু সদানন্দের মত

মানুষ, অতি অল্প বয়সেই যারা নিজের উপর অধিকার হারাইয়া বিগড়াইয়া যাইতে আরম্ভ করে, তার পক্ষে তো হঠাৎ কদাচিৎ অন্যায় করিয়া ফেলিয়াও অন্যায় না করিয়া বাঁচিয়া থাকা, অন্যায় করার অসংখ্য সুযোগের মধ্যে অন্যায় করার সাধ দমন করিয়া চলা, আত্মোপলব্ধির সাংঘাতিক সাধনায় ব্যাপৃত থাকার মত মনের জোর বজায় রাখা তো সহজ ব্যাপার নয়। সদানন্দের অনেক দুর্বলতা, অনেক পাগলামী একটা নূতন অর্থ বিপিনের কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে মহেশ চৌধুরীর কথাই ঠিক, ওসব দুর্বলতা শক্তির প্রতিক্রিয়া, ওসব পাগলামী অতিরিক্ত জ্ঞানের অভিব্যক্তি। নিজে সদানন্দ জানিত না সে সত্য সত্যই মহাপুরুষ তাই ভাবিত লোকের কাছে মহাপুরুষ সাজিয়া লোককে ঠকাইতেছে। শত শত মানুষ যে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া যায়, সামনে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া মুখের দিকে চাহিতে পারে না, তাও সে ধরিয়া নিয়াছিল শুধু তার নানারকম ছল আর মিথ্যা প্রচারের ফল। এত বড় বড় আদর্শ সে পোষণ করিত (হয়তো এখনো করে) যে, নিজের অসাধারণত্বকে পর্যন্ত তার মনে হইত (হয়তো এখনো হয়) সাধারণ লোকের তুচ্ছতার চেয়েও নিচু স্তরের কিছু।

বন্ধুর জন্য বিপিন একটা শ্রদ্ধার ভাব অনুভব করে, বন্ধুর আধুনিকতম এবং বীভৎস ও বিপজ্জনক প্রস্তাবটাও যার তলে চাপা পড়িয়া যায়। যোগাযোগটা তার বড় মজার মনে হয়। মহেশ চৌধুরী যখন সদানন্দকে মনে করিত দেবতা তখন তার জন্য বিপিনের মনে ছিল প্রায় অবজ্ঞারই ভাব, তার পর সদানন্দের অধঃপতনের জন্য মহেশ চৌধুরীর ভক্তি যখন উবিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বিপিনের মধ্যে জাগিয়াছে শ্রদ্ধা! মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের নিয়মকানুনগুলি খাপছাড়া নয়?

বিপিনের আশ্রম ত্যাগ করা, মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে বাস করা, নূতন আশ্রম খুলিয়া নূতনভাবে জীবন যাপন করা এবং তারপর আবার নিজের পুরাতন আশ্রমে ফিরিয়া আসা, নাম ছড়ানোর দিক

দিয়া এ সমস্ত খুবই কাজে আসিল সদানন্দের। মহেশ চৌধুরীর আশ্রমে সমবেত নারী পুরুষের ভক্তিশ্রদ্ধা হারানোর যে ভয়টা সদানন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিল সেটা অবশ্য নিছক ভয়, সকলেই শিষ্যত্ব অর্জনের এবং তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অধিকার আর সুযোগ পাওয়ায় তার সম্বন্ধেই লোকের অস্বাভাবিক ভয়টা কমিয়া আসিতে ছিল। বিপিনের সাহায্যে নিজের চারিদিকে সে যে কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল, মহেশের চেষ্টা ছিল সেটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সকলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সহজ করিয়া তোলা। সম্পর্কটা সত্যসত্যই সহজ হইয়া আসিতে থাকায় সদানন্দের মনে হইয়াছিল, লোকের কাছে সে বুঝি নীচে নামিয়া যাইতেছে।

হয়তো নামিয়া যাওয়াই। সংস্কার-নাড়া-দেওয়া ভয়ের ভিত্তিতেই হয়তো দেবতার সর্বোচ্চ আসন পাতা সম্ভব।

সদানন্দের সঙ্গে মহেশ চৌধুরীর আশ্রমের জনপ্রিয়তা যেন শেষ হইয়া গেল, যেদিন পুরাতন আশ্রমে সদানন্দ নূতন পর্যায়ে আসর বসাইল প্রথমবার, সেদিন মহেশ চৌধুরীর আশ্রমে লোক আসিল মোটে দশ-বার জন। সকলে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে গিয়াছে —আগে যত লোক আসিত তার প্রায় তিনগুণ। সদানন্দ ভাবিয়াছিল এবার হইতে যতটা সম্ভব মহেশ চৌধুরীর নিয়মেই আশ্রম পরিচালনা করিবে, শিষ্য করিবে সকলকেই, নাগালের মধ্যে আসিতে দিবে সকলকেই, কথা বলিবে সহজভাবে। এক নজর তাকাইয়াই আর নারী বা পুরুষকে অপদার্থ করিয়া দিবে না। কিন্তু ভিড় দেখিয়া হঠাৎ তার কি যে জাগিল উল্লাস আর গর্ব মেশানো একটা নেশা, মুখের গাম্ভীর্যের আর তুলনা রহিল না, যেন গোপন পাপ সব আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেছে দৃষ্টির তীব্রতায় এমনি অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল অনেকের, আর কথা শুনিতে শুনিতে অনেকের মনে হইতে লাগিল তার পায়ে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে মরিয়া যায়।

প্রণামী দিতে গিয়া দু-একজন পায়ে আছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সুবিধা হইল না।

প্রথম জনকে সদানন্দ বলিল—উঠে বোসো। তিনমাস মাছ মাংস মেয়েমানুষ ছুঁয়ো না। এবার যাও—যাও!

দ্বিতীয় জনকে সংক্ষেপে বলিল—পাঁচ বছরের মধ্যে তুমি আমার কাছে এসো না।

আগে কেউ বাড়িবাড়ি করার সাহস পাইত না, ভাবপ্রবণতার নাটকীয় অভিব্যক্তি সদানন্দ পছন্দ করে না। মাঝখানে অনেকগুলি ব্যাপার ঘটায় আর সদানন্দ নিজের নূতন পরিচয় দেওয়ায় কয়েক-জনের সাহস হইয়াছিল, নূতন লোকও আজ আসিয়াছিল অনেক। কিন্তু পায়ে আছড়াইয়া পড়ার ( তিন টাকা প্রণামী দেওয়ার পরেও ) আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করার (প্রণামী--আড়াইটাকা) ফল দেখিয়া সকলের সাহস উঠিয়া গেল। সকলের বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ যেন কোথাও কোনদিন যায় নাই, মাঝখানে প্রায় বছরখানেকের ফাঁক পড়ে নাই, এইখানে আগে যেমন সভা বসিত আজ একটু বড় ধরণে সেই রকম সভাই বসিয়াছে।

কিন্তু দোকানে ফিরিয়া গিয়া শ্রীধর সেদিন সন্ধ্যার পর মুখখানা যেন কেমন একটু ম্লান করিয়া বলিল—ঠাকুরমশায় কেমন যেন বদলে গেছেন। ঠাকুরমশায়ের রাগ তো দেখি নি কখনো, সত্যিকারের রাগ!

ঠিক সেই সময় আশ্রমে নিজের গোপন অন্তঃপুরে সদানন্দ বিপিনকে বলিতেছিল—উমা আর রতনকে দিয়ে মাধুকে আনাতে হবে। এই ঘরে মাধুকে বসিয়ে রেখে ওরা চলে যাবে, তারপর আমি না ডাকলে কেউ আমার মহলে আসবে না।

—উমা আর রতন? ওরা কেন রাজী হবে?

—হবে। আমি বললেই হবে।

—তা হবে না। এরকম মতলবের কথা শুনলেই ওদের মন বিগড়ে যাবে, আশ্রম ছেড়েই হয়তো চলে যাবে।

—সে আমি বুঝব।

কিন্তু বুঝা বিপিনের পক্ষেও প্রয়োজন, সে তাই সন্দিগ্ধভাবে মাথা

নাড়ে। তারপর অন্য কথা বলে —কিন্তু মহেশ বা বিভূতি যদি পুলিশ ডেকে আনে ?

—আনে তো আনুবে।

—আনে তো আনবে ? তোর খারাপ মাথাটা আরও খারাপ হয়ে গেছে সদা।

—তুই বড় বোকা বিপিন। পুলিস আশ্রমের ধারে আসামাত্র উমা, রতন আর আশ্রমের আরও পাঁচ-সাতটি মেয়ে মাধুকে ঘিরে বসবে। পুলিশ এসে দেখবে মাধুকে কেউ আটকে রাখে নি, মেয়েদের সঙ্গে ফাঁকা যায়গায় বসে গল্প করছে। তবু যদি জেলে যেতে হয়, আমি যাব, সব দোষ আমি নিজে মেনে নেব'খন।

—কিন্তু দরকার কি শুনি এত হাঙ্গামায় ?

—সে তুই বুঝবি না।

বুঝুক না বুঝুক বিপিন ভয় পাইয়া গেল। একদিন চুপি চুপি গিয়া মাধবীলতাকে সাবধান করিয়া দিয়া আসিল। সব কথা সে ফাঁস করিয়া দিল তা নয়, আভাসে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে সদানন্দ বড় চটিয়াছে, সে যেন কখনো কোন অবস্থায় আশ্রমে না যায়।

—যেই নিতে আসুক, যে উপলক্ষেই নিতে আসুক, যেও না। উমা বা রতন এলেও নয়। বুঝেছ ?

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল—বুঝেছি, সব বুঝেছি। আপনি না বললেও আমি যেতাম না।

কয়েকদিন পরে উমা আর রত্নাবলী মাধবীলতাকে আনিতে গেল। সদানন্দ যেন কোথায় গিয়াছে, আশ্রমে মেয়েদের কি যেন একটা ব্রত আছে, কি যেন একটা বিশেষ কারণে বিপিন তাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে। মহেশ চৌধুরীর আর বিভূতির অবশ্য নিমন্ত্রণ আছে।

মাধবীলতা আসিল না, বিভূতিও নয়। মহেশ চৌধুরী শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। ব্রতের কোন আয়োজন নাই দেখিয়া সে আশ্চর্যও হইয়া গেল না, কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না। মেয়েদের ব্রত কোন ঘরের কোণে, গাছের নিচে বা পুকুর ঘাটে কিভাবে হয়

মেয়েরাই তা ভাল করিয়া জানে। নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া কেউ কিছু খাইতে দিল না দেখিয়াই সে একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। কে জানে, হয়তো ব্রত শেষ না হইলে খাইতে দিতে নাই। কিন্তু বেলা তিনটার সময়ও যদি ব্রত শেষ না হয়, না খাওয়াইয়া বসাইয়া রাখিবার জন্য কেবল তার বাড়ীর তিনজনকে নিমন্ত্রণ করিবার কি দরকার ছিল ?

সদানন্দ যেখানেই গিয়া থাক ফিরিয়া আসিয়াছে। মহেশ চৌধুরী তার কাছে গিয়া বসে। এদিকে বিপিন ভাবে, উমা আর রত্নাবলী যখন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে তারাই মহেশের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিবে। উমা আর রত্নাবলী ভাবে, বিপিন যখন নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিয়াছে, সে-ই জানে অতিথিকে কি খাইতে দেওয়া হইবে। বিপিন নিশ্চিন্তমনে কাজে বাহির হইয়া যায়। সদানন্দের কুটীরে মহেশকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া উমা আর রত্নাবলী নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করে।

সদানন্দ বলে—কি খবর মহেশ ?

মহেশ বলে—আজ্ঞে, খবর আর কি ?

মহেশ যেন 'প্রভু' শব্দটা উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

—কিছু উপদেশ দেবে না কি ?

—কি আর উপদেশ দেব বলুন ?

—এই আমার কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়—

মহেশ একটু ভাবিয়া বলে—উপদেশ তো নয়, পরামর্শ দিতে পারি। কথাটা মনে রাখলে কাজ দেবে। মানুষ যখন উঁচু পাহাড় পর্বতে ওঠে, কত যত্নে কত সাবধানে প্রাণপণ চেষ্টায় তিল তিল করে ওঠে, সময়ও লাগে অনেক। কিন্তু মানুষ যখন উঁচু থেকে হাত-পা এলিয়ে নিচে পড়ে, পড়বার সময় কোন কষ্টই হয় না, সময়টা কেবল চোখের পলকে ফুরিয়ে যায়"।

সদানন্দ গম্ভীর হইয়া বলে—পড়বার সময়টা ফুরিয়ে গেলেও অনেক সময় কষ্ট হয় না মহেশ। বরং উঁচু থেকে পড়লে চিরকালের জন্য কষ্ট ফুরিয়ে যায়।

—ঘুমিয়ে যায়, না শুরু হয়, কে তা জানে বলুন ?

—আমি জানি। যে সীমার মধ্যে কষ্ট সে সীমাই যদি পার হয়ে গেলাম তবে আর কষ্ট কিসের ? যারা বোকা তারাই বেঁচে থেকে রোগের জ্বালা শোকের জ্বালা সহ্য করে। অথচ আত্মহত্যা করা এত সহজ।

—আত্মহত্যা করা সহজ ? আত্মরক্ষা করা সহজ বলুন। আত্মহত্যা করা সহজ হলে মানুষের জীবনটাই আগাগোড়া বদলে যেত, সমাজ ধর্ম রীতিনীতি সুখ দুঃখ ভাবনা চিন্তা অনুভূতি সব অন্যরকম হত। ব্রহ্মচারী দু-চারজন আছে কিন্তু ব্রহ্মচর্য কি সহজ, না মানুষের পক্ষে সম্ভব ? আত্মহত্যা দু-চারজন করে, কিন্তু সেটাও সহজ নয়, মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। আপনি তো যন্ত্রণায় ক্ষেপে যাবার উপক্রম করেছেন, একবার দেখুন তো আত্মহত্যা করতে গিয়ে পারেন কি না ? কষ্ট পাবেন, বেঁচে থাকার সাধ থাকবে না, তবু বেঁচে থেকে কষ্ট ভোগ করবেন। এই সমস্যা আছে বলেই তো বেঁচে থাকার এত নিয়মকানুনের আবিষ্কার। আসল সাধু কি ঈশ্বরকে চায়, স্বর্গ চায়, পরকালের কথা ভাবে ? সাধু চায়, বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় বাঁচতে যখন হবেই, বাঁচার সব চেয়ে ভাল উপায় কি তাই আবিষ্কার করতে। অনেক যুক্তিই লাগসই মনে হয়, কিন্তু সব যুক্তি কি খাটে ? অতি তুচ্ছ বিষয়ে যুক্তি খাড়া করবার সময় বিচার করে দেখবেন, কত অসংখ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্তিটার যোগ আছে। কোন যুক্তিটা সবচেয়ে বেশী খাটবে কোনটা সবচেয়ে কম খাটবে ঠিক করতে নিরপেক্ষ মন নিয়ে জগতের সমস্ত যোগাযোগ বিচার করতে হয়। ওটা হল মহাপুরুষের কাজ। মূল্য যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করবার নাম সাধনা। এই জন্য সাধনা এত কঠিন। মানুষকে জানেন তো, মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মরবার সময় পর্যন্ত একগ্লাস জল আর একদলা সোনার মধ্যে বেছে নিতে বললে—

—আমি তাই করেছি, না ?—সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করে।

—হ্যাঁ, একেই পাপ বলে।

—পাপ ? অনুতাপ না হলে আবার পাপ কিসের ?

—অনুতাপ যদি না হয় তবে আর পাপ কিসের। হজম করতে পারলে আর শরীরের পুষ্টি হয়ে স্বাস্থ্য বজায় থাকলে রাশি রাশি অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়া আর দোষ কি! কিন্তু মুসকিল কি জানেন, অনুতাপ হয়। ভগবান দেন বলে নয়, লোকে বলে বলে নয়, অনুতাপ হওয়ার কথা বলেই অনুতাপ হয়। একটা কাজ করলে যদি আনন্দ হয়, আরেকটা কাজ করলে নিরানন্দ হতে পারে না ?

—সাধারণ লোকের হতে পারে, সকলের হয় না। মনকে যদি বশ করা যায়, আপসোস হতে না দিলে, কেন হবে ?

—সে তো বটেই, কিন্তু মনকে বশ করা চাই তো। অনুতাপ হয় এমন কাজ যারা করে তাদের মনটা কিছুতেই বশ হয় না। অনুতাপ বড় ভীষণ জিনিষ, মনকে একেবারে ক্ষয় করে দেয়। অনুতাপ এড়িয়ে চলাও বড় শক্ত, একটা নখ কাটার জন্য পর্যন্ত অনুতাপ হতে পারে কি না। যাই করুক মানুষ হয় সুখ পাবে নয় কষ্ট পাবে, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এর দুটোর একটা ঘটবেই ঘটবে। মহাপুরুষেরা এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটাবার উপায় দেখিয়ে দেন। অনুতাপ হবেই, তবে মারাত্মক রকমের না হয়। মারাত্মক অনুতাপ যাতে হয় তাকেই লোকে পাপ বলে। যেমন ধরুন, আপনি যদি গায়ের জোরে মাধুর ওপর অত্যাচার করেন—

সদানন্দ চমকাইয়া বলে—তার মানে ?

মহেশ শান্ত ভাবেই বলে—কথার কথা বলছি, একবার মাধুকে ধরে টানাটানি করেছিলেন কিনা, তাই কথাটা বলছি। ওরকম কিছু করলে আপনার অনুতাপ হবেই। হিসাব করে হয়তো দেখলেন ওজন্য অনুতাপ করা মনের দুর্বলতা, প্রকৃতির নিয়ম ধরে বিচার করলে ও কাজটা আপনার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি, তবু অনুতাপে আপনি ক্ষয় হয়ে যাবেন। উচিত হোক আর অনুচিত হোক, ঐ প্রতিক্রিয়াটা ঘটবেই। মনকে যদি এমন ভাবে বদলে দিতে চান যাতে ওরকম পাপ করেও অনুতাপ হবে না, তখন বিপদ হবে কি

জানেন, যত দিন পাপ করার ইচ্ছা না লোপ পাবে মনটা বদলাবে না। যোগসাধনার মূল নীতি এই। সাধারণ জীবনে উঠতে বসতে আমরা অসংখ্য ছোট বড় পাপ করি আর অনুতাপ ভোগ করি, সব সময় টেরও পাই না। সেই জন্য যোগসাধনার নিয়ম এত কড়া —ক'বার নিশ্বাস নিতে হবে তা পর্যন্ত ঠিক করে দেওয়া আছে। কামের চুলকানি জয় করলেই লোকে যোগী ঋষি হয় না, পিঠের চুলকানি পর্যন্ত জয় করতে হয়—নইলে মন বশে আসে না। তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিট তপস্যা করেও তো এক মিনিট শিষ্যকে দিয়ে ঘামাছি মারানোর জন্য তপস্যা বিফল হয়ে যায়!

—গায়ে ছাই মেখে যে তপস্যা—

মহেশ মৃদু হাসে, আপসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলে—আপনাকে বলা বৃথা, আপনি আমার কথা বুঝবেন না। গায়ে ছাই মেখে হাত উঁচু করে বসে থাকা কি তপস্যা? না আমি তপস্যার কথা বলছি? আমি বলছিলাম আপনার তপস্যার কথা, আপনি যে তপস্যায় দিন দিন সফল হচ্ছিলেন।

এবার সদানন্দ অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে—আমার আর কোন উপায় নেই?

—মনে তো হয় না। তবে তেমন গুরু যদি খুঁজে বার করতে পারেন—

শেষ বেলায় উপবাসী মহেশ বাড়ী ফিরিয়া গেল। খাইতে চাহিল মাধবালতার কাছে।

মাধবীলতা অবাক হইয়া বলিল—এ আবার কোন দেশী ব্যাপার, নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খেতে না দেওয়া!

যে ব্যাপার সে জানিত, তার চেয়ে এ ব্যাপারটা তার খাপছাড়া মনে হয়। তার সম্বন্ধে সদানন্দের খারাপ মতলব আঁটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু ডাকিয়া নিয়া গিয়া মহেশ চৌধুরীকে খাইতে না দেওয়ার কোন মানে হয়?

—বড় পাজী লোক ওরা।

—ছি মা, রাগ করতে নেই। কোন একটা কারণ নিশ্চয় ছিল, বিব্রত করার ভয়েই তো আমি বললাম না, নইলে চেয়ে খেয়ে আসতাম।

দুজনে এসব কথা বলাবলি করিতেছে, শশধরের বৌ খাবার আনিয়া হাজির। কোথায় সে থাকে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সব সময়েই বোধ হয় আশে পাশে আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া সকলের কথা শোনে।

মাধবীলতা কিন্তু হঠাৎ বড় চটিয়া গেল।

—সব ব্যাপারে তোমার বড় বাড়াবাড়ি। আমিই তো দিচ্ছিলাম ?

আড়ালে গিয়া শশধরের বৌ ঘোমটা ফাঁক করিয়া তাকে দেখাইয়া একটু হাসিল, হাতছানি দিয়া তাকে কাছে ডাকিল।

মাধবীলতা কাছে গেলে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—তোমার না আজ কিছু ছুঁতে নেই ?

মাধবীলতা চুপ করিয়া রহিল। সদানন্দের আশ্রমে নিমন্ত্রণ রাখিতে না যাওয়ার মিথ্যা অজুহাতের কথাটা তার মনে ছিল না।

•

এদিকে আশ্রমে তখন সদানন্দ বিপিনকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

—মাধু এল না কেন ?

উমা আর রত্নাবলীর কাছে বিপিন যা শুনিয়াছিল জানাইয়া দিল। সদানন্দ বিশ্বাস করিল না। দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল—ওসব বাজে কথা, আসল কথা আসবে না। না আসুক, আমিও দেখে নেব কেমন না এসে পারে। তোকে বলে রাখছি বিপিন, ওর সর্বনাশ করব, মহেশকে পথে বসাব, তবে আমার নাম সদানন্দ।

কয়েকদিন পরে মহেশের বাড়ীঘর বাগান আর আশ্রম পুলিশ তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করিয়া গেল। বিভূতির সঙ্গে যখন সংস্রব আছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ এরকম পুলিশের হানা দেওয়া আশ্চর্য নয়। তবু, বাহির হইতে তাগিদ না পাইলে এ সময়টা পুলিশ হয়তো বিভূতির নূতন আশ্রম নিয়া মাথা ঘামাইত না। বিভূতিকে যে লোকটি

কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিল, খবরটা সে-ই ফাঁস করিয়া দিয়া গেল। পুলিশের লোকটি একদিন সদানন্দকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, কথায় কথায় সদানন্দ নাকি এমন কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল যে তাড়াতাড়ি একটু অনুসন্ধান না করিয়া উপায় থাকে নাই।

—সত্যি, সত্যি, কিছু আরম্ভ করেছেন না কি আবার? উনি তো মিথ্যে বলবার লোক নন।

—উনিই মিথ্যে বলবার লোক।

পুলিশের লোকটি সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—বিয়ে যা করেছেন, একটু সাবধানে থাকবেন। আর কি ওসব ছেলে-মানুষী পোষায়?

পুলিশের খানাতল্লাসের পর মহেশের আশ্রমে লোকের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল। এতদিন পরে লোকের মুখে মুখে কি করিয়া যে একটা গুজব রটিয়া গেল, মহেশ চৌধুরী লোক ভাল নয় বলিয়া সদানন্দ তাকে ত্যাগ করিয়াছে, সাধু সদানন্দ।

রাগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বিভূতি বলিল—দেখলে বাবা তোমার দেবতার কীর্তি ?

মহেশ বলিল—ওর অধঃপতন হয়েছে।

বিভূতি নাক সিঁটকাইয়া বলিল—ও আবার ওপরে উঠল কবে, যে পতন হবে? ও লোকটা চিরকাল ভেতরে ভেতরে এমনি বজ্জাত। সাধে কি ওকে ঘুঁসি মেরেছিলাম।

ছেলের সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মহেশকে হাতুড়ি দিয়া নিজেকে আঘাত করিতে হইয়াছিল, ব্যাপারটা সহজে ভুলিবার নয়। মহেশ জিজ্ঞাসা করিল—ঘুঁসি মেরে লাভ কি হয়েছিল ?

—তোমার জন্যে—

—আমার কথা বাদ দিয়ে বল। আমি কিছু না করলেও তোর লাভটা কি হত ? চারিদিকে বিচ্ছিরি একটা কেলেঙ্কারি বেধে যেত, গাঁয়ের লোক আমাদের মারতে আসত, নিজে তুই রাগের যন্ত্রণায় ছটফট করতিস্—

মহেশের যুক্তিতর্ক কোন দিনই ভাল করিয়া বিভূতির মাথায় ঢোকে না, তার মনে হয় ছেলেবেলা হইতেই সে যা বলে আর ভাবে মহেশ ঠিক তার উল্টা কথাটা বলিয়া আসিতেছে। রক্তটা বিভূতির একটু গরম, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ আর কর্তব্যপ্রবণতা বাপের জীবন্ত দেবতার নাকে ঘুঁসি মারানোর মত উদ্ধত, মানুষের চাপে পৃথিবীতে মানুষ কষ্ট পায় বলিয়া তার আপসোসের সীমা নাই। তার আদর্শগুলি এমন যে কাজে কিছু করার সুযোগ না পাইলেও কেবল একটা দলে কয়েক মাস মেলামেশা করার জন্যই পুলিশ তাকে কয়েকটা বছর আটকাইয়া রাখিয়াছিল। মনটা যে বিভূতির একটু নরম হইয়াছে, সংসারের অন্যায়গুলির সঙ্গে রফা করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে সে যে প্রস্তুত হইয়াছে মালতীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী

হওয়াটাই তার প্রমাণ। তবু, মানুষের মন মানে না, কাজে না পারিলে তর্কে নিজেকে জাহির করে।

—তুমি বুঝি ভাব, তোমার জন্যে চুপ করে গিয়েছিলাম বলেই আমার রাগ কমে গিয়েছিল?

—ক্ষমা চাওয়ার জন্যে তো কমেছিল।

—তুমি আমাকে দিয়ে জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে, তাতে কখনো রাগ কমে?

—কমে বৈকি, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ক্ষমা চাইলেই মানুষের রাগ কমে যায়। তখন কি মনে হয় জানিস, মনে হয় এবারকার মত চুলোয় যাক, আবার যদি লোকটা কিছু করে তো দফা নিকেশ করে দেব। আমি জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে কি হবে, নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা তো তোকে সত্যি সত্যি চাইতে হয়েছিল। ক্ষমা চাওয়ার পর আগের মত জোরালো রাগ পুষে রাখতে মানুষের বড় বিরক্তি বোধ হয়।

বিভূতি বিশ্বাস করিল না। আগের বারের চেয়েও এবার তার বেশী রাগ হইয়াছিল। তার চলাফেরার দিকে পুলিশ একটু নজর রাখিবে, মাঝে মাঝে বাড়ী-ঘর খানাতল্লাস করিবে, এসব বিভূতির কাছে খাপছাড়া ব্যাপার নয়। এতকাল আটক রাখার পর তাকে পুলিশ একেবারে জন্মের মত ত্যাগ করিবে, বিভূতি নিজেও তা বিশ্বাস করে না। ছাড়া পাওয়ার পর সব সময়েই তার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া আছে, কখন আবার ডাক আসে। এমনিই পুলিশ যাকে বাগে পাওয়ার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে, তার নামে মিথ্যা করিয়া পুলিশের কাছে লাগানো। বিভূতির মনে ভয় ছিল, সকলের মনেই এ অবস্থায় থাকে, রাগের জ্বালায় তাই তার মনে হইতে লাগিল, ভোঁতা একটা দা দিয়া সদানন্দের গায়ের মাংস কাটিয়া নেয়।

এই অসম্ভব কাজটার বদলে একবার আশ্রমে গিয়া সদানন্দকে একটু ধমক দিয়া আসিবে কি না ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি অন্যমনস্ক হইয়া থাকে।

রাত্রে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে—কি ভাবছ ?

বিভূতি বলে—না। কিছু ভাবছি না।

মাধবীলতা গভীর আদরের সঙ্গে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলে—বল না, কি ভাবছ ?

দিনের বেলা মেলামেশা চলে, কিন্তু দিনের বেলা ভালবাসার খেলা মাধবীলতার পছন্দ হয় না। মাঝে মাঝে স্বামীর পাওনাগণ্ডার বিষয়টা খেয়াল না থাকিলে এমনও হয় যে, ফাঁকতালে একটু সোহাগ করিতে আসিয়া দু হাতের জোরালো ঠেলায় বিভূতি চমকিয়া যায়। তখন অবশ্য মাধবীলতার খেয়াল হয়, মৃদু তিরস্কারের স্বরে সে বলে—কি যে কর তুমি, চাদ্দিকে লোক রয়েছে না ? ওমা দরজা বন্ধ করে দিয়েছ ! বেশ লোক তো তুমি ?

তবু দিনে রাত্রে সব সময় মাধবীলতাকে নিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিবার অধিকার জন্মানোর অল্পদিনের মধ্যেই বিভূতি টের পাইয়া গিয়াছে, দিনের বেলা মিলনের আনন্দ ভোগ করার ক্ষমতাটা মাধবীর যেন ভোঁতা হইয়া যায়। ব্যাপারটা তার বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়, কারণ, রাত্রে মাধবীর তীক্ষ্ণতায় তাকেও মাঝে মাঝে বিব্রত হইতে হয়, ঘুম পর্যন্ত যেন মাধবীর চলিয়া যায়, বিভূতির ঘুম আসিলেও তাকে সে ঘুমাইতে দেয় না, প্রাণের চেয়ে যে প্রিয়তর তাকে পর্যন্ত ভালবাসিতে ভালবাসিতে শ্রান্ত হইয়া বিভূতি ঝিমাইয়া পড়িলে মাধবীলতা অক্লান্ত চেষ্টায় যেভাবে আবার তাকে বাঁচাইয়া তোলে, মানুষের বাস্তব জীবনে সে ধরণের অপরূপ কাব্যের স্থান আছে বিভূতি কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

বিভূতি বলে—পুলিশের কথা ভাবছিলাম। আবার যদি আমায় ধরে নিয়ে যায় ?

এক নিমেষে মাধবীলতা বদলাইয়া যায়, রুদ্ধশ্বাসে বলে—মাগো, পুলিশ দেখে আমার যা হচ্ছিল।

পুলিশ চলিয়া যাওয়ার পর আর তিন-চারবার এমনি ভাবে সে প্রায় এই কথাগুলিই বলিয়াছে। হঠাৎ একবার বিভূতির মনে হয়,

সব কি মাধবীলতার ন্যাকামি, বাড়াবাড়ি, হিষ্টিরিয়া ? কিন্তু এই টাইপের খাঁটি ন্যাকামি আর বাড়াবাড়ি আর হিষ্টিরিয়া ঠিক কি রকম—সে বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় সন্দেহের চোখে মাধবীলতার ভীত চোখ দুটি দেখিতে গিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যায়। কত জন্ম তপস্যা করিয়া সে এমন বৌ পাইয়াছে, কত ভাগ্য তার!

তখন মাধবীলতার ভয় দূর করার জন্য তাকে ভিতরের সব কথা খুলিয়া জানাইয়া দেয়, আশ্বাস দিয়া বলে যে, সমস্তটাই সাধু সদানন্দের কারসাজি, সদানন্দ পিছনে না লাগিলে পুলিশ আর তাকে জ্বালাতন করিতে আসিত না। ভয় নাই, মাধবীলতার কোন ভয় নাই, পুলিশ আর বিভূতিকে ধরিবে না, বৌকে এমনিভাবে বুকে করিয়া বিভূতি জীবন কাটাইয়া দিবে।

শুনিয়া, ভয়ে না যত হইয়াছিল মাধবীলতার চোখ তার চেয়ে বেশী রকম বিস্ফারিত হইয়া গেল।

—উনি! উনি এমন কাজ করলেন!

—কেন, ও কি এমন কাজ করতে পারে না ?

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল—পারে, ও লোকটা সব পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই। ওর মত ভয়ানক মানুষ—

মাধবীলতার ক্ষোভ-দুঃখের বাড়াবাড়ি দেখিয়া আবার বিভূতির মনে হইল সে যেন বাড়াবাড়ি করিতেছে। ভালবাসিতে আজ যেন মাধবী-লতার ভাল লাগিল না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার সে ওই কথাই আলোচনা করিতে লাগিল। প্রথমটা কয়েক মুহূর্তের জন্য বাড়াবাড়ি মনে হইলেও তার বিচলিত ভাব দেখিয়া বিভূতি আবার মুগ্ধ হইয়া গেল—কি ভালই মাধবীলতা তাকে বাসে!

বিভূতির এই কৃতজ্ঞতাই মাধবীলতাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। বড় সহজে বিভূতির মন ভুলানো যায়। একটু আদর-যত্ন করা, রূপের সামান্য একটু বিশেষ ভঙ্গি দেখানো, বিভূতির কাছে এ সমস্ত যে কত দামী বুঝিতে পারিয়া মাধবীলতা নিজেই অবাক হইয়া যায়। কত সহজে কত গভীর আনন্দ সৃষ্টি ও উপভোগ করা যায় মাঝে

মাঝে খেয়াল করিয়া নিজের অফুরন্ত মন-কেমন-করার অভিশাপ তার যেন অসহ্য ঠেকে। ভয়ানক কিছু, বীভৎস কিছু, প্রচণ্ড কিছুর জন্য কামনা যে স্বপ্নানুভূতির মত মৃদু অথচ মানসিক রোগের মত একটানা হইতে পারে, মাধবীলতার তা জানিবার বা বুঝিবার কথা নয়। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গে উঠিতে নামিতে তার প্রাণান্ত হইতে থাকে বলিয়া জীবনের প্রত্যেকটি সহজ সুখ ও আনন্দের জন্য বিভূতিকে মনে মনে সে প্রায় পূজা করে। বিচলিত ভাবটা যতক্ষণ না কমে ততক্ষণ অবশ্য বিভূতিকে বড় করার কথাটা তার খেয়ালও হয় না এবং বিচলিত ভাবটা কমিতে কমিতে মাঝরাত্রি প্রায় কাবার হইয়া যায়। তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় আপসোসের তার সীমা থাকে না। বিভূতির কপালে হাতের তালু ঘষিয়া দিতে দিতে সে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে —না না, তুমি ভেবো না, ও তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।

এতক্ষণ পরে নিজের দেওয়া আশ্বাস ফিরিয়া পাইয়া গভীর ঘুমের আক্রমণ আর বিভূতিকে কাবু করিতে পারে না, মাধবীলতার গোলামী করার একটা রোমাঞ্চকর সাধ বরং তাকে ছোট ছেলের মত লজ্জার হাসি হাসাইয়া দেয়।

তার মাথাটা সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাধবীলতা বলে—তোমার কিছু হলে আমি মরে যাব।

বিভূতি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

লণ্ঠনের বাদামী আলোয় মশারির ভিতরে ও বাহিরে গভীর রাত্রি রূপ নিয়াছে, লণ্ঠনের কাছের কয়েকটা জিনিস ছাড়া মশারির জন্য বাহিরের আর কিছু ভাল দেখা যায় না, রঙিন কুয়াশায় যেন একটু ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। স্টোভের পাশেই স্পিরিটের বোতলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে আবেগের ভাঙন-প্রবণতার জন্য মাধবীলতার চোখে যেন জল আসিয়া পড়ে। এমন কোমল কেন বিভূতি, এত বেশী ভাবপ্রবণ আর মমতাময়? এত অল্পে সে সন্তুষ্ট কেন, এত কম সে চায় কেন, এত কম সে নেয় কেন, কেন সে এত ব্যগ্র শুধু দেওয়ার জন্য? জেল আর ফাঁসীর ভয় তুচ্ছ করিয়া

যে বুক-কাঁপানো কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, অনায়াসে যে সদানন্দের নাকে ঘুঁসি মারিতে পারে, সে যেন মাটির পুতুল, মায়ের কোলের শিশু! তা হোক। তাই ভাল।

আরও জোরে বিভূতির মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া গায়ের জোরেই যেন মাধবীলতা স্পিরিটের বোতলটার দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনে।

—ঘুমোবে না?

—তোমার ঘুম পেয়েছে?

হাতের চাপ একটু আলগা করিয়া মাধবীলতা মৃদু হাসে—আমার ঘুম দিয়ে কি করবে, আমি তো দিনে ঘুমোই। তোমার ঘুম পেয়েছে কি না তাই বল।

পরদিন দুপুরে ঘুমানোর বদলে মাধবীলতা শশধরের বৌকে সঙ্গে করিয়া সদানন্দের আশ্রমের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। গেল প্রতিবেশী মনোহর দত্তের গরুর গাড়ীতে। আশ্রমে যাইবে শুনিয়া মনোহর দত্তের বুড়ো মা, বয়স তার প্রায় সত্তরের কাছে গিয়াছে, তাড়াতাড়ি নামাবলী গায়ে জড়াইয়া তাদের সঙ্গ নিল।

মনোহর দত্তের বৌ দেড়মাসের ছেলে কোলে করিয়া আপসোস করিয়া বলিল—আমিও যেতাম বাছা তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু আমার কপালে কি আর ধম্মো কম্মো আছে।

আগে মাধবীলতা শশধরের বৌকে কিছু বলে নাই, বাহির হওয়ার একটু আগে কেবল খবরটা দিয়াছিল। শশধরের বৌ তো শুনিয়া অবাক।

—আশ্রমে যাবে? সাধুবাবাকে তুমি এত ভক্তি কর তা তো জানতাম না ভাই।

—ভক্তি না তোমার মাথা। যাচ্ছি তার মুণ্ডপাত করতে। আমাদের বাড়ীতে পুলিশ লেলিয়ে দেয়, এমন আস্পদ্ধা!

শশধরের বৌ থতমত খাইয়া গিয়াছিল, একটু ভয়ও পাইয়াছিল।

বলিয়াছিল—বাড়ীতে ওঁরা জানতে পারলে কিন্তু বড্ড রাগ করবেন।

—বাবাকে বলে এসেছি।

চুপি চুপি কারো কাছে কিছু না বলিয়া যাইবে অথবা মহেশ চৌধুরীর অনুমতি নিয়া যাইবে—সমস্ত সকালটা মাধবীলতা আজ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। মহেশ চৌধুরী তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে দিতে রাজী হইবে কি না এ বিষয়ে মাধবীলতার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বলিয়া যাওয়াই ভাল মনে করিয়া অনুমতি চাহিতে গিয়া তার বিস্ময়ের সীমা থাকে নাই।

মহেশ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হইয়া বলিয়াছিল—আশ্রমে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে মা? বেশ তো। তারপর হাসিয়া বলিয়াছিল—পুরোনো সাথীদের দেখতে সাধ হচ্ছে?

মহেশ চৌধুরীই যে সদানন্দকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সদানন্দকে ভক্তি করার বদলে সে যে এখন তার অধঃপতনের জন্য আপসোস করে, এসব মাধবীলতার অজানা নয়। একটা প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করিয়া হাসিমুখে তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে অনুমতি দেওয়া মহেশ চৌধুরীর মত মানুষের পক্ষেও সম্ভব, মাধবীলতা ভাবিতে পারে নাই। সদানন্দের অধঃপতনে বিশ্বাস হইয়াছে, কিন্তু তাকে যে সদানন্দ সত্যই অপমান করিয়াছিল মহেশের মনে কি এ বিষয়ে একটু খুঁতখুঁতানিও জাগে নাই? যে কাণ্ডের ফলে নিজেকে তার হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিতে হইয়াছিল?

দুপুরবেলা আশ্রমে যে যার ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল, উমা ছিল রত্নাবলীর ঘরে। শশধরের বৌ আর মনোহর দত্তের মাকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতা প্রথমে সে ঘরে গেল তারপর সঙ্গী দুজনকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া একা দেখা করিতে গেল সদানন্দের সঙ্গে।

রত্নাবলী বলিল—একটু বোস্ না ভাই, দু দণ্ড গল্প করি। সেদিন তো কথা বলারই সময় পেলাম না।

সদানন্দের নির্দেশে উমার সঙ্গে মাধবীলতাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া রত্নাবলী একাই প্রায় তিনঘণ্টা মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিয়াছিল।

কিন্তু যে রকম রোমাঞ্চকর ভাবে মাধবীলতার বিবাহ হইয়াছে তাতে দু-চার ঘণ্টার গল্পে কি মনের কথা সব বলা হয়?

মাধবীলতা বলিল,—না ভাই, চট্ করে আগে দেখাটা করে আসি। সেদিন আসি নি বলে বড্ড চটে আছেন।

—তুই কি করে জানলি চটে আছেন?

—ওকে চিনি না আমি?

সদানন্দের মহলে ঢুকিতে গিয়া আগে দেখা হইল বিপিনের সঙ্গে। বিপিন তাকে দেখিয়াই বলিল—কি সর্বনাশ, তুমি এখানে!

—ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—কেন?

—আমার দরকার আছে।

—কি দরকার?

—আছে।

বিপিন খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল —সেদিন তোমাকে অত করে বুঝিয়ে বলে এলাম—

মাধবীলতার নিজেরও বুকের মধ্যে অকথ্য রকমের ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, তবু সে মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল—আপনার ভয় নেই, উনি আমার কিছু করতে পারবেন না। আপনার যত সব উদ্ভট ধারণা —উনি সে রকম মানুষ নন।

ইতিমধ্যে বিপিন একটু আত্মসম্বরণ করিয়াছিল, সে গম্ভীর মুখে বলিল—আমার যেমন ধারণাই থাক, ওঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। চল তোমাকে বাইরে রেখে আসি।

—কেন?

—কেন আবার কি? আমার আশ্রমে আমি যদি তোমায় ঢুকতে না দিই, তুমি কি গায়ের জোরে ঢুকবে?

কথা হইতেছিল সদানন্দের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়াইয়া। মাধবীলতার গলা শুনিয়া সদানন্দ আগেই দরজার কাছে উঠিয়া আসিয়া দুজনের কথা শুনিতেছিল, এবার ডাকিয়া বলিল—এসো মাধু

ভেতরে এসো। বিপিন তুমি একটু বাইরের দরজার কাছে বসবে যাও তো, কেউ এসে আমাদের বিরক্ত না করে।

আগাইয়া আসিয়া বিপিনের চোখের সামনে মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সদানন্দ তাকে ঘরের মধ্যে নিয়া গেল, বিপিনের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দিল দরজা।

মাধবীলতার আর্তকণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল—বিপিনবাবু! ও বিপিনবাবু!—তারপর স্পষ্টই বুঝা গেল সদানন্দ তার মুখে হাত চাপা দিয়াছে।

দরজার কাছে সরিয়া গিয়া বিপিন চাপা গলায় বলিল—সদা, তুই কি আমাদের সকলকে না ডুবিয়ে ছাড়বি না? দরজা খুলে দে—ওকে ছেড়ে দে।

সদানন্দ ভিতর হইতে বলিল—কেন ভাবছিস্ তুই? কিচ্ছু হবে না, তোর কোন ভাবনা নেই। যদি হয়, তোর বোকামির জন্যে হবে।

—তোর পায়ে পড়ি সদা।

—পায়ে পড়িস্ আর যাই করিস্ কিছু লাভ হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাধার মত কেন সময় নষ্ট করছিস্, একজন কেউ এসে পড়লে ভাল হবে? এই সোজা কথাটা তুই বুঝতে পারছিস্ না নচ্ছার, মাধু একা ফিরে গেলে ও কারো কাছে কিছু বলবে না। কিন্তু অন্য কেউ জানতে পারলে, না বলে মাধুর উপায় থাকবে না?

বিপিন জানিত মানুষটা সদানন্দ ভয়ানক, কিন্তু এতটা সেও ভাবিতে পারে নাই। এর চেয়ে ঢের বেশী অমানুষিক কাণ্ড সর্বদাই সংসারে ঘটে, কিন্তু নিজের সামনে না ঘটা পর্যন্ত নিজের জানাশোনা মানুষের সম্বন্ধে কে তা সম্ভব ভাবিতে পারে! বিপিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সদানন্দ যা বলিতেছে তাই করাই হয়তো ভাল, তা ছাড়া আর কি উপায় আছে!

ভিতর হইতে সদানন্দ বলিল—বিপিন, গেলি?

বিপিন বলিল—যাচ্ছি।

ধীরে ধীরে বিপিন সদরের দরজার দিকে আগাইয়া যায়, মাথার

মধ্যে তার যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতে থাকে। দরজা বন্ধ না করিয়া খোলা দরজার সামনেই সে বসিয়া থাকে। মাথার মধ্যে তার যত গোলই পাকাইয়া যাক, এ বুদ্ধিটা তার থাকে যে দরজা বন্ধ করার চেয়ে দরজা খুলিয়া রাখিয়া নিজে বসিয়া সকলের পথ আটকানো ভাল।

আশ্রমের একজন সামনে দিয়া যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করে—এখানে বসে আছেন ?

—এমনি। উনি একজনকে বিশেষ উপদেশ দিচ্ছেন—আমারও একটু দরকার আছে ওনার সঙ্গে।

বেলা পড়িয়া আসে, সামনে দিয়া আশ্রমের শিষ্য-শিষ্যার যাতায়াত বাড়িয়া যায়। কেউ কেউ বিপিনকে এখানে এভাবে বসিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে, কেউ দু দণ্ড দাঁড়াইয়া বাজে কথা বলিয়া যায়। চালার নিচে নিত্যকার সভার জন্য গ্রামবাসী নরনারী একে একে আসিয়া জমা হইতে থাকে। তৃষ্ণায় বিপিনের বুক ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হয় কিন্তু উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল যে খাইয়া আসিবে সে সাহসও হয় না, কাউকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিতে বলিতেও ভরসা পায় না।

শেষ বেলায় চালার নিচে সকলে সমবেত হইয়া অধীর আগ্রহে যখন সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতেছে, উমা আর রত্নাবলী শশধরের বৌকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতার খবর নিতে আসিল।

বিপিন পাংশু মুখে বলিল—উনি মাধুর সঙ্গে কথা বলছেন।

—এখনো কথা বলছেন !—রত্নাবলী বলিল।

বিপিন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—মাধুকে উনি একটু বেশী পছন্দ করেন। তা ছাড়া, অনেকবার আমায় বলেছিলেন, বিবাহিত জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে মাধুকে কিছু বলবেন। সে সব কথা বলছেন বোধ হয়।

রত্নাবলী বলিল—এতদিন এক বাড়ীতে থেকে বললেন না, এখন—

বিপিন বলিল—বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলে কি হবে? উনি য়্যাদ্দিন ইচ্ছে করেই কিছু বলেন নি। আজ মাধু নিজে শুনতে চাইল—

—আমরাও একটু শুনে আসি—বলিয়া রত্নাবলী ভিতরে ঢুকিতে যায়, বিপিন ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল—না মা, যেও না। উনি কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন।

কিন্তু রত্নাবলীকে আটকাইবার মত গায়ের জোর বিপিনের ছিল না, তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া রত্নাবলী ভিতরে চলিয়া গেল।

রত্নাবলীর মনটা একটু সন্দিগ্ধ।

সদানন্দের ঘরের সামনে রত্নাবলী একটু দাঁড়াইল। সন্দিগ্ধ মনে সাহস থাকে না, থাকে কৌতূহল। দরজা বন্ধ না খোলা? ঠেলা দিলেই যদি খুলিয়া যায়? সদানন্দ দরজা খুলিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে, কি চাই? বিপদ হিসাবে কোনটাই কম নয়।

সাহস যে মনে নাই, কৌতূহল দমন করার মত মনের জোর সে মন কোথায় পাইবে? দরজাটা ভেজানোই ছিল।

সদানন্দ খাটে বসিয়া আছে, পা ঝুলাইয়া। দুপাশে হাতের তালু দিয়া খাটে চাপ দিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় হাতের উপরেই শরীরের ভর দিয়া যেন সদানন্দ বসিয়াছে। মাধবীলতা বসিয়াছে মেঝেতে তার ঝুলান পায়ের কাছে—ঊর্ধ্বমুখী, উত্তেজিতা, শব্দময়ী মাধবীলতা! উপদেশ দেওয়ার কথা সদানন্দের, কিন্তু সে রীতিমত অস্বস্তির সঙ্গে মাধবীলতার বক্তৃতা শুনিতেছে।

সদানন্দের চোখে না পড়িলে রত্নাবলী হয়তো চোরের মত পলাইয়া যাইত, সদানন্দ তাকে দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে আহ্বান করিয়া বসায় সে সুযোগটা আর পাওয়া গেল না।

—এসো রতন।

মাধবীলতা মুখ নামাইয়া ভাল করিয়া গা ঢাকিয়া কুঁজো হইয়া বসিল। পায়ে পায়ে আগাইয়া আসিয়া রত্নাবলী তার কাছে বসিল

সন্তর্পণে। মনের মধ্যে তার ওলট-পালট চলিতেছিল। অবস্থা বিশেষে কত রকম সন্দেহই মনে জাগে।

—তুমি একা এসেছ রতন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাবলাম যে একবার—

—দেখে আসি ওঁরা কি করছে ?—সদানন্দ হাসিল। রত্নাবলীর বিব্রত ভাব দেখিয়া আবার বলিল—বন্ধুর জন্য ভাবনা হচ্ছিল, চাবুক মারছি না গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছি, ভেবে পাচ্ছিলে না, কেমন ? আশ্রম ত্যাগ করার জন্য আমি কাউকে শাস্তি দিই না রতন। যার গলায় খুশি মালা দিয়ে তুমিও যেদিন ইচ্ছা আশ্রম ছেড়ে চলে যেও, আমি কিছু বলব না।

সত্যমিথ্যায় জড়ানো কথা, না-চাওয়া কৈফিয়তের মত। সদানন্দের ভাবটা যেন নতুন জামাইয়ের মত, শালীর সঙ্গে ফাজলামি করিতেছে। রত্নাবলী কিছুই বুঝিতে পারে না, কারণ, বুঝিবার মত কি যেন একটা জ্ঞান মনের অন্ধকার তলা হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে চাকায় লাগা নোংরা কিছুর মত পাক খাইয়া নিচে তলাইয়া যায়। সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

সকলে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন ? মাধবীলতা তাই বলে—এবার থেকে মাঝে মাঝে আশ্রমে আসব ভাই। ওঁকে প্রণাম করে যাব।

তারপর আবার তিনজনেই চুপ করিয়া থাকে, তবে বেশীক্ষণের জন্য নয়। একটু পরেই বিপিন আসিয়া গম্ভীর মুখে খবর দেয় যে, চালার নিচে বসিয়া বসিয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছে, অনেকে অপেক্ষা করিতেছে। সদানন্দ যদি না যায়, বিপিন তাদের খবরটা দিতে পারে।

—চল যাচ্ছি।—সদানন্দ যেন একটু ব্যস্ত হইয়াই চলিয়া গেল।

তারপর দুজনে চুপচাপ বসিয়া থাকে। অনেকক্ষণ। শেষে মাধবীলতাই বলে—এখানে বসে থেকে কি হবে, চলো আমরাও যাই।

—আশ্রমে থাকবে নাকি আজ ?

—থাকবার কি উপায় আছে ভাই ? তোমার ঘরে বসে নিরিবিলি দু দণ্ড কথা বলিগে চল।

রত্নাবলীর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, সে খানিক খানিক জানে কিন্তু সব জানে না। সব তাকে জানানো হয় নাই বলিয়া অভিমানে প্রশ্নগুলি গলার কাছে আসিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল। তবে জানার সাধটা জোরালো হইলে প্রায় সব মেয়েরাই খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাসির ধাক্কাতেই দারুণ অভিমানের বাধা ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে পারে। জিজ্ঞাসা তাই হয় আকস্মিক।

—হঠাৎ এলে যে ?

—হঠাৎ এলাম ? ও, হঠাৎ কেন এলাম ? এমনি এলাম আর কি।

—এমনি এলে না তোমার মাথা এলে। ছি, ধিক, তোকে। ঘরে যদি মন না বসে, ঘরের বৌ সাজতে গেলি কেন ? কে তোর পায়ে ধরে সেধেছিল।

— একজন সেধেছিল ভাই।

ফাঁকি দেওয়া হাসি-হাসি ভঙ্গির সঙ্গে হাল্কা কথা রতনকে রাগে যেন অন্ধকার দেখাইয়া দেয়। আশ্রমের মানুষ-দেবতার পূজার জন্য কোন গ্রামের কে যেন কি উপলক্ষে এক বোঝা নৈবেদ্য পাঠাইয়াছিল, আশ্রমের সকলেই ভাগ পাইয়াছে। ক্রুদ্ধ চোখে চাহিতে চাহিতে রত্নাবলী বন্ধুর জন্য একটা পাথরের থালায় ফলমূল আর মিষ্টান্ন সাজাইতে থাকে। সন্দেহটা মনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। মনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না জানিলেও মানুষের বড় বড় ভাবপরিবর্তনের মধ্যে মনের পরিবর্তন আবিষ্কার করা যায়। ভদ্র গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে সামাজিক বিবাহের ফলে জীবনের সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি যার কাছে এমন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে প্রায় মুচকি একটু হাসি পর্যন্ত অন্যায় মনে হইত, বন্ধুর এরকম সাংঘাতিক জেরার সময় সে যদি এমন শয়তানি ভরা ফাজলামি করিতে পারে, কিছু একটা

ঘটিয়াছে বৈকি। হায়, মাঝখানে কিছুদিনের ছেদ পড়িয়া সদানন্দের সঙ্গে আবার কি মাধবীলতার আগের সম্পর্ক পাতানো হইয়া গেল ?

—খা।

—তুইও বোস ভাই, তুজনে একসঙ্গে খাই।

এতক্ষণে, মাধবীলতা যখন এক টুকরা ফল মুখে তুলিতেছে, রত্নাবলীর নজর পড়িল, মাধবীলতার ডান হাতের কব্জির কাছটা লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

—হাতটা প্রায় ভেঙ্গে গেছে ভাই, গায়ে কি জোর মানুষটার !

চিবানো ফলের সঙ্গে ঢোক গিলিয়া রত্নাবলী ভোল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করে—কেন, এত জোরে হাত ধরল কেন ?

মাধবীলতা হাসিয়া বলে—রাগের চোটে, আবার কেন !

—তারপর ?

—তারপর আবার কি ? আমি কটমট করে তাকাতে হাত ছেড়ে দিয়ে বকবকানি আরম্ভ করে দিল।

মাধবীলতা তৃপ্তির হাসি হাসে।

সত্য কথা বলিতে কি, মাধবীলতা কটমট করিয়া তাকানোর অবসর বেশিক্ষণ পায় নাই। অবসর পাইলেও সে তাকানিতে বিশেষ কোন কাজ হইত কি না সন্দেহ। মূর্ছার উপক্রম হইলে যেমন হয়, মাথাটা সেই রকম বোঁ বোঁ করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করায় সে চোখ বুজিয়া মূর্ছা গিয়াছিল। সদানন্দের চোখ মুখ দেখিয়া সে যেমন ভয় পাইয়াছিল, অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ ভূত দেখিলেও সেরকম ভয় পাইত কেনা সন্দেহ। তার মুখের সে বীভৎস ভঙ্গি আর চোখের মারাত্মক দৃষ্টির মধ্যে পাশবিক কামনার একটু চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলে মাধবীলতা হয়তো মূর্ছার চরম শিথিলতা আনিয়া সদানন্দের আলিঙ্গনে গা এলাইয়া দিত না, আলিঙ্গন আরেকটু জোরালো হইলেই সে দেহের কয়েকটা পাঁজর নির্ঘাৎ মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইত। মাধবীলতা নিঃসন্দেহে টের পাইয়াছিল, সদানন্দ তাকে খুন করিবে —সঙ্গে সঙ্গেই হোক অথবা অকথ্য যন্ত্রণা দিবার পরেই হোক। খবরের কাগজে যে সব খুনের খবর বাহির হয়, সোজাসুজি সেই রকম অভদ্র অমার্জিত হত্যা, উপন্যাসের পাষণ্ডেরা যে রকম রসালো খুন করে সে রকম নয়।

মাধবীলতার ভয় পাওয়ার আরেকটা কারণ ছিল।

সদানন্দ তখন মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে, তাকে নূতন আশ্রমে সরানোর আয়োজন চলিতেছে। একদিন হঠাৎ নির্জন বারান্দায় সদানন্দের সামনে পড়িয়া সে পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছে, সদানন্দ ডাকিয়া বলিয়াছিল—একটা কথা শোন মাধু।

মাধবীলতা কথা শুনিতে দাঁড়ায় নাই। তখন তীব্র চাপা গলায় সদানন্দ বলিয়াছিল—একদিন তোমায় হাতে পেলে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেব।

তখন কথাটার দাম ছিল না। আজ মূর্ছা যাওয়ার আগে মনে হইয়াছিল, সদানন্দের পক্ষে ও কাজটা অসম্ভব কি ?

বিভূতি জিজ্ঞাসা করে—কেন গিয়েছিলে ?

মাধবীলতা জবাব দেয়, তোমার পেছনে কেন পুলিশ লেলিয়ে দিল!

মাধবীলতার সর্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, জাগিয়া আছে তবু ঘুমেই দু চোখ বুজিয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে একটা ধিক্কার ভরা আর্তনাদ গুনগুনানো গানের মত মৃদু চাপা সুরে গুমরাইতেছে। কি হইয়াছে ? কেন হইয়াছে ? কোথায় হইয়াছে ? কবে হইয়াছে ? কিছুই যেন মনে নাই। অবসাদের যন্ত্রণা যে এমন বৈচিত্র্যময় সকলেই তা জানে, তবু সকলের পক্ষেই এটা 'কে তা জানিত'র পর্যায়ের।

[ লেখকের মন্তব্য : অনেকে বিশ্বাস করে না, তবু জীবনের একটা চরম সত্য এই যে, সমস্ত অন্যায় আর দুর্নীতির মূল ভিত্তি জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়—ব্যক্তিগত অথবা সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের। যতই বিচিত্র আর জটিল যুক্তি ও কারণ মানুষ খাড়া করুক, ভাল-মন্দ-উচিত-অনুচিত মানুষ ঠিক করিয়াছে এই একটিমাত্র নিয়মে। অবশ্য, মানুষের ভুল করা স্বভাব কিনা, তাই এমন একটা সোজা নিয়ম মানিয়া জীবনের রীতিনীতি স্থির করিতে গিয়াও কত যে ভুল করিয়াছে তার সংখ্যা নাই।

মাধবীলতার তৃপ্তি উবিয়া যায় নাই, অবসাদের যন্ত্রণার নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে মাত্র। এটা অনুতাপ নয়। ]

সে রাত্রে আর বেশী জেরা করা গেল না। কারণ, বিড়বিড় করিয়া কয়েকটা ভাঙা ভাঙা দুর্বোধ্য কথা বলিতে বলিতে মাধবীলতা ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সে অনেক কথাই বলিল বটে কিন্তু বিভূতি ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। মাধবীলতার অনেক কথার মানেটা দাঁড়াইল সেই একই কথায়, সে গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া বলিয়া আসিয়াছে বিভূতির পিছনে আর যেন সদানন্দ পুলিশ না

লাগায়। কথাটা জটিলও নয়, দুর্বোধ্যও নয়, তবু বিভূতির মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতা যেন একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ব্যাখ্যা আর কৈফিয়তের বদলে একটা হেঁয়ালি রচনা করিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে মাধবীলতা একদিন যার বিরুদ্ধে তার কাছে নালিশ করিয়াছিল আর সে যাকে গিয়া মারিয়াছিল ঘুঁসি, এতকাল এক বাড়ীতে আর বাড়ীর কাছে আশ্রমে থাকার সময় যে মাধবীলতা তার ধারে কাছে ঘেঁষে নাই, এখন বলা নাই কওয়া নাই এত দূর আশ্রমে গিয়া তার হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিয়া আসিল সে যেন বিভূতির পিছনে আর পুলিশ না লেলাইয়া দেয়! কচি খুকী তো সে নয় যে এটুকু জ্ঞান তার নাই, এভাবে তার সদানন্দের হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না? তার ভালর জন্য গিয়াছিল? তার বিপদের ভয়ে দিশেহারা হইয়া? কথাটা ভাবিতে ভাল লাগে কিন্তু বিশ্বাস যে করা যায় না! দিশেহারা আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুতেই প্রকাশ পায় না সে আবার কোন দেশী সৃষ্টিছাড়া প্রেম, সে প্রেম মাধবীলতা পাইলই বা কোথায়? তা ছাড়া দিশেহারা আতঙ্কের আর কোন লক্ষণ তো তার মধ্যে দেখা যায় নাই।

মনটা এমন খারাপ হইয়া গেল বিভূতির বলিবার নয়। আটক থাকার সময় প্রায়ই যেমন মনে হইত সব ফাঁকি আর সব ফাঁকা, কাঁটা বিছানো বিছানায় এপাশ ওপাশ করাটাই জীবন আর মেশানো আলো অন্ধকারের আবছা অর্থহীন উপমার মত স্মৃতি-কল্পনা আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের খিচুড়ি পাকানো ভোঁতা অনুভূতিগুলির মাথার মধ্যে মাথাধরার মত টিপ টিপ করাটাই বাঁচিয়া থাকার একমাত্র অভিব্যক্তি, আজ তেমনি মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতাও যে তার আপন নয় এই সত্যটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হওয়াটাই তাকে আপন করিতে চাওয়ার একমাত্র সম্ভবপর পরিণতি। আটক থাকার সঙ্গে মাধবীলতা আপন নয় ভাবার পার্থক্য অনেক, কিন্তু মন খারাপ হওয়াটা একরকম কেন, এই দার্শনিক সমস্যাটা মনে উদয় হওয়ায় বিভূতি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল এবং সকল অবস্থার সুখ-দুঃখ একই

রকম কিনা ভাবিতে আরম্ভ করায় আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘটিয়া গেল স্নায়বিক বিপর্যয়। তখন মৃদুস্বরে সে ডাকিল--মাধু ?

আজ অবসাদ কমিয়াছে, কারণ বিভূতির রকম-সকম দেখিয়া অল্প অল্প ভয়ের উত্তেজনা আসিয়াছিল। ঘুম তাই একেবারেই আসে নাই। ঘুমের ভানে মাধবীলতা এমন ভাবেই সাড়া দিল যে পরমুহূর্তে আকস্মিক আবেগে বিভূতি তাকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু কি মৃদু আর সশঙ্ক সে আলিঙ্গন, পাঁজর যদি মাধবীলতার পাটখড়ির হইত তবু ভাঙিবার কোন ভয় ছিল না।

অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেলে হয়তো আবার একদিন আশ্রমে যাওয়ার সাধটা মাধবীলতার অদম্য হইয়া উঠিত কিন্তু কয়েকটা দিন কাটিবার আগেই একদিন মহেশ চৌধুরী বলিল—চল মা একবার আশ্রম থেকে ঘুরে আসি।

না গেলেও চলিত, খুব বেশি ইচ্ছাও ছিল না যাওয়ার, তবু মাধবীলতা শ্বশুরের সঙ্গে আশ্রমে বেড়াইতে গেল। তখন সকালবেলার মাঝামাঝি, আবহাওয়া অতি উত্তম। এক বছর সদানন্দের উপদেশ শোনার চেয়ে এক বছর আশ্রমে পায়চারি করিলে প্রকৃতির প্রভাবেই মনের বেশী উন্নতি হয়। মহেশ চৌধুরীকে একটু চিন্তিত দেখাইতেছিল। চিন্তা মহেশ চৌধুরী চিরকালই করিয়া থাকে কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে এখন তার মুখের ছাপটা দুর্ভাবনার। কি হইয়াছে কে জানে!

গাছতলায় আশ্রমের সকলে সদানন্দকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনে শিষ্যবেষ্টিত ঋষির ছবি যার কল্পনায় আছে, দেখিলেই তার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহেশ চৌধুরী ভুরু কুঁচকাইয়া বিস্ময়ের সঙ্গে চাহিয়া থাকে আর মৃত্যুর মধ্যে জীবনের কতখানি শেষ হইয়া যায় সকলকে তার হিসাব বুঝাইতে বুঝাইতে হাসিমুখে সদানন্দ মাথাটা হেলাইয়া তাকে অভ্যর্থনা জানায়। মাধবীলতা রত্নাবলীর কাছে গিয়া বসে আর সদানন্দের ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া মহেশ চৌধুরী বসে সকলের পিছনে। কয়েক মিনিটের মধ্যে

বেশ বুঝিতে পারা যায় একমনে সে সদানন্দের কথা শুনিতেছে, অসম্ভব কিছু সম্ভব হইতে দেখিবার বিস্ময়ের সঙ্গে।

অন্য সকলের, পুরুষ ও নারীদের, বিস্ময় নাই। সকলে মুগ্ধ, উত্তেজিত। কথা শেষ করিয়া সদানন্দ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে একা নদীর দিকে আগাইয়া যায়। যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ক্ষণকালের স্তব্ধতার শেষে শুরু হয়, তার মধ্যে অনেকগুলি আত্মসমর্পিত মনের সার্থকতার আনন্দ যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের মত প্রাঞ্জল মনে হয়। অন্ততঃ মহেশের যে মনে হয় তাতে সন্দেহ নাই, কারণ সে আরও বেশী থতমত খাইয়া সদানন্দের গতিশীল মূর্তির দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

রত্নাবলীর সঙ্গে তার কুটীরে যাওয়ার আগে মাধবীলতা তাকে খবরটা দিতে আসিল, ফিরিবার সময় যাতে তাকে খোঁজ করার হাঙ্গামা না বাধে।

মহেশ চৌধুরী বলিল—আমরা আজ এখানে থাকব মাধু।

—সারাদিন?

—সারাদিন তো বটেই, সারারাতও থাকতে পারি।

মাধবীলতা এই উদ্ভট সিদ্ধান্তের কারণটা জানিবার চেষ্টা আরম্ভ করার আগেই মহেশ চৌধুরী উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ তখন চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। নদীর ধারে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তার দেখা না পাইয়া মহেশ চৌধুরী অবশ্য বুঝিতে পারিল যে নদীর দিকের খিড়কী দরজা দিয়া সদানন্দ কুটীরে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিজে সে কুটীরে ঢুকিল না। রত্নাবলীর কুটীরে ফিরিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বলিল—ওঁকে একবার ডেকে আন তো মাধু।

মাধবীলতা অবাক।—ডেকে আনব? এখানে?

—হ্যাঁ। বলগে আমি একবার দেখা করতে চাই।

মহেশ চৌধুরী হুকুম দিয়া ডাকিয়া আনিয়া দেখা করিবে সদানন্দের সঙ্গে! প্রতিবাদ করিতে গিয়া কিছু না বলিয়াই

মাধবীলতা চলিয়া গেল। হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল মহেশ চৌধুরীর পাগলামীর মানে বুঝিবার ক্ষমতা এতদিন এক বাড়ীতে থাকিয়াও তার জন্মে নাই।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে রত্নাবলী যখন ব্যস্ত আর বিব্রত হইয়া বার বার বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে তার একবার গিয়া খোঁজ করিয়া আসা উচিত, মাধবীলতা ফিরিয়া আসিল। সদানন্দ বলিয়া পাঠাইয়াছে, দেখা করিবার দরকার থাকিলে মহেশ চৌধুরী যেন সন্ধ্যার পর তার সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসে। শুনিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল—চল আমরা ফিরে যাই মাধু।—

—সারাদিন এখানে থাকবেন বলেছিলেন যে?

—আর থেকে কি হবে? ভেবেছিলাম মানুষটা বুঝি হঠাৎ বদলে গেছে, কিন্তু মানুষ কি কখনো বদলায়?

মানুষ যে বদলায় না, তার আরেকটা মস্ত বড় প্রমাণ পাওয়া গেল ফিরিবার পথে। চরডাঙ্গা গ্রামের কাছাকাছি মস্ত একটা মাঠে পঁচিশ-ত্রিশ জন অর্ধ উলঙ্গ নোংরা মানুষকে আত্মহত্যা করিতে বিভূতি নিষেধ করিতেছে। মুখে ফেনা তুলিয়া এমনভাবে নিষেধ করিতেছে যেন কোন রকমে এই লক্ষ্মীছাড়া বোকা মানুষগুলোকে কথাটা একবার বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তারা হত্যা করিবে তবু আর এভাবে আত্মহত্যা করিবে না।

একসঙ্গে খাইতে বসিয়া মহেশ চৌধুরী সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিল—আবার কি তুমি জেলে যেতে চাও?

—সাধ করে কেউ জেলে যায়?

বিভূতির মেজাজটা ভাল ছিল না।

—অমন করে ওদের ক্ষেপিয়ে তুললে জেলেই তো যেতে হয় বাবা? একটু কিছু ঘটলেই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

—নেয় নেবে।

মহেশ চৌধুরী ডালমাখা ভাত খায় আর ভাবে। বুঝাইয়া কোন লাভ হইবে না। এই কথাটাই অনেকবার অনেক ভাবে ছেলেকে সে

বুঝাইয়াছে যে, অকারণে জেলে গিয়া কোন লাভ হয় না, সেটা নিছক বোকামি—কাজের মত কোন কাজ করিয়া ছেলে তার হাজার বার জেলে যাক, হাজার বছরের জন্য জেলে যাক, মহেশ চৌধুরীর তাতে তো কোন আপত্তি নাই! কিন্তু পাহাড়ে উঠিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মত, দেশ আর দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য চোখ কান বুজিয়া জেলে যাওয়ার তো কোন অর্থ হয় না। মনে হইয়াছিল, বিভূতি বুঝি কথাটা বুঝিতে পারিয়াছে—বিভূতি চুপচাপ শুনিয়া গিয়াছে, তর্কও করে নাই, নিজের মতামত জাহির করিবার চেষ্টাও করে নাই। আজ আবার মহেশ চৌধুরীর মনে হইতে লাগিল, অনেকদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া সে শুধু বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটি এড়াইয়া চলিয়াছিল, কথাগুলি তার মাথায় ঢোকে নাই।

একবার ঢোঁক গিলিয়া মহেশ চৌধুরী এক চুমুকে জলের গ্লাসটা প্রায় অর্ধেক খালি করিয়া ফেলিল। ছেলেও যদি তার সহজ সরল কথা না বুঝিয়া থাকে—অথবা এসব কথা বুঝিবার নয়? মানুষ যা করিতে চায় তাই করে?

অল্প দূরে মহেশের পোষমানা বিড়ালটি ঘুপটি মারিয়া বসিয়াছিল। মাছের ঝোল পরিবেশন করিতে আসিবার সময় বেচারীর লেজে কি করিয়া মাধবীলতার পা পড়িয়া গেল কে জানে, চমক দেওয়া আওয়াজের সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া মাধবীলতার নতুন সাড়ীখানি আঁচড়াইয়া ছিঁড়িয়া দিল। মাছের ঝোলের থালাটি মাটিতে পড়িয়া গেল, বিড়ালটির মতই বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিয়া পিছু হটিতে গিয়া মাধবীলতা ধপাস করিয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল—পা ছড়াইয়া বসিবার ভঙ্গিতে। গায়ে তার আঁচড় লাগে নাই, পড়িয়া গিয়াও বিশেষ ব্যথা লাগে নাই কিন্তু চীৎকার শুনিয়া মনে হইল তাকে বুঝি বাঘে ধরিয়াছে।

কাঠের মোটা একটা পিঁড়ি কাছেই পড়িয়াছিল, দু হাতে পিঁড়িটা তুলিয়া নিয়া এমন জোরেই বিভূতি বিড়ালটিকে মারিয়া বসিল যে মরিবার আগে একটা আওয়াজ করার সময়ও বেচারীর জুটিল না।

সকলের আগে মহেশ চৌধুরীর মনে হইল তার পোষমানা জীবটি আর কোনদিন লেজ উঁচু করিয়া তার পায়ে গা ঘষিতে ঘষিতে ঘড়্‌ ঘড়্‌ আওয়াজ করিবে না। তারপর অনেক কথাই তার মনে হইতে লাগিল।

জটিল, খাপছাড়া সব রাশি রাশি কথা—চিন্তাগুলি যেন ছেঁড়া কাগজের মত মনের ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় এলোমেলো উড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এরকম অবস্থায় মহেশ চৌধুরী কথা বলে না। তা ছাড়া আর উপায় কি আছে? এমন অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে যে বিচার-বিবেচনার পর একটা কিছু সিদ্ধান্ত দিয়া না বুঝিলে মনের ভাব আর প্রকাশ করা যায় না। আত্ম-বিরোধী মত যদি কিছু প্রকাশ করিয়া বসে? সেটা প্রায় সর্বনাশের সামিল। কেন সর্বনাশের সামিল তা অবশ্য মহেশ চৌধুরী কখনও ভাবিয়া দেখে নাই, তবে ক্ষতির সম্ভাবনাকে আত্মরক্ষী জীবমাত্রেই ভয় করে। নিজের সুখদুঃখকে পরের সুখদুঃখের মুখাপেক্ষী করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তার একমাত্র বর্ম। রাগে দুঃখে অভিমানে বিচলিত হওয়া মহেশ চৌধুরীর পক্ষে সম্ভব কিন্তু উচিত কি অনুচিত না জানিয়া পোষা একটা বিড়ালকে মারার জন্য বিভূতিকে চড়-চাপড়টা মারিয়া বসাও সম্ভব নয়, গালাগালি দেওয়াও সম্ভব নয়।

কয়েকবার ঢোঁক গিলিয়া মহেশ চৌধুরী একেবারে চুপ করিয়া যায়। অন্য বিষয়েও একটি শব্দ আর তার মুখ দিয়া বাহির হয় না। খাওয়াও তখনকার মত শেষ হয় সেইখানে।

বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ মরা বিড়ালটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাধবীলতা প্রথম ভয়ে ভয়ে কথা বলে—কেন মারলে? কি নিষ্ঠুর তুমি!

—যেখানে যেখানে আঁচড়ে দিয়েছে, আইডিন লাগিয়ে দাও গিয়ে।

—আঁচড় লাগে নি।

কথাটা বিভূতি সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না। একটুও আঁচড় দেয় নাই? একেবারে না? কি আশ্চর্য ব্যাপার! তবে তো বিড়ালটাকে না মারিলেও চলিত। বোকার মত একটু হাসে বিভূতি, মরা বিড়ালটার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া নেয়। বেশ বুঝিতে পারা যায় সে যেন একটু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে,—বিস্ময়ে নয়, ব্যথা লাগে না এমন কোন আকস্মিক ও প্রচণ্ড আঘাতে। মহেশ চৌধুরীর নির্বাক থাকার চেয়ে বড় সংযম যেন বিভূতির দরকার হইতেছে শুধু সহজ নির্বিকার ভাবটা বজায় রাখিতে। বিচলিত হওয়ার উপায় তো বেচারীর নাই। মনের কোমল দুর্বলতা যদি প্রকাশ পাইয়া যায়? সেটা প্রায় সর্বনাশের সামিল। কেন সর্বনাশের সামিল তা অবশ্য বিভূতি কখনও ভাবিয়া দেখে নাই, তবে অন্যায়-বিরোধী মানুষ মাত্রেই নিজের দুর্বলতাকে চাপা দিতে চায়। পরের দুঃখ কমানোর জন্য নিজের দুঃখকে তুচ্ছ করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তারও একমাত্র বর্ম। অনুতাপে থতমত খাইয়া যাওয়া বিভূতির পক্ষে সম্ভব কিন্তু স্ত্রীকে আক্রমণ করার জন্য তুচ্ছ একটা বিড়ালকে শাস্তি দিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

চাকর বিড়ালের দেহটা তুলিয়া নিয়া যায়, বিভূতি আবার খাইতে আরম্ভ করে। খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে সে আত্মসম্বরণ করিতে থাকে। আত্মসম্বরণ করিতে সময় তার বেশীক্ষণ লাগে না, খাওয়া-দাওয়ার পর মাধবীলতা যখন আজ শশধরের বৌয়ের সঙ্গে গল্প করার বদলে পান হাতে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, বিভূতির মন তখন কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন করার গাঢ় আর আঠার মত চটচটে তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। দুপুরটা সেদিন দুজনের গভীর আনন্দে কাটিয়া গেল। পুরুষ আর নারীর প্রথম যৌবনের সব দুপুর ওরকম আনন্দে কাটে না।

বিভূতির মা ঘরে যায় দুধের বাটি হাতে। মহেশ এক রকম কিছুই খায় নাই।

—খাও।

মহেশ কথা বলে না, শুধু মাথা নাড়ে। কিন্তু শুধু মাথা নাড়িয়া পতিব্রতা স্ত্রীকে কে কবে ঠেকাইতে পারিয়াছে? শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতে হয়—কেন জ্বালাতন করছ? এখন কিছু খাব না।

—কেন খাবে না?

বিভূতির মার নিজেরও খাওয়া হয় নাই, ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতেছিল আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মহেশ যখন সংক্ষেপে কৈফিয়ৎ দেয় যে, মনের উত্তেজনার সময় খাইলে শরীর খারাপ হয়—বিভূতির মার মেজাজ রীতিমত গরম হইয়া উঠিয়াছে।

—'কচি খোকার মত কি যে কর তুমি!

ভাল করিয়া কথা বলিলে, এমন কি রীতিমত ঝগড়া করিলেও, হয়তো বিভূতির মা তখনকার মত শুধু রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া যাইত, এক ঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়া আসিত দুধের বাটি হাতে। কিন্তু এভাবে কথা পর্যন্ত বলিতে না চাহিলে কি মানুষের সহ্য হয়? বিভূতির মা তো আর জানিত না, নিজের মনের সঙ্গে মহেশ বুঝাপড়া করিতেছে, কত যে বিচার-বিশ্লেষণ চলিতেছে তার সীমা নাই। খোলা দরজা দিয়া দুধের বাটিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিভূতির মা আগাগোড়া একটা বিছানার চাদর মুড়ি দিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিল।

তখন মনটা মহেশ চৌধুরীর বড় খারাপ হইয়া গেল। কি দোষ করিয়াছে বিভূতির মা? অন্যের পাপে সে কেন কষ্ট পায়? সেদিনের কথা মহেশের মনে পড়িতে থাকে, সদানন্দের কুটীরের সামনে তার সঙ্গে বিভূতির মা যখন গাছতলায় বৃষ্টিতে ভিজিতেছিল। বিছানার একপ্রান্তে পা গুটাইয়া বসিয়া মহেশ ভাবিতে থাকে। বিভূতির মাকে তুলিয়া খাওয়ানো যায়, সেটা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কি লাভ হইবে? বিভূতির সম্বন্ধে যা সে ভাবিতেছে তাই যদি স্থির করিয়া ফেলে, তখন বিভূতির মাকে যে কষ্টটা ভোগ করিতে হইবে তার তুলনায় এখনকার এ কষ্ট কিছুই নয়।

বিভূতিকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিবে কি না, এই

কথাটাই মহেশ ভাবিতেছিল। বিড়াল মারার জন্য নয়, বিভূতির প্রকৃতি যে কখনও বদলাইবে না এটা সে ভাল করিয়া টের পাইয়া গিয়াছে বলিয়া। এখন বিভূতিকে বাড়ীতে থাকিতে দেওয়ার অর্থই কি তাকে সমর্থন করা নয়? শুধু ছেলে বলিয়া তাকে আর কি ক্ষমা করা চলে, চোখ কান বুজিয়া আর কি আশা করা চলে এখনও তার সংশোধন সম্ভব? বিনা প্রতিবাদে এখন চুপ করিয়া থাকা আর বিভূতিকে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া যে সে যা খুসী করিতে পারে, এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তার ছেলে বলিয়া বিভূতির অন্যায় করার যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে, মানুষের উপর যে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে বিভূতিকে জানিয়া শুনিয়া সে সমস্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া আর তার নিজের অন্যায় করার মধ্যেই বা পার্থক্য কি? মনে মনে মহেশ চৌধুরী স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এ বিষয়ে আর ভাবিবার কিছু নাই, বিভূতিকে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা উচিত কি অনুচিত এটা আর প্রশ্নই নয়, এখন আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এই যে, বিভূতি তার ছেলে। বিভূতি যে তার স্ত্রীরও ছেলে এটা এতক্ষণ মহেশের যেন খেয়াল ছিল না। বিভূতির মার চাদর মুড়ি দেওয়া মূর্তি এই আসল সমস্যাটাকে তাই একটু বেশী রকম জটিল করিয়া দিয়াছে।

বিভূতির মার ছেলেকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার অধিকার কি তার আছে?

ভাল ছেলে, সৎ ছেলে, আদর্শবাদী ছেলে—গ্রামে আর এমন ছেলে নাই। কেবল বুদ্ধিটা একটু বিকৃত—ভাল মন্দের ধারণাটা ভুল। অনেকগুলি মানুষকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার আনন্দ, দুদিন পরে যখন প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ ঘটিয়া যাইবে, কতকগুলি মানুষ যাইবে জেলে আর কতকগুলি যাইবে হাসপাতালে আর কতকগুলির দেহ উঠিবে চিতায়, আনন্দের তখন আর তার সীমা থাকিবে না। জেল, হাসপাতাল বা চিতা—এর কোনটার জন্য নিজেরও অবশ্য তার ভয় নাই। ছেলের এই নির্ভীকতাও মহেশের আরেকটা বিপদ। নিজের কথা যে ভাবে না, স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার বয়স যার হইয়াছে, ছেলে

বলিয়া আর মতের সঙ্গে মত মেলে না বলিয়া তার উপর বাপের অধিকার খাটানোর কথা ভাবিতে মনটা মহেশের খুঁতখুঁত করে।

মহেশ চৌধুরী নির্বাক হইয়া থাকে প্রায় তিনদিন। গম্ভীর নয়, বিষণ্ণ নয়, উদাস নয়, শুধু নির্বাক। বিভূতির মাও নির্বাক হইয়া থাকে, কিন্তু তাকে বড় বেশী গম্ভীর, বিষণ্ণ আর উদাস মনে হয়।

বিভূতি বলে—কি হয়েছে মা ?

বিভূতির মা বলে—কিছু হয় নি।

বিভূতি পিছন হইতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ নিয়া চুপি চুপি বলে, শোন, আমার জন্যে ভেবো না। ভয় নেই, আমি আর জেলে যাব না। সে-সব ছেলেমানুষী বোকামীর দিন কেটে গেছে।

তবু বিভূতির মার প্রথমটা মন-মরা ভাব কাটিতে চায় না। বরং বাড়িবার উপক্রম হয়। কারণ, একদিন মহেশ চৌধুরী সোজাসুজি বিভূতির সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তের কথাটা তাকে শুনাইয়া দেয়।

বিভূতির মা প্রথমটা শোনে হাঁ করিয়া, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলে—বেশতো, তাড়িয়ে দাও।

—তুমি কি করবে ?

—আমি ? গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে গিয়ে ডুব দেব।

—সত্যি ? না, তামাসা করছ ?

ছোট ছেলেকে প্রথমভাগ পড়ানোর মত ধৈর্যের সঙ্গে বিভূতির মা বলে—ত্থাখো পষ্ট কথা বলি তোমাকে শোনো। তুমি না থাকলেও আমার একরকম করে দিন কেটে যাবে, কিন্তু ছেলে ছাড়া আমি বাঁচব না বলে রাখছি।

মহেশ তা জানিত, এতদিন খেয়াল করে নাই।

—এই কথা ভাবছ বুঝি ক'দিন ?—বিভূতির মা জিজ্ঞাসা করে।

মহেশ চৌধুরী নীরবে মাথা হেলাইয়া সায় দেয়।

বিভূতির মা তার মুখের সামনে হাত নাড়িয়া বলে, কেন শুনি ? কি জন্যে শুনি ? ওর কথা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি

শুনি ? ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে-থা দিয়েছ, তার যা খুশী সে করুক। তোমার তাতে কি ? তোমার কাজ তুমি করে যাও, তার কাজ সে করুক—তুমি কেন ওর পেছনে লাগতে যাবে ?"

মহেশ ভাবিতে ভাবিতে বলে—নিজের কাজ করার জন্যেই তো ওর পেছনে লাগতে হচ্ছে গো।

ভাবিতে ভাবিতে মহেশ চৌধুরীর দিন কাটে। মানুষটার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে—সদানন্দের অধঃপতনের আঘাতে অথবা সদানন্দের সম্বন্ধে ভুল করার ধাক্কায়। আর যেন নিজের উপর সে সহজ বিশ্বাস নাই। সমস্ত প্রশ্নই আজকাল ধাঁধাঁর মত মনে হয়। কত সন্দেহই যে মনে জাগে! জীবনের পথে চলিবার জন্য আত্মবিশ্বাসের একটিমাত্র রাজপথ ধরিয়া এতকাল চলিবার পর বুদ্ধি-বিবেচনা যেন ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন পথের অস্তিত্ব দেখাইয়া তার সঙ্গে খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বিভূতির মার সঙ্গে আলোচনা করার পর একটা যে প্রচণ্ড সংশয় মহেশের মনে জাগে, তার তুলনা নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কি করা উচিত স্থির করিয়া ফেলার পর সেটা করা সত্যই উচিত কিনা সে বিষয়ে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তার মনে আসিয়াছে, প্রথমে যা খেয়ালও হয় নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কি করা উচিত জানিয়াও তা না করা এক কথা—নিজের অনেক দুর্বলতার মধ্যে একটির সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যায় আর দুঃখিত হওয়া চলে। কিন্তু এ তো তা নয়! অনেক বিষয় বিবেচনা না করিয়াই সে যে কি করা উচিত স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। তার সমস্ত বিচার-বিবেচনাই কি অসম্পূর্ণ, একপেশে ? কেবল উপস্থিত প্রমাণ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া আদালতের চোখ কান বুজিয়া বিচার করার মত নিজের জ্ঞান আর বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই কি তার নিরপেক্ষতা ? একটা প্রশ্নের সম্বন্ধে কত কথা ভাবিবার থাকে, নিজের ভাবিবার ক্ষমতা দিয়া কি সে প্রশ্নের মীমাংসা করা উচিত, যদি মীমাংসা করার আগেই সমস্ত কথাগুলি ভাবিবার ক্ষমতা না থাকে ? চিরজীবন সে কি এমনি ভুল করিয়া আসিয়াছে ? মানুষ কি এমনি ভুল করে, পৃথিবীর সব মানুষ ?

মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানে আর নূতন জ্ঞানের আলোকে এই ভুলকে আবিষ্কার করে ?

এবং হয়তো আবার নূতন জ্ঞানের আলোকে আবিষ্কার করে যে এই আবিষ্কারটাও মিথ্যা ?

সুতরাং বিষম এক জটিল সমস্যা নিয়া মহেশ চৌধুরী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা কিন্তু হাস্যকর মোটেই নয়। জগতে এমন কে চিন্তাশীল আছে এ সমস্যা যাকে পীড়ন না করে? এ সংশয়ের হিমালয় না ডিঙ্গাইলে তো চরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

[ লেখকের মন্তব্য : মহেশ চৌধুরীর আসল সমস্যার কথাটা আমি একটু সহজভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিই। বলার প্রয়োজনও আছে। মহেশ চৌধুরীর মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইলে তার মনের অবস্থাটা বুঝা সম্ভব, ধাঁধাঁটা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়।

কোন প্রশ্নের বিচারের সময় সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত যুক্তিতর্ক বিবেচনা করা উচিত, এই কথাটা মহেশ চৌধুরীর মনে হইয়াছে। কথাটা গুরুতরও বটে, যুক্তিসঙ্গতও বটে। কিন্তু মুস্কিল এই, কেবল প্রশ্ন নয়, জগতে এমন কি আছে যার সঙ্গে জগতের অন্য সমস্ত কিছু সংশ্লিষ্ট নয়? অস্তিত্বের অর্থই তাই—সমগ্রতা। বিচ্ছিন্ন কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। এদিকে মানুষের মস্তিষ্ক এমন যে সেখানে এক সময় একটির বেশী সমগ্রতার স্থান হয় না—অংশও মস্তিষ্কের পক্ষে সমগ্র। জগতের অসংখ্য আংশিক সমগ্রতাকে ধারাবাহিক ভাবে বিচার করিয়া কোন প্রশ্নের জবাব পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত দর্শন তাই একটিমাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে—আংশিক সমগ্রতার পরিধি বাড়াইয়া চলা। দুটি অংশের একত্ব আবিষ্কার করিয়া দুটি আংশিক সমগ্রতাকে এক করিতে পারিলে জ্ঞানের পথে, চরম বা পরম সত্য আবিষ্কারের পথে, এক পা অগ্রসর হওয়া গেল। আজ পর্যন্ত কেউ বিশ্বের সমগ্রতাকে নিজের ব্যক্তিগত একটিমাত্র সমগ্রতায় পরিণত করিতে পারিয়াছে কিনা, ভবিষ্যতে কোনদিন পারিবে কি না জানি না।

তবে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান মানুষকে এমনি ভাবে সংগ্রহ করিতে হয়, সঙ্কীর্ণ জীবনের তুচ্ছ সমস্যার বিচারও করিতে হয় এমনি ভাবে। তাছাড়া আর উপায় নাই। জন্ম হইতে সকলে আমরা করিয়াও আসিতেছি তাই। শৈশবেও সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি আজও করিতেছি। তখন যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে ছিল কাজে লাগাইতাম, আজ যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে আছে কাজে লাগাই। তখনকার জ্ঞান হয়তো ছিল মোটে কয়েকটি টুকরা জ্ঞানের যোগফল, আজকের জ্ঞান হয়তো অনেক বেশী টুকরার মিলিত পরিণাম, কিন্তু তখনও যেমন আর টুকরা-গুলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মাথা ঘামাইতাম না, আজও ঘামাই না। জলের সঙ্গে জল মেশার মত, আলোর সঙ্গে আলো মেশার মত, মিলিত আংশিক জ্ঞানের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

সমস্ত মানুষ, মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন জাগিলে, সাময়িক যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির সম্পত্তি দিয়া তার বিচার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও পায়। জবাব না মানা আর নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করা আর নিজের ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির কাছে আপীলের ভরসা করা অবশ্য ভিন্ন কথা। তবে সাধারণ আপীলের ফলটাও হয়তো মন মানিতে চায় না—শেষ যুক্তি বা শেষ সত্যের আদালত খুঁজিয়া মরিতে হয়।

সীমাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত জ্ঞানের জগতের সমগ্রতার আশীর্বাদ মানুষ ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। সংশয়বাদের রোগ ধরিয়াছে মানুষকে। প্রত্যেক প্রশ্নের বিচার করিতে আজ তাকে সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ করিতে হয়। কে জানে এমন একদিন আসিবে কি না যেদিন কেহ আমার এই উপন্যাসটি পড়িতে বসিয়া প্রথম লাইনটি পড়িয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে, লাইনটির যে অর্থ মনে আসিয়াছে তাই কি ঠিক, অথবা প্রত্যেকটি শব্দের প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া, ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলি ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া, শব্দতত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিয়া লাইনটির মানে যাচাই করা উচিত।]

একটি দুপুর তো বিভূতির মাধবীলতার সঙ্গে অপরিসীম আনন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু রাত্রি ? পরের দিনের দুপুরটা ? তার পরের দিন-রাত্রিগুলি ? দুপুরটা যেন ছিল মাতালের মাঝরাত্রির মত, শেষ হওয়ার সঙ্গে জীবনের আর কিছুই যেন রহিল না। তারপর কয়েকদিন ধরিয়া মাতলামির ক্ষুধায় ভিতরটা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু স্নায়বিক বিকারের ভাটিখানায় বড় বেশী খামখেয়ালী চলে।

তাই আর কোন কারণ, কোন তুচ্ছতম নূতন ঘটনা না ঘটিলেও মাধবীলতার উপর অবিশ্বাসে বিভূতির যেন প্রায় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। অনেক যুক্তিই মনে আসিতে লাগিল, তার মধ্যে সর্বপ্রধান, সে নিজে অতি অপদার্থ, আকর্ষণহীন, কুৎসিত পুরুষ। কেবল তাকে নিয়া খুসী থাকা মাধবীলতার পক্ষে কি সম্ভব ?

হঠাৎ আবার একদিন বিভূতি জেরা আরম্ভ করে—কই, সেদিন আশ্রমে গিয়েছিলে কেন, তাতো বললে না ?

মাধবালতা ভয় পাইয়া বলে—বললাম যে ?

—কই বললে ?

—ওই যে সেদিন বললাম।

—হুঁ—বলিয়া বিভূতি চুপ করিয়া যায়।

গভীর বিতৃষ্ণায় পিছন ফিরিয়া সে শুইয়া থাকে, মাধবীলতা মৃদু-স্বরে ডাকিলে বলে, বড় ঘুম পাইয়াছে। ঘুম কিন্তু আসে না, মনের অস্বস্তি দেহের একটা অপরিচিত যন্ত্রণার মত তাকে জাগাইয়া রাখে। মনে হয়, ঠিক চামড়ার নিচে সর্বাঙ্গে পেটের অম্বলের জ্বালা যেন ছড়াইয়া গিয়াছে আর বাহিরের গুমোটে তাতিয়া উঠিয়াছে মাথাটা। অথচ এমন আশ্চর্য ব্যাপার, শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পরদিন যখন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গে, মনের অবস্থাটা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। পাশে যে অসতী স্ত্রী ছিল গতরাত্রে, অবিশ্বাসের সব কিছু ঝাড়িয়া ফেলিয়া আজ সকালে সে যেন চোখের আড়ালে সংসারের কাজ করিতে গিয়াছে। আগের রাত্রের ধারণা আজ বিভূতির নিছক ছেলে-মানুষী মনে হয়। এমনি তুচ্ছ মনে হয় কথাটা যে ও-বিষয়ে একটু

চিন্তা করাটাও তার কাছে পরিশ্রমের অপচয়ের শামিল হইয়া দাঁড়ায়। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যেন বিচলিত হইয়াছিল, দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। অনুভূতির জগতে যদিবা একটা দুর্বোধ্য আতঙ্কের জের এখনও আছে, পেটে অম্বলের শত্রুতা নাই, দেহে টনটনানি নাই, মাথায় গ্রীষ্মবোধও নাই। একটু শুধু ভারি মনে হইতেছে দেহটা। বোধ হয় হৃদয়ের ঈষৎ চাপা-পড়া বেদনাবোধের ভারে।

চা আর খাবার খাইয়া বিভূতি গ্রামের দিকে যায়। শেষ রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশে অল্প অল্প মেঘের জন্য রোদেরও তেমন তেজ নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে বিভূতি গিয়া হাজির হয় শ্রীধরের দোকানে। দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চে বসিয়া কয়েকজন ফিস্‌ফাস্‌ করিতেছিল, বিভূতিকে দেখিয়া তারা অপরাধীর মত চুপ করিয়া যায়।

শ্রীধর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলে—আসেন। বসেন। বিড়ি খান ?

বিভূতি বসে কতকটা উদাসভাবেই, মাথা নাড়িয়া বলে, বিড়ি তো আমি খাই না।

শ্রীধর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলে—ঠিক বটে, সহরে ছিলেন এতকাল, আপনারা খান সিগারেট। তাতো নেই দাদাবাবু!—তারপর কোথা হইতে কি করিয়া শ্রীধর যে মারাত্মক গাম্ভীর্য মুখে টানিয়া আনে সেই জানে, একটা অদ্ভুত আপসোসের শব্দ করিয়া বলে—সহর ভাল। জানেন দাদাবাবু, মোদের এসব লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ের চেয়ে সহর ঢের ঢের ভাল। বৌ-ঝি নিয়ে নিভ্‌ভাবনায় ঘর তো করা চলে—ঘরের বৌ-ঝিকে তো কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যায় না।

যারা ফিস্‌ফাস্‌ করিতেছিল তারা সকলে একবাক্যে সায় দেয়। একজন, রামলোচন দে, কাঁচাপাকা চুলের বাবরিতে ঝাঁকি দিয়া বলে —আপনি তো বলে খালাস দাদাবাবু, মরি যে আমরা। হুঁ, নিজের দোষে মরি তো বটে, উপায় কি বলেন ?

ক্রমে ক্রমে নানারকম আপসোসমূলক মন্তব্য ও প্রশ্নের বাধা ডিঙ্গাইয়া আসল ব্যাপারটা বিভূতির বোধগম্য হয়। কারও বৌ-ঝি কেউ সম্প্রতি হরণ করে নাই, যদিও কিছুকাল আগে এরকম একটা

ব্যাপার এই গ্রামেই ঘটিয়া গিয়াছে। সকলের বর্তমান রাগ দুঃখ আর আপসোসের কারণটা এই। নন্দনপুরের ভদ্রলোকেরা গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলিয়া পাকা নাটমন্দিরের অভাব মিটানোর জন্য খড়ের একটা চালা তুলিয়াছে। তার নিচে নানা উপলক্ষে, মাঝে মাঝে বিনা উপলক্ষেও, যাত্রাগান, কীর্তনগান প্রভৃতি হয়। খড়ের নাটমন্দিরটিতে স্থান একটু কম, তবে সাধারণ অনুষ্ঠানের সময় সেই স্থানও সবটা ভরে না। মুস্কিল হয় ভাল দলের যাত্রা বা নাম করা কীর্তনীয়ার কীর্তন বা ঐরকম কোন প্রোগ্রাম থাকিলে, যার আকর্ষণ আছে, তখন চালার নিচে অর্ধেক লোকের বসিবার স্থান হয় না, ভিড়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে হয়। তাতেও কোন আপত্তি ছিল না, যদি ও-গ্রামের ভদ্রলোকেরা এ-গ্রামের ভদ্রলোকদের মাঝে মাঝে সামনে গিয়া বসিতে দিত।

—যায়গা থাকলেও বসতে দেয় না দাদাবাবু। এগিয়ে গিয়ে বসতে গেলে ঠেলে পিছনে হটিয়ে দেয়। কেন আমরা সতরঞ্চিতে বসতে পারি না সামনের দিকে? চাঁদা দিই না আমরা? ওকি তোদের বাপের সম্পত্তি যে শুধু গাঁয়ের বাবুদের জন্যে বেদখল করে রাখিস?

আগের দিন শ্রীধর, রামলোচন এবং আরও অনেকে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। সামনের দিকে অনেকটা যায়গা খালি পড়িয়া আছে দেখিয়া যেই বসিতে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গলাধাক্কা। কে একজন শ্রীধরের পিঠে সত্যই একটা ধাক্কা দিয়াছিল এবং আরেকজন রামলোচনের বাবরি ধরিয়া দিয়াছিল টান।

—শেষে ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনি।

বিভূতি আশ্চর্য হইয়া বলে—তারপরেও যাত্রা শুনলে?

—শুনব না? চাঁদা দিই নি আমরা?

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া সকলের মন্তব্য শুনিয়া যায়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, ওরা কি বলল, যারা তোমাদের ঠেলে সরিয়ে দিলে?

জবাব দিল শ্রীধর।—কি আর বলবে দাদাবাবু, বলল, পিছনে

দিকে তোমাদের জন্যে বসবার যায়গা থাকে, আগে এসে বসতে পার না ?

—একটা দিন হয়তো বিশেষ কারণে—

—একটা দিন ? প্রত্যেক বার এমনি হচ্ছে, একটা দিন কি দাদাবাবু ! মোদের গাঁয়ের কেউ সামনে গিয়ে বসতে চায় না।

এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বিভূতির সাধ যায় না। মনে হয়, প্রতিবাদ করার মত ব্যাপারও এটা নয়। যাত্রা শুনিতে গিয়া গ্রামের কয়েকজন বসিবার স্থান পায় নাই বলিয়া কি বিচলিত হওয়া চলে ? তবু বসিবার স্থানের উপর এ-গ্রামের লোকেরও অধিকার আছে, স্থান থাকিলেও যদি তাদের বসিতে দেওয়া না হয়, সেটা অন্যায়। অন্যায়ের প্রতিকার করা কর্তব্য। নিজের চোখে দেখিয়া ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার উদ্দেশ্যে বিভূতি বলে—সামনের জন্মাষ্টমীতে যাত্রাটাত্রা হবে না ?

শ্রীধর বলে—তিন রাত্তির হবে অনেক মজা আছে দাদাবাবু।

বিভূতি বলে—তোমরা সবাই আমার সঙ্গে যেও, দেখি কেমন বসতে না দেয়।

একজন একটু সংশয় ভরে জিজ্ঞাসা করে—কি করবেন ?

বিভূতি হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলে—আমি একা কি করব ? তোমরা সবাই করবে—যায়গা থাকলে সেখানে বসে পড়বে, আবার কি ?

নেতা হওয়া যে এত সহজ আর নেতৃত্ব করা এমন কঠিন, বিভূতি তা জানিত না। এবার সে ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে। শ্রীধরের দোকানে বসিয়া মাত্র কয়েকজনের কাছে সে আবেগের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিল যে নন্দনপুরের যাত্রার আসরে সামনে বসিবার অধিকার সে তাদের আদায় করিয়া দিবে, জন্মাষ্টমীর দিন দেখা গেল নানা বয়সের প্রায় দেড়শ মানুষ তার এই অধিকার আদায়ের অভিযানে যোগ দিয়াছে। শ্রীধর বা রামলোচনের মত যারা অন্তত ফতুয়া গায়ে দিয়া যাত্রা শুনিতে যায় এদের অধিকাংশই সমাজের সে স্তরের মানুষও নয়। এরা যাত্রা শুনিতে যায় গামছা কাঁধে, আসরে সামনের দিকে ভদ্রলোকদের মাঝে বসিতে পাইলে বোধ হয় রীতিমত অস্বস্তিই বোধ করে। শ্রীধর, রামলোচন প্রভৃতির মত চাঁদা দিয়াও সামনে বসিতে না পাওয়ার অপমানে এরা ক্ষুব্ধ হয় নাই। চাঁদাই বা এদের মধ্যে ক'জন দিয়াছে কে জানে! কোথা হইতে দিবে? খাজনা দিতে যাদের অনেকের ঘটিবাটি বাঁধা দিতে হয়, চাঁদা দেওয়ার বিলাসিতা তাদের কাছে প্রশ্রয় পায় না।

তবু তার নেতৃত্বে যাত্রার আসর আক্রমণের জন্য সকলে যেন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। নন্দনপুরের স্থায়ী আটচালার নিচে সর্বসাধারণের যাত্রার আসর। চাঁদা দিক বা না দিক, গায়ে ফতুয়া থাক বা না থাক, এদের সকলেরই অবশ্য সে আসরে সামনে বসিবার অধিকার আছে। কিন্তু এরা কি তাই চায়? সেইজন্যই কি এরা সকলে জড়ো হইয়াছে? বাঁচিবার অধিকার সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে এদের সে যে-সব কথা বলিয়াছে, এ কি তারই প্রতিক্রিয়া?

এই প্রশ্ন বিভূতিকে পীড়ন করিতে থাকে। তার বক্তৃতা আর উপদেশ এতগুলি মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাইয়াছে একথা বিশ্বাস করিতে ভাল লাগে কিন্তু নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

গ্রামের সঙ্গে গ্রামের প্রতিযোগিতা থাকে, মনোমালিন্য থাকে—এক গ্রাম অন্য গ্রামকে অনায়াসে হিংসা করে। কে জানে এরা নন্দনপুরের অধিবাসীদের একটু জব্দ করিতে চলিয়াছে কি না? শ্রীধর, রামলোচন আর অন্যান্য কয়েকজন ফতুয়াধারী হয়তো নিজেদের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সব অশিক্ষিত সরল মানুষগুলিকে ক্ষেপাইয়া দিয়াছে। যাত্রার আসরে হয়তো আজ একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া যাইবে।

কিন্তু এখন আর পিছাইবার উপায় নাই, মরিয়া গেলেও না। বিভূতি বার বার সকলকে আসল কথাটা বুঝাইয়া দেয়। গালাগালি হাতাহাতি চলিবে না। ধীর স্থির শান্তভাবে সকলে সামনের দিকে গিয়া জাঁকিয়া বসিয়া পড়িবে, কিছুতেই আর সেখান হইতে উঠিবে না।

একজন প্রশ্ন করে, ওরা যদি গাল দেয়, অপমান করে? যদি মারে?

বিভূতি জবাব দেয়—তবু চুপ করে বসে থাকবে, কথাটি কইবে না। আমাদের ভদ্র ব্যবহারে ওরাই লজ্জা পাবে। ওরা যদি ছোটলোকমি করে আমরা কেন ছোটলোক হতে যাব?

•

বিভূতি ইচ্ছা করিয়াই সকলকে সঙ্গে নিয়া যাত্রা আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে আসরে গিয়া হাজির হইল। মানুষ তখন জমা হইয়াছে অনেক তবে বসিবার স্থানও যথেষ্ট ছিল। সামনের বিশেষ স্থানগুলি রাখা হইয়াছিল বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জন্য। সকলে দল বাঁধিয়া সেই স্থানগুলি দখল করিয়া বসিবার উপক্রম করিবামাত্র কয়েকজন ভলান্টিয়ার আসিয়া প্রতিবাদ করিল। বিভূতি যেখানে খুসী বসুক, বিভূতির দু-একজন বন্ধু-বান্ধবও বসুক, কিন্তু সকলে বসিলে চলিবে কেন!

বিভূতি খুব অহিংসভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—কেন চলবে না? এরা সকলেই আমার বন্ধু।

একজন ভলান্টিয়ার, বয়স তার আঠার-উনিশের বেশী হইবে না, একগাল হাসিয়া বলিল—আর আমরা বুঝি আপনার শত্রু?

—না, তা বলছি না—

একজন তিন-চার হাত তফাৎ হইতে বিভূতির মুখগহ্বরটিকে পিকদানি হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করিয়াছে। মুখ ভাসাইয়া পানের পিক বুকে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, বিভূতি মুছিবার চেষ্টাও করিল না। এক লাফে সামনে আগাইয়া গিয়া এক হাতে অপরাধীর গলাটা টিপিয়া ধরিয়া অন্যহাতে তাকে মারিতে লাগিল কিল চড় ঘুষি। আরেকজন চট করিয়া বসিয়া পড়িয়া পিছন হইতে বিভূতির পা ধরিয়া মারিল এক হ্যাঁচকা টান, বিভূতি মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—মার শালাদের।

অনেকের মুখে প্রতিধ্বনি শোনা গেল—মার! মার! মার!

অধিকাংশ লোক যেন দাঙ্গার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে এমন দাঙ্গা বাধিয়া গেল বলিবার নয়। কোথা হইতে যে এত লাঠি ইট পাটকেল আসিয়া জুটিল! কয়েকটা মাথা ফাটিয়া গেল, অন্যভাবে আহত হইল অনেকে! হৈ হৈ রৈ রৈ হল্লা, ছুটাছুটি, মারামারি—এক গ্রামের লোক যে ভাবে পারিতেছে অন্য গ্রামের লোককে আঘাত করিতেছে। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, ভাল করিয়া দল বাঁধিয়া দাঙ্গা করিবার মত কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত কারও নাই। একজন হয়তো পেছন হইতে অন্য একজনের মাথায় লাঠি মারিবার আয়োজন করিয়াছে, এমন সময় তৃতীয় একব্যক্তি লোহার একটা মুখ-সরু শিক তার পিঠের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। এ ধরণের অস্ত্রও কেউ কেউ দু-একটা সঙ্গে আনিয়াছিল। কেবল আজ নয়, আগের দুদিনও আনিয়াছিল। মারামারিটা যে আজ হঠাৎ লাগে নাই, এ তার একটা মস্ত বড় প্রমাণ।

শেষ পর্যন্ত বিভূতির স্থাপিত ব্যায়াম সমিতিগুলির সদস্যেরা আসিয়া সেদিনকার মত সেখানকার হাঙ্গামাটা থামাইয়া দিল। মারামারিটা হইতেছিল এক গ্রামের লোকের সঙ্গে আরেক গ্রামের লোকের এবং বিভূতি ব্যায়াম সমিতি স্থাপন করিয়াছিল এক এক

গ্রামে একটা করিয়া। কিন্তু এমনই আশ্চর্য ব্যাপার, মারামারিটা শুরু করিল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ব্যায়াম সমিতিগুলির সদস্যেরা একসঙ্গে মিলিয়া। অধিকাংশই মাথা-গরম যুবক কিন্তু তাদের মধ্যে এমন ঘোরতর মিল দেখা গেল ঠাণ্ডামাথা বুড়োদের মধ্যে যা সম্ভব হয় না।

আহত বিভূতিকে তারা গরুর গাড়ীতে বাড়ী পাঠাইয়া দিল। বিভূতির আঘাত বিশেষ গুরুতর নয়, অন্তত দেহের আঘাত নয়। অন্যান্য যারা আহত হইয়াছিল তাদের কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইল কিন্তু অধিকাংশ আহত মানুষ যে কোথায় উধাও হইয়া গেল তার আর কোন পাত্তাই মিলিল না।

মারামারি কিন্তু সেইখানে শেষ হইল না।

এক গ্রামের কয়েকজন অন্য গ্রামের একজনকে একা পাইলে ধরিয়া পিটাইয়া দিতে লাগিল। মারামারির পরদিন সকালে নন্দনপুরে গিয়া মহেশ চৌধুরী মার খাইয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। মাথাটা তার ফাটিয়া গেল এবং দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল কয়েকটা।

বিভূতি আহত অবস্থায় বাড়ী ফিরিলে মহেশ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তুমি গিয়ে দাঙ্গা করে এসেছ?

বিভূতি বলিয়াছিল—না। যাতে দাঙ্গা না বাধে তার চেষ্টা করেছিলাম।

কথাটা মহেশ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু তখনকার মত কিছু আর বলেও নাই। পরদিন সকাল হইতে না হইতে আসল ব্যাপারটা জানিবার জন্য নিজে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু খোঁজ-খবর নেওয়ার সুযোগটাও সে পায় নাই। তাকে দেখিয়াই নন্দনপুরের জনপাঁচেক বদমেজাজী মানুষ বলিয়াছিল—বিভূতির বাপ ব্যাটা এসেছে রে!—

বলিয়াই তাকে পিটাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অনেক বেলায় খবর পাইয়া বিভূতি তাকে আনিতে গেল। বাপের অবস্থা দেখিয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। যাদের সে যাচিয়া আগের দিন যাত্রার আসরে সঙ্গে নিয়া গিয়াছিল, মারামারির জন্য তাদের উপরেও তার বিরক্তির এতক্ষণ সীমা ছিল না। এরকম

একটা কুৎসিত কাণ্ড ঘটার জন্য মনে মনে তার বড়ই খারাপ লাগিতে-ছিল। সে ভাবিতেছিল, এই রকম বর্বর যদি তার দেশের মানুষ হয় আর এই রকম কারণে অকারণে পরস্পরকে হিংসা করে আর পরস্পরের সঙ্গে কলহ বাধায়, দেশের তবে হইবে কি? আজ আহত বাপকে দেখিয়া সর্বাগ্রে তার মনে হইল, যারা তার বাপকে এভাবে মারিয়াছে, তাদের কিছু উত্তম-মধ্যম না দিলে জীবন ধারণ করাই বৃথা।

কিন্তু কে যে মহেশ চৌধুরীকে মারিয়াছে, কেউ তা জানে না। অত সকালে আটচালার দিকে বড় কেউ যায় নাই। একটু বেলায় মহেশকে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গ্রামে একটা গোলমাল বাধিয়া যায়। তখন নন্দনপুর ব্যায়াম সমিতির সদস্যেরা তাকে সযত্নে তুলিয়া আনিয়া সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করিয়াছে।

ডাক্তার দেখাইয়া পাল্কীতে করিয়া মহেশকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হইল। সারাদিন সারারাত বিভূতি মহেশের শিয়রে বসিয়া রহিল, বিভূতির মা বসিয়া রহিল পায়ের কাছে। মাধবীলতাও ওই রকম ভাবেই রাতটা কাটাইবার আয়োজন করিয়াছিল, বিভূতির জন্য পারিয়া উঠিল না। মাঝরাত্রে বিভূতি তাকে এমন একটা অপমান-জনক ধমক দিয়া ন্যাকামি করিতে বারণ করিয়া দিল যে কাঁদিয়া ফেলিয়া মাধবীলতা উঠিয়া গেল।

মহেশ চৌধুরীর জ্ঞান ফিরিল পরদিন সকালে।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা একটু কাটিয়া আসিলে বিভূতি মৃদুস্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমায় কে মেরেছে বাবা?

মহেশ চৌধুরী বলিল—একজনে কি মেরেছে—চার-পাঁচজনে।

—কেন মারল?

—তোমার জন্যে। পাপ করলে তুমি, তোমার বাপ বলে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

উত্তেজিত হওয়ার ফলে হঠাৎ ব্যথায় মহেশ একটু কাতর হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ।

—তুমি আমার বাবা বলে তোমায় মারল? কে কে মারল?

মহেশ চৌধুরী চোখ বুজিয়া বলিতে লাগিল, ওরা সবাই ভাল লোক, অকারণে কখনো মারত না। যোগেন, দীনু, কালীপদ, রমানাথ আর নগেনের সেজমামা ছিল,—কি যেন নাম লোকটার? আমি তো ওদের কোন দিন ক্ষতি করি নি, মিছিমিছি কেন ওরা আমায় দেখামাত্র পিটোতে আরম্ভ করবে?

নড়িতে গিয়া মৃদু একটা আর্তনাদ করিয়া মহেশ চৌধুরী চুপ করিয়া গেল।

বিভূতি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, আমি যদি ওদের তোমার মত অবস্থা না করি, তোমার ব্যাটা নই আমি।

কাতরাইতে কাতরাইতে চোখ মেলিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, তুমি যদি আবার ওদের পিছনে লাগতে যাও, তোমায় আমি জন্মের মত ত্যাগ করবো বলে রাখছি।

—তা তুমি ত্যাগ করো। তাই বলে ঘাড় গুঁজে এ অন্যায় সহ্য করা—

—কিসের অন্যায়? যদি করেই থাকে অন্যায়, তোর কি? মেরেছে আমাকে, তোমাকে তো মারে নি, তোমার মাথা ঘামাবার দরকার?

—বাঃ বেশ!—বলিয়া বিভূতি খানিকটা হতভম্বের মতই বসিয়া রহিল। মহেশ চৌধুরী বলিতে লাগিল—তুমি ওদের পেছনে লাগবে, বদনাম রটবে আমার। সবাই বলবে আমি তোমায় দিয়ে ওদের মারিয়েছি।

বিভূতি বলিল—তুমি এমন কাপুরুষ!

—কাপুরুষ?

—নয় তো কি? লোকে নিন্দে করবে ভয়ে মুখ বুজে এতবড় অন্যায় সহ্য করে যাবে! লোকের নিন্দা প্রশংসা দিয়ে তোমার নীতি ঠিক হয়, আর কিছু নেই তার পেছনে!

বিভূতির মা ব্যাকুলভাবে বলিল—চুপ কর না বিভূতি? কি যে তোরা আরম্ভ করেছিস!—

বিভূতি কথাটা গ্রাহ্য করিল না, চুপচাপ একটু ভাবিয়া বলিল, নিন্দা প্রশংসা তো আমারও আছে। আমার বাপকে ধরে পিটিয়ে দিল, আমি যদি চুপ করে থাকি, লোকে আমায় অপদার্থ বলবে। ভীরু কাপুরুষ বলবে।

মহেশ সভয়ে বলিল—কি করবি তুই?

বিভূতি বলিল, ওদের বুঝিয়ে দেব, মারতে কেবল ওরা একাই জানে না।

—তাতে লাভ কি হবে?

—ভবিষ্যতে আর এরকম করবে না।

—আরও বেশী করে করবে। তার চেয়ে সেরে উঠে আমি যদি গিয়ে হাসিমুখে ওদের সঙ্গে কথা বলি, ভাই বলে জড়িয়ে ধরি, ওরা কি রকম লজ্জা পাবে বল তো?

—ছাই পাবে। ভাববে, আবার মার খাবার ভয়ে খাতির করছ।

মহেশ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তার তর্ক করার ক্ষমতা ছিল না। তখনকার মত সে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু বিভূতি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই আবার তাকে ডাকিয়া বসাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। রাগ করিয়া, মিষ্টি কথা বলিয়া, মিনতি করিয়া, কতভাবেই যে সে বিভূতিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করিল। যতই সে কথা বলিতে লাগিল বিভূতির কাছে ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তার ভয়ের পরিচয়—মার খাইয়া মহেশ চৌধুরী মার ফিরাইয়া দিয়াছে মানুষের কাছে এই রকম অসভ্য বর্বররূপে পরিগণিত হওয়ার ভয়! মহেশ চৌধুরীকে এমন দুর্বল বিভূতি আর কখনো দেখে নাই। শেষে বিরক্ত হইয়া সে বলিল, আচ্ছা সে দেখা যাবে।—বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল। হাতাহাতি মারামারি সে নিজেও কোন দিন পছন্দ করে না, ও সমস্ত সত্যই নীচতা। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কি তাই? মহেশ চৌধুরী কোন অপরাধ করে নাই, কেবল তার বাবা বলিয়া তাকে যারা মারিয়াছে,

উদারভাবে তাদের ক্ষমা করাটা কি উচিত ? তাকে কি উদারতা বলে ? তার চেয়ে ছোটলোকের মত ওদের ধরিয়া কিছু উত্তম-মধ্যম লাগাইয়া দেওয়াই কি মহত্বের পরিচয় নয়, মনুষ্যত্বের প্রমাণ নয় ? ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি বুঝিতে পারিল, মাধবীলতা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত রাত্রে মাধবীলতাকে বিশ্রী ধমক দিয়া কাঁদানোর কথাটা মনে পড়ায়, ভাব করার উদ্দেশ্যে হঠাৎ সে মাধবীলতার কাছে পরামর্শ চাহিয়া বসিল।

মাধবীলতা চোখ বড় বড় করিয়া বলিল—ওদের মেরে ফেলা উচিত, খুন করে ফেলা উচিত।

বিভূতি হাসিয়া বলিল, সত্যি? কিন্তু ওরা যদি আমায় মেরে ফেলে ?

বিভূতি হাত বাড়াইয়া দিতে মাধবীলতা তার বুকের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এতক্ষণ যেন অধীর আগ্রহে সে এইজন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। বিকারের সঙ্গে ভালবাসার তীব্রতা বাড়িয়া গিয়াছে। বিকার ছাড়া স্বাভাবিক মায়া-মমতা জোরালো হয় না। এক রাত্রির অভিমান-সংক্ষুব্ধ বিরহ মাধবীলতাকে অধীর করিয়া দিয়াছে।

হাঙ্গামার ফলে নন্দনপুরে যাত্রা আর কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল, সেই যাত্রা আর কীর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইল আশ্রমে। বুদ্ধিটা মাথায় আসিল কয়েকটি গ্রামের মাতব্বরদের। তারা ভাবিয়া দেখিল, আশ্রমে সব গ্রামের লোকের সমান অধিকার, সেখানে বিশেষ সুবিধাও কেউ দাবী করিতে পারিবে না, বদমাইসী করিয়া গোলমাল সৃষ্টি করার সাহসও কারও হইবে না। যেদিন সকালে মহেশ চৌধুরীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল সেইদিন দুপুরে আরম্ভ হইল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা কীর্তন। রাত্রি আটটা-নটার সময় যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইবে সমস্ত রাত চলিবে।

বিভূতি যখন দল বাঁধিয়া বাপের প্রহারকারীদের খোঁজে বাহির হইল, তখন পুরাদমে কীর্তন চলিতেছে! বাছা বাছা কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া পাঁচটি অপরাধীর খোঁজ করিতে গিয়া বিভূতি

শুনিল, তারা সকলে কীর্তন শুনিতে গিয়াছে। বিভূতি তখন সোজা আশ্রমে চলিয়া গেল।

আসর লোকে ভরিয়া গিয়াছে। কীর্তনের দলটি নামকরা, প্রধান কীর্তনীয়ার গলাটি মধুর আর আবেগ রোমাঞ্চকর—শ্রীকৃষ্ণ কেন জন্মিবেন, যুগে যুগে তপস্যা করিয়া যোগী-ঋষিরা যাঁর হদিশ পায় না তিনি কেন নিজে মানুষের মধ্যে মানুষের রূপ ধরিয়া আসিবেন, এই কথাটা সুর করিয়া বুঝাইয়া বলিতে বলিতেই সে সকলকে একেবারে মাতাইয়া দিয়াছে, গদগদ করিয়া তুলিয়াছে। কয়েকজনের চোখে জলও দেখা দিয়াছে।

সদানন্দের কিছু তফাতে অপরাধী পাঁচজন বসিয়া ছিল। মনে তাদের একটু ভয় ঢুকিয়াছে, মহেশ চৌধুরী যদি মরিয়া যায়! কাছাকাছিই বসিয়া চুপি চুপি ইঙ্গিতে তারা এ বিষয়ে প্রথমে একটু আলাপ করিয়াছিল, তারপর চুপ করিয়া কীর্তন শুনিতেছে। দলবল সহ আসিয়া বিভূতি যখন আসরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাদের খোঁজেই চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে, তার উপর পাঁচজনেরই নজর পড়িল।

পাঁচজনকে দেখিয়া বিভূতি সঙ্গীদের বলিল—ওই যে ওরা।

সঙ্গীদের একজন একটু দ্বিধাভরে বলিল—এত লোকের মাঝখান থেকে টেনে আনা কি উচিত হবে?

বিভূতি বলিল—প্রথমে ডাকব, যদি আসে ভালই। না এলে ঘাড় ধরে টেনে আনতেই হবে। শাস্তিটা সকলের সামনেই দিতে হবে।

ইতিমধ্যে সদানন্দ বিভূতিকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিয়াছে—মহেশের খবর জানিবে। বিভূতিকে আশ্রমে দেখিয়া সদানন্দ সত্যই খুশী হইয়াছিল। বিভূতি মুখ তুলিয়া তার দিকে চাইতে সে একটু হাসিল। বিভূতি হাসিল না, হাসিবার মত মনের অবস্থা তার তখন নয়, শুধু মাথা একটু কাৎ করিয়া হাসির জবাব দিল।

লোকটিকে বলিল—বলগে, একটু কাজ সেরে আসছি।

পূর্ণেন্দু নামে একটি যুবককে বিভূতি অপরাধী পাঁচজনের কাছে

পাঠাইয়া দিল। পূর্ণেন্দু গিয়া বলিল—মহেশবাবুর ছেলে বিভূতিবাবু আপনাদের একটু বাইরে ডাকছেন—বিশেষ দরকার।

যোগেন ভড়কাইয়া গিয়া বলিল—আমাদের ডাকছে? কেন ডাকছে!

—দরকার আছে, আসুন?

—আমাদের ডাকছে? আমাদের কাদের?

পূর্ণেন্দু একে একে আঙুল দিয়া পাঁচজনকে দেখাইয়া দিল, আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে।

পাঁচজনেই ভড়কাইয়া গেল। আসর ছাড়িয়া কি যাওয়া যায়? দরকার থাকিলে বিভূতি আসুক না?

—চৌধুরী মশায় কেমন আছেন জানো?

পূর্ণেন্দু বলিল—ভাল নয়।

শুনিয়া পাঁচজনে আরও ভড়কাইয়া গেল। এবং আরও স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিল যে কীর্তন যখন চলিতেছে আসর ছাড়িয়া যাওয়া কোনমতেই সঙ্গত হইবে না। আশে পাশের দু-একজন এতক্ষণে গোলমালের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ণেন্দু উঠিয়া গেল।

তারপর ঘটিল অতি খাপছাড়া নাটকীয় ব্যাপার। লোকজনকে ঠেলিয়া সরাইয়া বিভূতি আর তার সঙ্গীরা অপরাধী পাঁচজনের কাছে আগাইয়া গেল। চার-পাঁচজনে মিলিয়া এক একজনকে ধরিয়া হ্যাঁচকা টান মারিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। পাঁচজনের মুখ তখন পাংশু হইয়া গিয়াছে। কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল, সকলে অবাক হইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

বিভূতি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল—এই পাঁচটি গুণ্ডা মিলে কাল সকালে আমার বাপকে বিনা দোষে মেরে প্রায় খুন করে ফেলেছে। আজ সকাল পর্যন্ত বাবা অজ্ঞান হয়েছিলেন। আপনাদের সকলের সামনে আমি এদের শাস্তির বিধান করছি, চেয়ে দেখুন।—বলিয়া একদিন সদানন্দের মুখে যেরকম ঘুষি লাগাইয়াছিল

কালীপদর মুখে সেইরকম একটা ঘুষি বসাইয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল। আরম্ভ করিল বটে কিন্তু মারটা তেমন জমিল না। ভয়ে যারা আধমরা হইয়া গিয়াছে, চোখ বুজিয়া গোঙাইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাত তুলিয়া একটা আঘাত ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা পর্যন্ত যাদের নাই, একতরফা তাদের কাঁহাতক পিটানো যায়? এমনি মারিতে হাত উঠিতেছে না দেখিয়া বিভূতি একজনের একটা ছড়ি কুড়াইয়া নিল, তারপর সেই ছড়ি দিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল।

এতক্ষণে চারিদিকে হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মারের ভয়ে আশেপাশের সকলে তফাতে সরিয়া গিয়াছে এবং সেখানে নিরাপদে দাঁড়াইয়া চিল্লাইতেছে। সদানন্দই বোধ হয় সকলের আগে তাদের কাছে আগাইয়া আসিল। সদানন্দকে আগাইতে দেখিয়া তখন অগ্রসর হইল আশ্রমের অধিবাসীরা।

সদানন্দ বিভূতিকে ধরায় বিভূতি তাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। তখন সকলের দিকে চাহিয়া বজ্রকণ্ঠে সদানন্দ বলিতে লাগিল—আমার আশ্রমে এসে একজন গুণ্ডা গুণ্ডামি করছে, আমায় অপমান করছে, তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখছ? আমাকে মারল, এ অপমান তোমাদের সহ্য হচ্ছে? আমার যদি একজন ভক্ত এখানে থাকে—

উত্তেজনা অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়াছিল, তার উপর সদানন্দের অনুপ্রেরণা। একটা গর্জনের মত আওয়াজ উঠিয়া এলোমেলো গোলমালটা একেবারে ঢাকিয়া দিল। শ-চারেক লোক আগাইয়া গেল বিভূতি আর তার সঙ্গীদের দিকে। বিভূতিরা দলে যে বিশেষ ভারি নয় সেটা টের পাইয়া সকলের মধ্যেই অনেকটা সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল। বাকী পাঁচশ-ছ'শ লোকের মধ্যে তিন-চারশ স্ত্রীলোক আর্তনাদ করিতে লাগিল, বাকী সকলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা।

মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল: মার শালাদের।—এই

মহামন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া বাঙ্গালী দাঙ্গা-হাঙ্গামা মারামারি আরম্ভ করিতে পারে না।

জনতা যখন আক্রমণ করে তখন দেরী হয় শুধু আরম্ভ করিতে, একজন যতক্ষণ আসল ব্যাপারটা হাতেনাতে শুরু করিয়া না দেয় ততক্ষণ চলিতে থাকে শুধু হৈ চৈ আস্ফালন। তবে এরকম অবস্থায় আরম্ভ হইতেও যে খুব বেশী দেরী হয় তা নয়, দু-এক মিনিটের মধ্যেই কারোর না কারোর উত্তেজনা চরমে উঠিয়া যায়।

ব্যাপার যে কি রকম গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিভূতি আর তার সঙ্গীরা ভাল করিয়াই টের পাইয়াছিল। সকলে মিলিয়া আরম্ভ করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এখন আর উপায় কি? পালানোর চেষ্টা করিলে কয়েকজন বাঁচিয়া যাইতে পারে, কিন্তু পালানোর চেষ্টা তো আর করা চলে না। তার চেয়ে উন্মত্ত জনতার হাতে মরাই ভাল।

পালানোর চেষ্টা করা চলে না কেন? বিভূতির ভক্তরা সকলে কি মনে করিবে! মানুষের নিন্দা প্রশংসা সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরীর দুর্বলতা দেখিয়া সেদিন সকালে বিভূতির লজ্জা আর দুঃখ হইয়াছিল, এখন সে চোখের পলকে বুঝিতে পারে, অনুগত যুবক সমাজের নিন্দা প্রশংসার ভাবনাই তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে। যাদের এত বড় বড় কথা শুনাইয়াছে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বুক ফুলাইয়া যাদের সঙ্গে করিয়া এখানে নিয়া আসিয়াছে, এখন বিপদ দেখিয়া তাদের ফেলিয়া পালানোর কথা ভাবিতেই হাত-পা অবশ হইয়া আসিতেছে। অথচ এ ভাবে মরণকে বরণ করা নিছক বোকামি। রেল লাইনে ট্রেনের সামনে দাঁড়াইয়া সাহস দেখানোর মত।

সদানন্দও নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। দু হাত মেলিয়া বিভূতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে ঠেকানোর কল্পনাটা মনের মধ্যে আসিয়াই অন্য একটা কল্পনার তলে মিলাইয়া গেল। চোখের সামনে এমন একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিতে

যাইতেছে, অথচ এই অবস্থাতেও সদানন্দের মনে পড়িয়া গেল যে এ জগতে মাধবীলতার একজন মাত্র মালিক আছে, তার নাম বিভূতি। বিভূতির যদি কিছু হয়, মাধবীলতার তবে কেউ আর কর্তা থাকিবে না। চিন্তাটা মনে আসিতে সদানন্দ একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় ঘটিল আরেকটা কাণ্ড। হাতে আর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মহেশ চৌধুরী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পাগলের মত আসিয়া হাজির হইল। খানিকটা তফাৎ হইতেই সে প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিল—ওরে, রাখ, রাখ। ওরে বিভূতি, রাখ।

সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। কতটা বিস্ময়ে, কতকটা কৌতূহলে, কতকটা সহানুভূতিতে। বিভূতি প্রথমে সকলকে শুনাইয়া যা বলিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীকে দেখিয়া সেই কথাগুলি সকলের মনে পড়িয়া গিয়াছে।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর আবার মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল। এবার আরও জোরে। আসরে মহেশ চৌধুরীরও অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিল, তাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরী আর্তনাদের সুরে বিভূতিকে হাঙ্গামা থামাইতে অনুরোধ করে নাই, বিভূতিকে রক্ষা করার জন্য তার অনুগতদের কাছে আবেদন জানাইয়াছে। বাপের আর্তনাদ বিভূতির কানে পৌঁছায় নাই। গোলমালের জন্য নয়, সে তখন প্রায় সদানন্দের পায়ের কাছেই উদ্ভট ভঙ্গীতে পড়িয়া আছে, বাঁ হাতটা কব্জি ছাড়াও আরেক যায়গায় ভাঁজ হইয়া শরীরের নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে আর ডান হাতটা টান হইয়া নিবেদনের ভঙ্গীতে আগাইয়া গিয়াছে সদানন্দের পায়ের দিকে। শরীরটা রক্তমাখা, তবে কোন কোন অঙ্গের নড়ন-চড়ন দেখিয়া বুঝা যায় তখনও মরে নাই। আরও অনেকে জখম হইয়াছে, সকলে তারা বিভূতির সঙ্গীও নয়, সদানন্দের মান রক্ষার জন্য তার যে সব উৎসাহী ভক্তেরা আগাইয়া আসিয়াছিল তাদের মধ্যেও কয়েকজন অন্য উৎসাহী ভক্তের হাতে মার খাইয়াছে। মারা-মারির সময় হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই দু ঘা দিতে এমন হাত নিস্‌পিস্‌ করে!

শুধু হাতের মার নয়, গ্রামের লোকের পথ চলিতে লাঠির বড় দরকার হয়।

মারামারির দ্বিতীয় খণ্ডটা পরিণত হইয়া গেল রীতিমত দাঙ্গায়, কেউ ঠেকাইতে পারিল না। অনেকে আগেই পালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ব্যাপার এতদূর গড়াইবে না আশায় বুক বাঁধিয়া যারা অপেক্ষা করিতেছিল, এবার তারাও ছিটকাইয়া সরিয়া গেল। কেউ সটান পা বাড়াইয়া দিল বাড়ীর দিকে, কেউ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা। কেউ মাটির ঢেলা ইট পাটকেল, হাতের কাছে যা

পাইল, দূর হইতে তাই ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল যুদ্ধক্ষেত্রে—একটু আগেও যেটা ছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-কীর্তনের আসর। খানিক তফাতে একটা চ্যালা কাঠের স্তূপ ছিল, আট-দশজন লোক হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দুহাতে চ্যালা কাঠ ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল—ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নয়, একপাশে যেখানে তখনও সমবেত স্ত্রীলোকদের অর্ধেকের বেশী নিরুপায় আতঙ্কে কিচির-মিচির সুরে আর্তনাদ করিতেছে। কোন অল্পবয়সী স্ত্রীলোক পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে বিফল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে 'বাবাগো মাগো' বলিয়া আর কোন বয়স্কা স্ত্রীলোক বসিয়া বসিয়াই মধুসূদনকে ডাকিতেছে। মেয়েদের অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্গীন। আসরের চারিদিকে রাত্রি আর নির্জনতা; পালানোর উপায় নাই। কয়েকজন অবশ্য দাঙ্গার সূচনাতেই উন্মাদিনীর মত যেদিকে পারে ছুটিয়া পালাইয়াছে, সকলে সেরকম উদ্‌ভ্রান্ত সাহস কোথায় পাইবে? পুরুষ অভিভাবকরা আসিয়া অনেককে উদ্ধার করিয়া নিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন উদ্ধারের কাজটাও হইয়া দাঁড়াইয়াছে আরও কঠিন। নিজেদের সঙ্কীর্ণ সীমানাটুকুর মধ্যে অনেকে ভয়ের তাড়নায় কয়েকটি পলাতকা উন্মাদিনীর মতই দিশেহারা হইয়া এদিক ওদিক আরম্ভ করায় নিজেদের মধ্যে নিজেরাই হারাইয়া গিয়াছে। তারপর আছে ছোট ছেলেমেয়ে। তারপর আছে ধাক্কা দেওয়ার, গা মাড়াইয়া দেওয়ার বচসা আর গালাগালি। যে দু-একজন অভিভাবক লজ্জা ভয় ভদ্রতা ছাড়িয়া একেবারে মেয়েদের মধ্যে আসিয়া খোঁজ করিতেছে, খোঁজ পাইয়া, দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া,কাছে আনাইয়া সঙ্গে করিয়া পালাইতে তারও সময় লাগিতেছে অনেকটা। এই অবস্থায় চ্যালা কাঠগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল তাদের গায়ে মাথায়।

কেউ থামানোর চেষ্টা না করিলেও দাঙ্গা আপনা হইতেই থামিয়া যায়। কোনটা তাড়াতাড়ি থামে, কোনটার জের চলে এখানে সেখানে ছাড়া ছাড়া হাতাহাতিতে, পিছন হইতে মাথা ফাটানোয়।

এ দাঙ্গাটা থামাইয়া দিল বিপিন। আশ্রমে একটা লুকানো বন্দুক ছিল। বন্দুকের লাইসেন্স ছিল, তবু বন্দুকটা লুকানোই থাকিত। ছুটিয়া গিয়া বন্দুকটা আনিতে বিপিনের সময় লাগিল মিনিট পাঁচেক আর খানিকটা তফাতে দাঁড়াইয়া কয়েকবার আওয়াজ করিতে সময় লাগিল দু মিনিট। শেষ মিনিটের আওয়াজ দরকার ছিল না, এ ধরণের সখের দাঙ্গা থামাইতে একটা বন্দুকে এক মিনিটে যে ক'টা আওয়াজ করা যায় তাই যথেষ্ট।

দাঙ্গা থামার পরে হাঙ্গামার প্রথম বীভৎস আর বিশৃঙ্খল অবস্থাটাও শেষ হইয়া গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। এরকম হাঙ্গামার ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিতে সদানন্দের আশ্রমবাসী শিষ্য-শিষ্যাদের পটুতা দেখা গেল অসাধারণ। পরিচালনার ভারটা নিতে হইল বিপিনকে, সদানন্দের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না, সেও মার খাইয়াছে। মেয়েদের শান্ত করিয়া অভিভাবকদের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল এবং আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইল।

আধঘণ্টা পরে দেখা গেল আসরে আছে শুধু আশ্রমের লোক, আহত আর নিহতদের আত্মীয়স্বজন, আর আছে গহনার শোকে কাতর কয়েকজন নরনারী। মধ্যে যারা চ্যালা কাঠ ছুঁড়িয়া মারিতে-ছিল। দাঙ্গার শেষের দিকে হঠাৎ সে কাজটা বন্ধ করিয়া মেয়েদের ভিড়ে ঢুকিয়া কয়েকজনের গলার হার, কানের মাকড়ি, হাতের চুড়ি ছিনাইয়া নিয়া তারা সরিয়া পড়িয়াছিল। সকলে পালাইতে পারে নাই, একটা চ্যালা কাঠ কুড়াইয়া নিয়া রত্নাবলী দুজনের মাথা ফাটাইয়া দেওয়ায় তারা এখনও আহতদের সারির একপ্রান্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে।

আনকোরা নূতন আঘাতের রক্তমাখা চিহ্ন গায়ে নিয়া সদানন্দ আর পুরানো আঘাতের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চিহ্ন গায়ে নিয়া মহেশ চৌধুরী জড় ভরতের মত একরকম কাছাকাছিই বসিয়া আছে—বিভূতির গা ঘেঁষিয়া। দাঙ্গা শেষ হওয়ার একটু আগে অথবা সঙ্গে সঙ্গে অথবা

একটু পরে বিভূতি মরিয়া গিয়াছে। এক মিনিট স্তব্ধতার আগের তিন মিনিট আর পরের সাত মিনিট, মোট দশ মিনিটের দাঙ্গায় মারা গিয়াছে চার জন। গুরুতর আঘাত পাইয়াছে সাত জন আর সাধারণভাবে আহত হইয়াছে সতের জন। আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে তারা এখানে নাই, আগেই সরিয়া পড়িয়াছে। সদানন্দ আর মহেশ আহতদের প্রাথমিক সেবা শুশ্রূষার পর প্রাথমিক চিকিৎসার আয়োজন চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে আর শুনিতে থাকে মরা ও আধমরা মানুষগুলিকে ঘিরিয়া বসিয়া মেয়েদের ডুকরানো কান্না আর পুরুষদের হায় হায় আফসোস। সদানন্দের মাথায় মৃদু ঝিমঝিমানির মধ্যেও মনে হয়, এতগুলি গলার কান্না আর আফসোসের শব্দ থাকা সত্ত্বেও আসরটা যেন বড় বেশী নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে—মানুষের ভিড়ে যখন গমগম করিতেছিল আর খোল করতালের সঙ্গে কীর্তন চলিতেছিল তখনও আসরে যেন ঠিক এইরকম স্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছিল।

মেয়েদের কান্না শুনিতে শুনিতে মহেশ চৌধুরীর মনে হয় অন্য কথা—এই শোকের ছড়াছড়ির মধ্যে বিভূতি যেন অন্যায় রকম ফাঁকিতে পড়িয়া গিয়াছে, তার জন্য শোক করিবার কেউ নাই।

অন্যায়টা শেষ পর্যন্ত তার বোধ হয় সহ্য হইল না, তাই মাঝরাত্রি পার হইয়া যাওয়ার অনেক পরে বিপিনকে ডাকিয়া বলিল—বাড়ীতে একটা খবর পাঠাতে পার বিপিন ?

—পাঠাচ্ছি, সকালে পাঠালে ভাল হত না ? এত রাত্রে মেয়েদের—

—না, এখুনি খবরটা পাঠিয়ে দাও। মেয়েরা এসে একটু কাঁদুক।

সদানন্দ এতক্ষণ বার বার শুশ্রূষা আর চিকিৎসা প্রত্যাখান করিয়াছে, এবার বিপিন অনুরোধ করিতেই রাজী হইয়া গেল এবং একজন শিষ্যের গায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজের তিন মহলা আশ্রমের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল একজন শিষ্যা। মনে হইল, এতক্ষণ অন্য সব আহতদের মত কেবল সাধারণ শুশ্রূষা আর

চিকিৎসা পাওয়া যাইত বলিয়া সে গ্রহণ করে নাই, এবার বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব হওয়ায় সকলের চোখের আড়ালে সেটা উপভোগ করিতে যাইতেছে।

এদিকে কয়েক মিনিট কাটিতে না কাটিতে মহেশের মনে হইতে লাগিল, বাড়ীর মেয়েদের আসিতে বড় বেশী দেরী হইতেছে। তাই, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিজেই সে হাউ হাঁউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মনে হইল, সদানন্দের সামনে ছেলের জন্য কাঁদিতে এতক্ষণ তার যেন লজ্জা করিতেছিল, এবার সুযোগ পাওয়ায় প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিভূতির মা, মাধবীলতা আর বাড়ীর সকলে আসিল প্রায় শেষ রাত্রে। কিন্তু তেমনভাবে কেউ কাঁদিল না। মাধবীলতা একরকম হাঁ করিয়া বিভূতির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দেই বাকী রাতটুকু কাবার করিয়া দিল। বিভূতির মা এত আস্তে কাঁদিতে লাগিল যে একটা কান ব্যাণ্ডেজে ঢাকা না থাকিলেও পাশে বসিয়া মহেশ চৌধুরী সব সময় তার কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল না।

পুলিশ আসিল সকালে।

পুলিশের লোকের কাছে একটা খবর পাওয়া গেল, ইতিমধ্যেই তারা তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছে। তবে দাঙ্গার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না। আশ্রমের পশ্চিম সীমানায় আশ্রমের যে ছোট ফুলের বাগানটি আছে সেখানে পাঁচজন লোক কাল রাত্রে একটি এগার বছরের মেয়েকে নিয়া একটু আমোদ করিয়াছিল। তিনজন ধরা পড়িয়াছে, দুজন পলাতক।

—না মরে নি, বেঁচে উঠবে বলেই তো মনে হয় মেয়েটা। তবে কি জানেন বিপিনবাবু—

মহেশ চৌধুরী শুনিতেছিল, হঠাৎ তার মনে হইল দাঙ্গার চেয়ে এই মেয়েটির আলোচনাই সকলে যেন বেশী উপভোগ করিতেছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা সামান্য ব্যাপার, জগতের কোথাও না কোথাও সর্বদাই যে কুরুক্ষেত্রীয় কাণ্ড চলিতেছে তার তুলনায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার ক্ষুদ্রতা আর

তুচ্ছতা শোচনীয়ভাবে লজ্জাকর। কিন্তু এগার বছরের একটি রক্ত মাংসের বিন্দুতে তীব্র আর বীভৎস অস্বাভাবিকতার সিন্ধু খুঁজিয়া পেলে, রোমাঞ্চকর লজ্জা ভয় রাগ. দ্বেষ ঘৃণা আর অবাধ্য আবেগে স্নায়ুগুলি টান হইয়া যায়, কানে ভাসিয়া আসে লক্ষ কোটি পশুর গর্জন।

মহেশ চৌধুরী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া এক চোখে চারিদিকে চাহিতে থাকে। আহতদের অনেক আগেই ভাল আশ্রয়ে সরানো হইয়াছে, পড়িয়া আছে কেবল তিনটি সাদা চাদর-ঢাকা দেহ। এ বয়সে এত কাণ্ডের পর এরকম আবেষ্টনীতে এমন অসময়ে একটা জানা কথা নূতন করিয়া জানিয়া নিজেকে তার বড় অসহায় মনে হইতে থাকে। চাপা দিলে সত্যই রোগ সারে না, হিমালয় পাহাড়ের মত এক বিরাট এক স্তূপ সুগন্ধি ফুলের নিচে চাপা দিলেও নয়।

[ লেখকের মন্তব্য : মহেশ চৌধুরীর এই অস্পষ্ট আর অসমাপ্ত চিন্তাকে মহেশ চৌধুরীর চিন্তার শক্তি ও ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে গেলে অনেক বাজে বকিতে হইবে, সময়ও নষ্ট হইবে অনেক। আলপিন ফুটাইয়া খাঁড়ার পরিচয় দেওয়ার চেয়ে মন্তব্যের এই ভোঁতা ছুরি বেশী কাজে লাগিবে মনে হয়।

মোট কথা, মহেশ চৌধুরীর মনে হইয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অনেকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছে। মাঝে মাঝে দু-একজন মহাপুরুষ এবং সব সময় অনেক ছোটখাট মহাপুরুষ এই রোগ সারানোর চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, কিন্তু সে চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হয় নাই, এখনও হইতেছে না! কারণ, তাঁদের চেষ্টা শুধু ভালর আড়ালে মন্দকে চাপা দেওয়ার, কেবল দুধ ঘি খাওয়াইয়া রুগীকে স্বাস্থ্যবান করার।

মানুষের রোগের কারণ তারা জানে না, অর্থ বোঝে না, চিকিৎসার পথও খুঁজিয়া পায় না। তারা নিজেরাও রুগী। না হইয়া উপায় কী? মানুষ হইতে যে মানুষের জন্ম, মানুষের কাছ হইতে খুঁটিয়া

খুঁটিয়া যার আত্মসংগ্রহ, মানুষের যা আছে তা ছাড়া মানুষের যা নাই তা সে কোথায় পাইবে? উপাদানগুলি সেই এক, ভিন্ন ভিন্ন মানুষ শুধু নিজের মধ্যে ভিন্নভাবে আত্মচিন্তার খিচুড়ি রাঁধে।

তাই মানুষের রোগের চিকিৎসার উপায় কেউ খুঁজিয়া পায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। তাই মানুষকে সুস্থ করার সমস্ত চেষ্টা গরীবকে স্বপ্নে বড়লোক করার চেষ্টার মত দাঁড়াইয়া যাইতেছে ব্যর্থ পরিহাসে।

জগতের কোটি কোটি অন্ধকে অন্ধের পথ দেখানো চেষ্টার করুণ দিকটা মহেশ চৌধুরীকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। হতাশায়, অবসাদে সমস্ত ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার মনে হয়। কেউ খুঁজিয়া পাইবে না, মানুষের মুক্তির পথ কেউ খুঁজিয়া পাইবে না।

মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের নিজেকে জানিবার, নিজের আর বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়ার, একটা উপায়ের কথা যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মহেশ চৌধুরীও তা জানে, আমিও জানি। তবে, শুধু লেখা আছে এইটুকুই আমরা দুজনে জানি।]

দাঙ্গা-হাঙ্গামার জের চলিতে লাগিল, মহেশ চৌধুরীও বিষাদ ও অবসাদের ভারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মানুষের মুক্তি নাই, মানুষের ভাল নাই, একথা ভাবিলেই তার মনে হয় পৃথিবীসুদ্ধ আত্মভোলা লোক ভাল-মন্দে জড়ানো জীবন নিয়া মনের আনন্দে বাঁচিয়া আছে, সে-ই কেবল পশুর খাঁচায় আটক পড়িয়াছে। সকলে ভাবে পুত্রশোকে মহেশ কাতর। মহেশ ভাবে, পুত্রশোকে সে যদি সকলের মত রীতিমত কাতর হইতে পারিত! একটি মাত্র ছেলে, তার শোকেও আত্মহারা হইতে পারিতেছে না, একি ভয়ানক অবস্থা তার? শোক বাড়ানোর জন্যই মহেশ সর্বদা বিভূতির কথা ভাবিতে চেষ্টা করে, গৃহ কেমন শূন্য হইয়া গিয়াছে অনুভব করার চেষ্টা করে, বিভূতির স্মৃতিচিহ্নগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করে, বারবার মাধুরীলতার নূতন বেশের দিকে তাকায়।

কেবল শোক বাড়ানোর জন্য। অন্য কোন কারণে নয়।

মহেশ চৌধুরীর শোক দেখিয়া বাড়ীর লোকের বুক ফাটিয়া যায়। বিভূতির মা মাথা নাড়িয়া বলে—ও আর বাঁচবে না। না বাঁচুক, আর বেঁচে কি হবে? ওর আগেই যেন আমি যেতে পারি, হে মা কালী, ওর আগেই যেন—তোর মত বেশ যেন আমায় ধরতে না হয় রাক্ষসী।

মাধবীলতার শোকটা তেমন জোরালো মনে হয় না। তাকে কেবল একটু বেশী রকম রুক্ষ দেখায়—তেল মাখিয়া স্নান না করার রুক্ষতা নয়, ভিতর হইতে রস শুকাইয়া যাইতে থাকিলে যেমন হয়।

অনেক ভাবিয়া একদিন সে মহেশ চৌধুরীর সামনে জোড়াসন করিয়া বসে, আগে মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া বলে—ওই লোকটাই খুন করেছে বাবা।

—স্বামীজি?

ওই লোকটা বলিতে মাধবীলতা যে কাকে বুঝাইতেছে অনুমান করিতে মহেশের দ্বিধা পর্যন্ত করিতে হয় না।

—হ্যাঁ।

—তুমি জানলে কি করে, তুমি তো যাও নি।

—লোকের কাছে শুনেছি। আপনিও তো জানেন? ওই তো সকলকে ক্ষেপিয়ে দিল, সকলকে ডেকে খুন করতে বলল—

—খুন করতে বলেন নি, বলেছিলেন—

মাধবীলতা অসহিষ্ণু হইয়া বলে—তার মানেই তো তাই। এ লোকটা আমায় অপমান করছে, তোমরা চুপ করে সহ্য করবে—ও কথা বলে সকলকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার আর কি মানে হয়? কি অপমান করছে সবাই তো দেখতে পাচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিল? কেউ তখন আর মারতে উঠে নি কেন? যেই সকলকে ডাকল তখনি সবাই এসে একজনকে মারতে আরম্ভ করল কেন?

মহেশ চৌধুরী ধীরভাবে বলে—উনি হয়তো ওকে শুধু আসর থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য সবাইকে ডেকেছিলেন।

মাধবীলতা আরও ব্যাকুল হইয়া বলে—না না, আপনি বুঝতে পারছেন না। আশ্রমের লোকেরা তাড়াতে পারত না?

—দল নিয়ে গিয়েছিল যে ?

অগত্যা মাধবীলতাকে ধৈর্য ধরিতে হয়, শান্ত হইতে হয়। সব কথা বুঝাইয়া না বলিলে মহেশ চৌধুরী বুঝিতে পারিবে না। এমন ভাল মানুষ কেন যে সংসারে জন্মায় !

—তা নয়, দলে আর ক'জন ছিল ? ওঁকে খুন করাই ও লোকটার উদ্দেশ্য ছিল। জেলে দেবার জন্যে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল মনে নেই ? ওঁকে জেলে পাঠালে আমার পিছনে লাগার সুবিধে হত। জেলে পাঠাতে পারল না, তাই একেবারে মেরে ফেলল।

এবার মহেশ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে। একজন স্ত্রীলোককে পাওয়ার লোভে তার স্বামীকে হত্যা করা দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়, তবু যেন মহেশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ওরকম হত্যাকাণ্ডগুলি অন্যভাবে হয়। বিভূতিকে সদানন্দ ডাকিয়া পাঠায় নাই, বিভূতি যে আসরে যাইবে তাও সদানন্দ জানিত না। বিভূতি নিজে হইতে গিয়া হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছিল। এরকম অবস্থায় সদানন্দের সম্বন্ধে এমন একটা ভয়ানক কথা অনুমান করা চলে কেমন করিয়া ?

মহেশের মুখ দেখিয়া মাধবীলতার শরীর রাগে রি রি করিতে থাকে। এমন অপদার্থ হাবাগোবা ভাল মানুষও পৃথিবীতে জন্মায় !

—বুঝতে পারছেন না ? আমার বিয়ে হবার পর থেকে দিনরাত ভাবত ওঁকে কি করে সরানো যায়, সেদিন সুযোগ পাওয়া মাত্র—যেই বুঝতে পারল যে সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিলেই সকলে মিলে ওকে মেরে ফেলবে অমনি সকলকে ক্ষেপিয়ে দিল।

তা বটে, সুযোগ পাওয়া মাত্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সদানন্দের পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু······মাথা হেঁট করিয়া মহেশ চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে আর মাধবীলতা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকে। এই সহজ কথাটা কেন যে মানুষ বুঝিতে পারে না। বিভূতিকে বাঁচাইতে দু হাত বাড়াইয়া আগাইবার উপক্রম করিতে গিয়া হঠাৎ যে চিন্তা মনে আসায় সদানন্দ পিছাইয়া গিয়াছিল, মাধবীলতা সেই চিন্তাকে কয়েক

মুহূর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সদানন্দের জীবনের দিনে, মাসে, বৎসরে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। সদানন্দ এই কথাই সর্বদা চিন্তা করিত, কি করিয়া বিভূতিকে মারিয়া মাধবীলতাকে লাভ করা যায়। মাধবীলতাকে হারানোর পর মাধবীলতাকে পাওয়ার চিন্তা ছাড়া সদানন্দের কি অন্য চিন্তা থাকিতে পারে?

প্রথমটা একটু উত্তেজিত হইয়াছিল, তারপর কিন্তু মহেশ চৌধুরী অস্বাভাবিক রকম শান্ত হইয়া পড়িল। একেবারে শান্তির প্রতিমূর্তি। মুহূর্তের জন্যও তার মুখের চামড়া কুঁচকায় না, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হয় না, কথায় আলো প্রকাশ পায় না। আরও বেশী আস্তে চলাফিরা করে, আরও বেশী ধীরতার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনগুলি নিখুঁতভাবে পালন করিয়া যায়।

মাধবীলতা দাঁতে দাঁত কামড়ায়।—আপনি কিছুই করবেন না?

—করব।

—কি করবেন?

—কি করব তাই ভাবছি মা।

মাধবীলতা রাগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।—আপনার কিছু করা উচিত কিনা তাও ভাবছেন বোধ হয়?

মহেশ চৌধুরীর স্পষ্ট, মৃদু ও একটানা আলাপ করার সুর বদলায় না। —ভাবছি বৈকি। সব কথা না ভেবে কি কিছু করতে আছে? সব কথা ভাবছ না বলেই সদানন্দের দোষের কথা ভেবে তুমি অস্থির হয়ে পড়েছ।

আগে কোনদিন মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে 'সদানন্দ' বলে নাই। সে অনায়াসে নামটা উচ্চারণ করিয়া গেল, খাপছাড়া শোনাইল মাধবীলতার কানে—সে নিজেই মহেশ চৌধুরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে ও নামটা খুনীর।

—স্বামীজির দোষ আছে বলেই—

—দোষ তো তোমারও থাকতে পারে মা?

মাধবীলতা বড় দমিয়া গেল, মুখখানা হইয়া গেল ফ্যাকাসে। মহেশ চৌধুরী কেন তাকেও দোষী করিতেছে অনুমান করা কঠিন নয়। এদিকটা আগে সে ভাবিয়া দেখে নাই।

—তুমি আগেও ভাবতে সদানন্দ তোমার জন্য এমন পাগল যে বিভূতিকে খুন পর্যন্ত করতে পারে। তাই এত সহজে সদানন্দকে দোষী ভেবে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছ যে—একবার একটু সন্দেহও জাগে নি। তোমার কোন দোষ না থাকলে এসব কথা ভাবতে কেন ?

—আমি—

—তোমার কি দোষ তুমি জান না—অতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মহেশ চৌধুরী যেন তার সেই অক্ষমতাকে সমর্থনই করে—সেইখানে তো মুস্কিল বাছা। নিজের দোষ যদি আমরা জানতে পারতাম তবে আর ভাবনা ছিল কি। আমি কি আমার দোষ জানি ?

মাধবীলতা বড় দমিয়া যায়। কি ভাবিতেছে মহেশ চৌধুরী ? কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কি ধারণা জাগিয়াছে তার সম্বন্ধে তার মৃত স্বামীর পিতার মনে ? কি সন্দেহ করিয়াছে এই হাবাগোবা ভালমানুষটি,—মাঝে মাঝে যাকে মারাত্মক রকমের চালাক মনে হয় ? তার ছেলের বৌকে পাওয়ার লোভে সদানন্দ ইচ্ছা করিয়া তার ছেলেকে হত্যা করিয়াছে শুনিয়াও মহেশ চৌধুরীর অবিচলিত ভাব দেখিয়া মাধবীলতার আর রাগ করিবার সাহস হয় না। তাছাড়া, এতক্ষণে তার মনে হইতে থাকে যে মহেশ চৌধুরীর করিবারই বা কি আছে, সে কি করিতে পারে ? প্রথমে মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরী আসল ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিলেই বুঝি সদানন্দের শাস্তির আর সীমা থাকিবে না। এখন মাধবীলতা ভাবিয়া পায় না, এমন একটা বিশ্বাস তার কেন জাগিয়াছিল ! প্রতিহিংসা নেওয়ার মানুষ মহেশ চৌধুরী নয়, সে ক্ষমতাও তার নাই।

দাঙ্গার ফলে আর কিছু না হোক আশ্রমের নাম আরও বেশী ছড়াইয়া গিয়াছে। কেবল কাছাকাছি গ্রাম আর সহরের মানুষের মধ্যেই ব্যাপারটা নিয়া হৈ হৈ হয় নাই, খবরের কাগজেও বিস্তারিত বিবরণ বাহির হইয়াছে। দাঙ্গার বিবরণ শুধু নয়, আশ্রম সম্পর্কেও

অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। একটি কাগজে লেখা হইয়াছে: এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীশ্রীসদানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল তপস্যার পর জনসেবাই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া জানিয়া রোগ-শোকদারিদ্র্যনিপীড়িত নরনারীর কল্যাণের জন্য···ইত্যাদি। সকল মহৎ কর্মের বিরোধিতা করাই এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃতি, এইরূপ একদল লোক অন্যভাবে আশ্রমের ক্ষতি করিতে অসমর্থ হইয়া আক্রোশের বশে আশ্রমের বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসবের দিন গুণ্ডা ভাড়া করিয়া···ইত্যাদি।—এই বিবরণটি যে কাগজে বাহির হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে সেই কাগজটিই রাখা হয়। বাড়ীতে খবরের কাগজটি আসামাত্র সকলের আগে মাধবীলতা সেটিকে দখল করে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার কোন বিবরণ তার অজানা নয়, ব্যাপারটার জের কি দাঁড়াইতেছে তাও খবরের কাগজে বাহির হওয়ার কয়েকদিন আগেই তার কানে আসে, তবু খবরের কাগজে সংক্ষিপ্ত আর ভুল বিবরণ পড়িবার জন্য সে ছটফট করিতে থাকে। সদানন্দ, তার আশ্রম ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্বন্ধে অভিনব টীকা পড়িয়াই কাগজটি হাতে করিয়া সে মহেশ চৌধুরীর কাছে ছুটিয়া যায়।

—দেখেছেন কি আরম্ভ করেছে ওরা? পড়ে দেখুন।

মহেশ ধীরে ধীরে আগাগোড়া পড়িয়া বলে—সদানন্দের তপস্যা আর আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা সত্য, গুণ্ডা ভাড়া করার কথাটা সত্য নয়।

মাধবীলতা বোমার মত ফাটিয়া যায়—একটা কথাও সত্যি নয়। ও লোকটা কত খারাপ আপনি জানেন না, যে সব কাণ্ড চলে—

মহেশ বলে—জানি মা সব জানি। সদানন্দ অনেক সাধনা করেছে, তবে কি জান মা, সাধকেরও পতন হয়। সদানন্দ লোক ভাল। আশ্রমটাও বড় উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপন করা হয়েছিল, তবে ঠিক সেভাবে কাজ হয় নি। মানুষের ভুল ত্রুটি হয় কিনা, বুঝবার দোষ হয় কিনা নানারকম—

মাধবীলতা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দ লোক ভাল?

আশ্রমের উদ্দেশ্য মহৎ ? এত কাণ্ডের পর মহেশ চৌধুরীও যে এমন কথা বলিতে পারে, কানে শুনিয়াও মাধবীলতার যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। হঠাৎ তার মনে হয়, লোকটি বোধ হয় পাগল। প্রত্যেক উন্মাদের মত নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেখানে সে বাস করিতেছে আর বাস্তব জগতের অর্থ স্থির করিতেছে তার নিজের খাপছাড়া জগতের নিয়মে।

—কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাধবীলতা অভিভূতের মত বলে—সব ঠিক হয়ে যাবে ?

মহেশ চৌধুরী একদিন আশ্রমে গেল। বিপিনের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল—বিভূতির দোষে এতগুলি লোক জেলে যাবে বিপিনবাবু ?

—ওরাও তো মারামারি করেছিল।

—তা করেছিল কিন্তু দোষ তো ওদের নয়। বিভূতি হাঙ্গামা না বাধালে কিছুই হত না।

বিপিন চুপ করিয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তারও মনে হয়, লোকটা কি পাগল ? দাঙ্গা করার জন্য পুলিশ যাদের ধরিয়াছে, বিভূতিকে নিজের হাতে মারিয়াছিল এমন লোকও যাদের মধ্যে আছে, তারা শাস্তি পাইবে বলিয়া এই মানুষটার দুর্ভাবনা!

সেদিন সকালেই বিপিন আর সদানন্দের মধ্যে পরামর্শ হইয়াছিল, আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দায়িত্বটা ছিল বিভূতির। কিছুদিন আগে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া তার বাড়ীতে নিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন ভাল উদ্দেশ্যের পরিবর্তে বড় আশ্রমটির ক্ষতি করিবার জন্য একটি বিরোধী আশ্রম স্থাপন করাই মহেশ চৌধুরীর আসল উদ্দেশ্য—ইহা টের পাইয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছিল। বাপের অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিভূতি এই হাঙ্গামা বাধায়।

মহেশ চৌধুরীকেও দাঙ্গা-হাঙ্গামার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া কিছুদিনের জন্য জেলে পাঠানোর চেষ্টা করার ইচ্ছা সদানন্দের ছিল, বিপিন কোনমতেই রাজী হয় নাই। মহেশ চৌধুরীর সম্বন্ধে বিপিনের মনের ভাব ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া যাইতে ছিল।

বিকৃত সত্য বলিয়া জানিয়া যে আদালতে প্রমাণ করার জন্য সদানন্দের সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত করিতেছিল, মহেশ চৌধুরী নিজে আসিয়া তাই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সব দোষ ছিল তার ছেলের! বিভূতিকে দোষী প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাদের ছিল স্বার্থরক্ষা, বিভূতির দোষে কতকগুলি লোক জেলে যাইবে বলিয়া মহেশ চৌধুরীর হইতেছে আপসোস!

—কিছু করা যায় না?

—কি করা যাবে বলুন?

—বিভূতির দোষটা আদালতে প্রমাণ করলে—

বিপিন ভাবিয়া বলিল—তাতে অন্য সবাই ছাড়া পাবে না, তবে শাস্তিটা কম হতে পারে।

মহেশ বলিল—তাই হোক। তাছাড়া যখন উপায় নেই, কি আর করা যাবে।

সদানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যা ঠিক হইয়াছিল সেটা মনে মনে বাতিল করিয়া দিয়া বিপিন বলিল—আদালতে কি বলবেন?

—যা সত্য তাই বলব, আর কি বলব?

যা সত্য আদালতে তাই বলা হইবে স্থির হইলেও কি বলা হইবে সে বিষয়ে পরামর্শ করার প্রয়োজন দেখা গেল। সকলে সত্য কথা বলিলেও সত্যের খুঁটিনাটিগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে এমন পরস্পর-বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। আদালতে দাঁড়াইয়া মহেশ চৌধুরী স্থির শান্তভাবে বলিয়া গেল, বিভূতি কেমন একগুঁয়ে ছিল মেজাজটা তার কি রকম গরম ছিল, আগে একবার সে একটা ছোটখাট হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার ফলে মহেশ কি ভাবে কয়েকজনের হাতে মার খাইয়াছিল এবং বাপকে যারা মারিয়াছিল তাদের শাস্তি দিবার জন্য কীর্তনের

আসরে গিয়া সে কি ভাবে-হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ছেলের চরিত্রের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টাও করিল যে, কর্তব্যজ্ঞান, নিষ্ঠা, তেজ, সাহস এ সব মানুষের যতই থাক ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিত ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকিলে ওসব কোন কাজেই লাগে না।

অনেকে হতভম্বের মত শুনিয়া গেল, কেউ ভাবিল মহেশ চৌধুরীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, কয়েকজন সকৌতুকে হাসিতেও লাগিল।

বিভূতির মা বলিল—আদালতে দশ জনের কাছে তুমি আমার ছেলের নিন্দে করে এলে! এবার আমি গলায় দড়ি দেব। আমি অনেক সয়েছি আর সইব না।—বলিয়া মাথা কুটিতে লাগিল।

মাধবীলতা বলিল—আপনার মনে এই ছিল! আমিও গলায় দড়ি দেব।—বলিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মহেশ চৌধুরী তাদের বুঝাইয়া শান্ত করিবার কোন চেষ্টা করিল না, এতটুকু বিব্রত হইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না।

অপরাহ্ণে বিপিন আসিল। মহেশ বলিল—এসো বিপিন।

বিপিন যেন হঠাৎ তার স্নেহের পাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সম্বোধনের তারতম্যটা বিপিনও খেয়াল করল কিনা সন্দেহ, শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের মত সামনে বসিয়া পরমাত্মীয়ের মতই বিনা ভূমিকায় বলিল—কিছু ভাল লাগছে না।

মহেশ সায় দিয়া বলিল—অনেক দিন থেকেই তো তোমার মন খারাপ।

ছোট ছেলে যেমন সহানুভূতির প্রত্যাশায় গুরুজনকে দুঃখ জানায় তেমনি ভাবে বিপিন বলিল—আশ্রম নিয়ে আমি পাগল হয়ে গেলাম চৌধুরী মশায়। যা ভেবেছিলাম তা তো কিছু হলই না, একটার পর একটা হাঙ্গামাই বাধছে। কত বড় উদ্দেশ্য নিয়ে কি রকম আশ্রমের গোড়াপত্তন করেছিলাম, দিন দিন কি দাঁড়াচ্ছে আশ্রমটা! এত চেষ্টা করছি, কিছুতেই গোল্লায় যাওয়া ঠেকাতে পারছি না।

মহেশ বলিল—কেন, তুমি তো আশ্রমের টাকা আর সম্পত্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছিলে, তা তো বেড়েছে ? নাম ছড়াবার চেষ্টা করেছিলে, তাও তো ছড়িয়েছে ?

বিপিন বলিল—কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আশ্রম করেছিলাম তার যে কিছুই হচ্ছে না, বরং উল্টো ফল হচ্ছে।

মহেশ বলিল—সে দোষটা তোমার।

বিপিন আহত হইয়া বলিল—আমার দোষ ? আমার কি দোষ ?

মহেশ বিপিনকে তার দোষগুলি বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করে। আগে বিপিন রাগ করিত, আজ নিঃশব্দে শুনিয়া যায়। মহেশের কথা শেষ হওয়ার আগেই তার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়—আপনাকে যদি আশ্রমে পেতাম !

—পাবে।

—আপনি আশ্রমে যোগ দেবেন ?

—দেব। ক'দিন আগেই ঠিক করেছি, আশ্রমের ভারটা এবার আমিই নেব। মন দুর্বল কিনা তাই ভাবছিলাম, ধীরে সুস্থে ক'দিন পরে আশ্রমে যাব। কিন্তু ঠিক যখন করে ফেলেছি, অনর্থক দেরী করে লাভ কি, কি বল ?

বিপিন অভিভূতের মত বলিল—নিশ্চয়।

মহেশ বলিল—চলো তবে আজকেই যাই।

বিপিন ভয়ে ভয়ে বলিল—কিন্তু সদানন্দের বিষয়ে কি করা যাবে?

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থার অর্থ বিপিন এক রকম বুঝিয়াছিল। সদানন্দকে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হইবে এবং মাধবীলতাকে মহেশের কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিবার অর্থটা সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। মহেশের আশ্রমে যোগদানের সঙ্গে সদানন্দকে সরাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন জাগিতে পারে,

মাধবীলতাকে সরাইয়া দিবার প্রয়োজন কি, কারণ কি? মহেশ যে দুজনকে একসঙ্গে সরাইয়া দিবার মতলব করিয়াছে, বিপিন সেটা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সদানন্দ অথবা মাধবীলতাও কল্পনা করিতে পারে নাই।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় মাধবীলতাকে সঙ্গে লইয়া মহেশ চৌধুরী আশ্রমে আসিল, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আসল উদ্দেশ্যটা তিনজনের কাছেই পরিষ্কার হইয়া গেল। মাঝরাত্রে আশ্রমের পিছনের ঘাটে বাঁধা নৌকায় উঠিয়া সদানন্দ আর মাধবীলতা চলিয়া গেল। মাধবীলতা প্রথম দিন রাত্রে আশ্রমে আসিবার সময় নৌকা হইতে এই ঘাটেই নামিয়াছিল।

নৌকা চলিয়া গেলে মহেশ বলিল—আমরা সবাই [illegible] এবার আশ্রমটা গড়ে তুলব বিপিন।